৩য় বৎসর] ফাল্গুন ৯১। [৮ম সংখ্যা।

কল্পনা

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত
১৮ নং নিলমাধব সেনের লেন ক্যানিং প্রেস হইতে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

কলিকাতা।

১৮ নং নিলমাধব সেনের লেন (সানকিভাঙ্গা) ক্যানিং প্রেসে
শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা মাত্র।

কল্পনা

তৃতীয় বৎসর।

বাঙ্গালার কৃষকসম্প্রদায়।
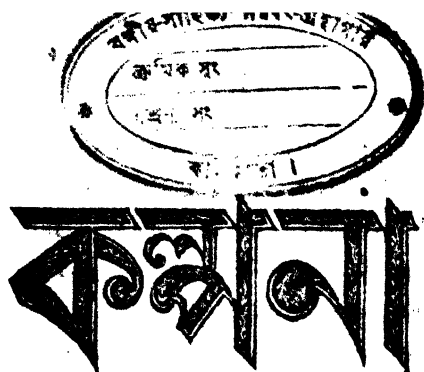
পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বকল্ বলেন, সভ্যতার উদয়ের পূর্ব্বে প্রথম আবশ্যক—সামাজিক ধনসঞ্চয়। সভ্যতার প্রতিপালনার জন্য সমাজের এক ভাগ আহারের চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া কেবল জ্ঞানার্জ্জন করিবে, আর এক ভাগ সেই অপর ভাগের আহার যোগাইবার জন্য পরিশ্রম করিয়া আত্মভরণ-পোষণের প্রয়োজনীয় পরিমাণের অধিক উৎপাদন করিয়া ধন সঞ্চয় করিবে। সামাজিক ধনসঞ্চয় না হইলে দেশ সভ্য হইতে পারে না। কিন্তু এই সামাজিক ধনসঞ্চয় কোন দেশে হয়, কোন দেশে হয় না। ধনসঞ্চয় ঘটিবার দুইটি কারণ আছে। প্রথম কারণ, ভূমির উর্ব্বরতা; দ্বিতীয় কারণ, দেশের শীতোষ্ণতা। উর্ব্বরা ভূমিতে অল্পায়াসেই অধিক শস্য উৎপন্ন হইতে পারে; সুতরাং শ্রমজীবীদিগের খাইয়া পরিয়া কিছু সঞ্চিত থাকা সহজ সম্ভব। যে দেশ উষ্ণ, সেখানে শরীরের তাপ রক্ষার জন্য তাপজনক খাদ্যদ্রব্যের বড় একটা আবশ্যক হয় না, মাংসাদি না হইলেও চলে—কেবল বনজের দ্বারাই সে কার্য্য সমাধা হইতে পারে। মাংসাদি অপেক্ষা শস্য সহজলভ্য। সুতরাং খাদ্য দ্রব্য সুলভ বলিয়া সে দেশে ধনসঞ্চয় হইয়া থাকে।

বকলের কথা মিলাইয়া দেখিলে বোধ হয় যে, এই জন্যই অত উর্ব্বরা-

কালে ভারতে সভ্যতার আলোক দেখা দিয়াছিল। লোকে কথায় বলে, ভারতের ভূমিতে সোণা ফলে, আবার তায় ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ—দুই কারণ একত্র বর্ত্তমান। তাই ভারতে অত শীঘ্র শীঘ্র ধনসঞ্চয় হইয়াছিল। সে আদিম ধনসঞ্চয়ের ফল—আদিম সভ্যতা। সে আদিম সভ্যতায় ভারতের ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে—তাহা বলিতেছি না; কিন্তু সেই জন্যই এখানকার কৃষকদিগের যে এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, ইহা নিশ্চয় কথা।

কৃষকদিগের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে বলিতেছি এই জন্য যে, সেই হইতেই সমাজ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার একভাগ শ্রম করে, আর একভাগ শ্রম করে না। যাহারা শ্রম করে, তাহারা চিরকাল ধরিয়াই কেবল শ্রম করিতে থাকে; আর যাহারা শ্রম করে না, তাহারা কখনই সে কাজে প্রবৃত্ত হয় না, চিরকাল ধরিয়াই তাহারা বসিয়া খায়। আহারের চেষ্টার জন্য শ্রমের হাত হইতে এড়াইয়া অবকাশ পাইয়া সমাজের একভাগ যখন চিন্তা কিম্বা শিক্ষাদিতে সময় কাটায়, আর এক ভাগ তখন তাহাদের আহার যোগাইবার জন্য পেটের ক্ষুধা পেটে মারিয়া দুই প্রহরের রৌদ্রে একহাঁটু কাদার উপর লাঙ্গল ঠেলিতে ঠেলিতে প্রাণ বাহির করে। কৃষকদিগের নিয়তির এ ব্যবস্থা আর পরিবর্ত্তন হইল না। ক্রমে লোক-সংখ্যা বাড়িল। এক জনের সহ সন্তান জন্মিল। কিন্তু সে সেই আগে যেরূপ পরিশ্রম করিতে পারিত এখনও তাহাই করিল, তাহার অপেক্ষা বেশী হওয়া তাহা দ্বারা অসম্ভব। তখন একজন শ্রম করিয়া উপার্জ্জন করে, বহুজন মিলিয়া তাহা খাইয়া ফেলে। কাজেই অন্নে আর কুলায় না। কাজেই কৃষক-দিগের দুর্দ্দশা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতে আরম্ভ হইল।

এত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইত না, যদি প্রজা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিতে জানিত, যদি বিবাহ প্রবৃত্তি দমন করিতে পারিত। যে দেশে লোক আছে কিন্তু প্রচুর অন্ন নাই, সে দেশের কতক লোক, যে দেশে প্রচুর অন্ন আছে কিন্তু সে অন্ন খাইবার লোক নাই, সেই দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিলে অনেক মঙ্গল ঘটে। ইংলণ্ডের সেই কারণেই এত মঙ্গল ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষ প্রকৃতি কর্ত্তৃক অলঙ্ঘ্য বলিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক, তথাকার লোক উপনিবেশ স্থাপনা করিতে

শিক্ষা করে নাই; খাদ্যের ভূষ খাইয়াও সকলে মিলিয়া একস্থানে বাস করিত। উঁবে যদি বিবাহপ্রবৃত্তির দমন করিত, সকলেই যদি বিবাহ না করিত, তবে এত প্রজাবৃদ্ধি হইত না; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সে বিষয়েও ভারতবর্ষ কোন চেষ্টাই দেখায় নাই; কাজে কাজেই সভ্যতালোকের প্রথম রেখাপাতের পরেই ভারতের শ্রমজীবী কৃষক সম্প্রদায় দুর্দ্দশাপন্ন হইতে লাগিল। এই জন্যই বলিতেছিলাম, সে আদিম সভ্যতায় ভারতের ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে তাহা বলিতে চাহি না, কিন্তু সেই জন্যই এখানকার কৃষকদিগের যে এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, ইহা নিশ্চয় কথা।

দুর্দ্দশা যদি একবার ঘটিল, ক্রমে তাহা আরো বাড়িল বৈ কমিল না। কৃষক সারাদিন পরিশ্রম করিয়া যে শস্য উৎপন্ন করে, এক তো তাহা বড় পরিবারে খাইতেই কুলায় না, তাহাতেও যদি সকলকে পেটে মারিয়া দুধের অভাবে ছেলেকে ফেন খাওয়াইয়া কিছু উদ্বৃত্ত করিতে পারে, তাহার বিনিময়ে অতি অল্প পয়সা পায়। মজুরির বেতন যদি অল্প হইল, কাজেই দরিদ্রতা আসিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। বাপের দরিদ্রতা ঘুচাইবার জন্য কৃষকপুত্র সেই শৈশব হইতেই লাঙ্গলের মুটি ধরিতে শিখিল। বিদ্যালোচনার সময় তাহার কোথায়? কাজেই মূর্খতা কৃষকদিগের বংশপরম্পরাশ্রিত হইয়া দাঁড়াইল। ইহাতেও দুর্দ্দশার শেষ হইল না। ইহার উপর আসিল দাসত্ব। যাহাদিগকে বসিয়া খাওয়াইবার জন্য—আহার নাই, নিদ্রা নাই—দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া মরে, সমাজের সেই সাবকাশ ভাগের লোক ক্রমে তাহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অত্যাচার আরম্ভ হইল। না হইবে কেন? তাঁহারা বুদ্ধ্যুপজীবী, বিধি বিধান, শাস্ত্র শাসন সকলি তাঁহাদের হাতে, তাঁহারা বুদ্ধি বলে সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা, তাঁহাদের অত্যাচার না হইবে কেন? এই অত্যাচারের নামান্তর—দাসত্ব।

দুর্দ্দশার কঠোর শৃঙ্খল ক্রমে আরো কসিয়া আঁটিয়া আসিল, যখন কর দিয়া জমি চাষ করিবার ব্যবস্থা আরম্ভ হইল। চাষা প্রাণান্ত শ্রম করিয়া যে শস্য উৎপন্ন করে তাহা আপনি খাইবে, কি পরিবারকে খাওয়াইবে, কি তাহা বেচিয়া তৈল লবণ কিনিবে, অথবা জমির খাজানা দিবে? আপনি পেটে খাও আর নাই খাও, পরিবার প্রতিপালন হউক ভাল, আর না

হউক ভাল, ছেলেটা ভাতের জন্য কাঁদিয়া প্রাণ বাহির করিতেছে তাহাও সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু জমির খাজানা না দিলে চলিবে না। যে বৎসর সুজন্মা হইল, সে বৎসর চাষা বাঁচিয়া গেল, কিন্তু যে বৎসর অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে অজন্মায় ফসল জন্মিল না, চাষা ধনে প্রাণে মারা পড়িল। কিস্তি খেলাপ হইলেই জমীদার জমিখানি কাড়িয়া লইবে; মহাজনও আপনার পাওনা গণ্ডা ছাড়িবে না। তখন উপায়? উপায়—উপবাস! অথবা জেল!

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই কৃষকদিগের এই অনন্ত দুর্দ্দশা। কিন্তু সকল ছাড়িয়া আজ আমরা কেবল বাঙ্গালার কৃষকদিগের কথা পাড়িলাম কেন? সে কথা পাড়িলাম এই জন্য যে, ভারত-গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি দাক্ষিণাত্য প্রদেশের কৃষকদিগের প্রতি অনুগ্রহদৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদিগকে মহাজনদিগের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন; কিন্তু সে হিসাবে বাঙ্গালার কৃষকদিগের জন্য কিছুই করা হয় নাই। কি ডেকান, কি বাঙ্গালা যখন সকল স্থানের কৃষকদিগের সেই একই দশা, যখন কাহারই দুর্দ্দশার সীমা নাই, তখন একজনকে রাখিয়া অপরজনের প্রতি এ অনুগ্রহ হইল কেন, তাহাই বলিতেছি। ডেকানের প্রতি গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে আঘাত পাই নাই, তবে কষ্ট হইয়াছে এই জন্য যে, সেই সঙ্গে বাঙ্গালার প্রতিও কেন সে কৃপাদৃষ্টি না হইল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভারতবর্ষের ভূমি বড় উর্ব্বরা, মাটী আঁচড়াইলেই এখানে চাষ হয়; এই সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে আবার বাঙ্গালার ভূমির ন্যায় উর্ব্বরা ভূমি আর নাই, সুতরাং অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বাঙ্গালায় সহজেই ফসল বহু পরিমাণে হইয়া থাকে। কৃষকেরা অল্প পরিশ্রমেই অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপাদন করে, তা ছাড়া আবার বাঙ্গালায় রপ্তানি বাণিজ্যের বন্দোবস্ত আছে। কাজেই সাধারণতঃ দাক্ষিণাত্য প্রদেশের প্রজাদিগের অপেক্ষা বাঙ্গালার প্রজাদিগকে কিছু সচ্ছল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সে সচ্ছলতা বাহ্যিক মাত্র, ভিতরে ভিতরে তুঁষের আগুনের ন্যায় দরিদ্রতা তাহাদিগকে হাড়ে হাড়ে দগ্ধ করিতেছে। যে বৎসর সুবৃষ্টি হয়, ফসল জন্মে, সেবার কৃষকদিগকে দেখিলে বেশ সুখের অবস্থার লোক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু তাহা কয় দিনের জন্য? প্রতি বৎসর যে সুজন্মা হইবে, তাহার নিয়ম নাই। অতি-

বৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের ভয় আছে, হাজা শুকা অনেক প্রকার আছে। যদি দুই বৎসর শস্য না জন্মিল, তাহা হইলেই চাষার দুঃখের আর অবধি থাকিল না। সে বাহ্যিক সচ্ছলতার অবস্থা দিয়া ভিতরের সর্ব্বাঙ্গগত দরিদ্রতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আর সমাজের আদিম সময় হইতে ধারাবাহিক রূপে যে সকল দুর্দ্দশা চলিয়া আসিতেছে তাহা তো আছেই। তবে বাঙ্গালার কৃষকদিগের এ শোচনীয় অবস্থা কি থাকায় সত্ত্বেও তাহাদের ডেকানের ভ্রাতারা আজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়াছে, কি পাপে তাহারা সে অনুগ্রহে বঞ্চিত রহিল?

দাক্ষিণাত্য প্রদেশের প্রজারা যে কারণে অত দুর্দ্দশাপন্ন বাঙ্গালায় সেই সকল কারণ সমান বর্ত্তমান। অনেকে বলেন, তাহারা যদিও এককালীন গভর্ণমেণ্টের নিকট খাজানা দেয় তথাপি তাহাদের দুর্দ্দশার শেষ নাই। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের উপর এত খাজানার ভার চড়াইয়াছেন যে, পেটে খাইয়া দু পয়সা বাঁচাইবার আর তাহাদের যো নাই। বাঙ্গালার কৃষকদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এককালীন গভর্ণমেণ্টকে কর দিতে হয় না। তাহারা জমীদারের খাজনা দেয়। জমীদারের খাজনা তহশীলের জন্য অনেক হাঙ্গামা আছে। কিন্তু সে সকল কথা পরে বলিব। গভর্ণমেণ্ট যে মহাজনদিগের নিষ্ঠুর হাত হইতে ডেকানের কৃষকদিগকে উদ্ধার করিতে তৎপর হইয়াছেন, বাঙ্গালায় সে মহাজনদিগের দৌরাত্ম্য তাহাপেক্ষা একটুও কম নহে। বাঙ্গালার একজন চাষাও মহাজনের গোলায় আগে তাহার ধান না উঠাইয়া দিয়া যে কখন আপনার গোলাজাত করিতে পারে ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। চাষা চিরকাল সে জন্য মহাজনকে দেড়ী সুদ দেয়। সুতরাং চাষা খাটিয়া খুটিয়া যে চাষ উৎপন্ন করে তাহার অধিক অংশ মহাজনের দেনা দিতে ফুরাইয়া যায়। এ দুঃখের কথা কাহাকেও বলিবার যো নাই। মহাজন নহিলে চাষার চলে না। অনেক সময় চাষাদের ভরসা, মহাজন। যিনি মহাজন, তিনি ছুরি শাণ দিয়া গৃহে বসিয়া আছেন, মূর্খ—দারিদ্র্য-পীড়িত—জমিদারের অত্যাচারে ভীত কৃষক আসিয়া পায়ে জড়াইয়া পড়িল। অলক্ষিতে মহাজন তাহার কলিজার উপর দিয়া সেই শাণিত ছুরিকা চালাইলেন। তখন কর্জ্জ পাইয়া আপাত-কষ্ট ভুলিয়া চাষা মনের হর্ষে

গৃহে ফিরিল। তারপর, পর বৎসর যখন ধান কাটার পর সুদ খতাইয়া মহাজনের দেনা দিতে গেল তখনই সর্ব্বনাশ। আর যে কিছুই থাকিল না, অথবা যাহা থাকিল তাহাতে এতগুলি পরিবারের সম্বৎসর চলিবে কেমন করিয়া? চাষা একবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। মহাজন আশ্বাস দিলেন, ভয় কি? যখন না থাকিবে, তখনই তিনি দিবেন। তিনি দিবেন—দেড়ী সুদে। সুতরাং চাষা সে বৎসরও ধার করিল। এ অবস্থায় মহারাজা পর্য্যন্ত দুই দিনে ফতুর হইয়া যাইতে পারেন, চাষা কোন ছার! মহাজনের প্রতারণায় চাষার সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল। সে যে আর কখনও আপনার অবস্থা ভাল করিতে পারিবে, তেমন সম্ভাবনাও আর থাকিল না। তাহাদের পায়ে দীনতা-শৃঙ্খল মহাজনেরা আরও দৃঢ় রূপে কসিয়া দিল। চাষারা মূর্খ, অত বুঝে না; অথবা বুঝিলেও পেটের দায়ে—বালকের ক্ষুধা-কাতরতায় ছটফটানিতে, আবার তার উপর জমীদারের উপদ্রবে তাহার বুদ্ধি লোপ পাইয়া যায়, হিতাহিত জ্ঞান আর তখন তাহার থাকে না। উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তি পাইতে পারিলেই বাঁচিয়া যায়। জানেনা যে, যে কণ্টকের সাহায্যে আজ তাহার পায়ের কণ্টকটী তুলিয়া ফেলিতে যাইতেছে, ইহার পর আবার তাহাই ফুটিয়া কত পীড়া দিবে। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহাদিগকে ইহা হইতে রক্ষা করা উচিত নয়? উচিত বলিয়াই তো বলিতেছি, গবর্ণমেণ্ট যেমন ডেকানের কৃষকদিগের প্রতি সানুগ্রহ দৃষ্টি করিয়াছেন বাঙ্গালার কৃষকদিগের প্রতিও সেই অনুগ্রহের চিহ্ন প্রদর্শন করুন। "বাড়ির" ধানে মহাজনেরা বড়মানুষ হইতে থাকিবে আর চাষারা খাইতে না পাইয়া দেড়ী সুদ দিয়া দুঃখের দহনে পুড়িয়া কতদিন জীয়ন্তে মরা হইয়া রহিবে? বাঙ্গালার কৃষকদিগের অবস্থা বড়ই শোচনীয়!

(ক্রমশঃ)

দেশীয় রাজগণের সৈন্য-ভঙ্গ।

মনুষ্যের স্বভাব এই যে, প্রতিদ্বন্দী ব্যক্তির নিকট এক বিষয়ে অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, শীঘ্রই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে আর সঙ্কুচিত হয় না। এই জন্যই নিজ ব্যক্তি প্রথম ত্যাগস্বীকার সামান্য

বা ন্যায়সঙ্গত হইলেও সহজে তাহাতে মত দিতে চাহেন না। উচ্চাভিলাষী মনুষ্য এ সম্বন্ধে ঠিক রুধির-লোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায়, তাহাকে শান্ত করিবার জন্য যতই রক্ত মাংস প্রদান কর, সে ততই উত্তেজিত ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে কখন কোন দেশীয় রাজাকে বিনা রক্তপাতে, শুদ্ধ বিচারাসনে বসিয়া পদচ্যুত করিতে সাহসী হন নাই। একন্য বরদার গুইকুমার মলহার রাও যখন রেসিডেণ্ট সার লুই পেলি কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হন, ও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে সংকল্প করিয়া তৎসম্বন্ধে প্রজাবর্গের মতাপেক্ষা করেন, তখন সাধারণমতের মুখস্বরূপ সংবাদপত্রের বিজ্ঞতম সম্পাদকগণ কেহই সে বিষয়ে মত দেন নাই। কেবল একজন মাত্র বঙ্গীয় সম্পাদক, তৎকালীক গবর্ণরজেনরেল বাহাদুরের প্রিয়পাত্র হইবার বাসনাতেই হউক, বা আপনার ভ্রান্তমতের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, সে বিষয়ের পোষকতা করিয়াছিলেন। মলহার রাও হয়ত বাস্তবিকই দোষী হইতে পারেন, হয়ত তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করাতে বরদা রাজ্যের মঙ্গলও হইয়া থাকিবে, কিন্তু তাঁহাকে পদচ্যুত করায় যে একটী বিষম রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, তাহার জন্য কে দায়ী? এই ব্যাপারের পর হইতেই লোকে বুঝিল যে, দেশীয় রাজগণের গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, তাঁহাদের স্বাধীনতার শেষ দশা উপস্থিত হইয়াছে, একজন সামান্য প্রজায় ও একজন দেশীয় রাজায় কোন সারবান প্রভেদ নাই, তাঁহাদের সহিত যে পবিত্র সন্ধিপত্র আছে তাহা পুরাতন পঞ্জিকা মাত্র। এক্ষণে তাঁহাদের সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহাই করা যাইতে পারে। বাস্তবিক ও এক্ষণে যে প্রকার দেখা যাইতেছে তাহাতে "রাজা"—এ শব্দ কেবল অর্থহীন উপাধি মাত্র।

রাজাদিগের ত এই প্রকার অবস্থা, সুতরাং তাঁহাদের সৈন্যভঙ্গ লইয়া আন্দোলন করায় গবর্ণমেণ্টের কোন ভয়ের বিষয় নাই। এ সম্বন্ধে দুই মত আছে; এক মতে বলে যে "তাঁহাদের সৈন্যগণ কোন কাজেই লাগে না, সুতরাং তাঁহাদের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়াই ভাল, কারণ কতকগুলা লোক সশস্ত্র থাকায় কখন না কখন গবর্ণমেণ্টের ভয়ের বা ক্ষণিক কষ্টেরও কারণ হইতে পারে।" অপর পক্ষের

লোক বলেন যে, “দেশীয় রাজাগণের সৈন্য সকল যদিও অস্ত্র-ব্যবহার দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিতেছে না, তাহা বলিয়া তাহারা অনাবশ্যক নহে, তাহাদের উপস্থিতিতে রাজ্য মধ্যে কোন উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে না, সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। এই সকল সৈন্য আবার যে প্রকার যুদ্ধকুশল তাহাতে তাহাদের কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্টের কোন ভয়েরই কারণ নাই, তাহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেও অনায়াসেই তাহাদিগকে পরাস্ত করা যাইতে পারিবে। কোন স্থলে যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে বরং ইহাদের দ্বারা অনেক কাজ পাওয়া যাইবে, রসদাদি এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হইলে ইহারা অল্প ব্যয়ে তাহার রক্ষকতা কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে।” এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণের যুক্তিই আমাদের সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সৈন্যগণ অকর্ম্মণ্য হইলেও তাহা দেশীয় রাজগণের ও তাঁহাদের প্রজাবর্গের অভিমানস্থল, সুতরাং তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া গবর্ণমেণ্ট কেবল অকারণ বিরাগভাজন হইবেন।

আরও দেখা যাইতেছে যে, এই রাজাগণের সৈন্য সামন্ত থাকা গবর্ণমেণ্টের একটী বিশেষ গৌরবের কারণ। ভিতরের কথা যাহাই হউক, ইয়ুরোপ ও অন্যান্য দেশের রাজাগণ জানেন যে ইংরাজেরা ভারতবর্ষে অনেক প্রবলপরাক্রান্ত নৃপতির অধীশ্বর ও সেই নৃপতিগণ তাঁহাদের পরম অনুগত। তাহারা জমীদার বা সামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রেণীভুক্ত হইলে কি গবর্ণমেণ্টের প্রতাপ ও যশের লাঘব হইবে না? আর এক্ষণে ভয়েরই বা এমন কি কারণ উপস্থিত হইয়াছে যে এই [illegible] বিষয় লইয়া এত আন্দোলন চলিল? ইহাতে যে শুদ্ধ রাজাগণের মনে অকারণ কষ্ট দেওয়া হইতেছে এমত নহে, তাঁহাদের অকৃত রাজ-ভক্তিকেও আহত করা হইতেছে। আমরা গবর্ণমেণ্টের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বলিতেছি যে তাঁহারা রাজভক্ত ভারতবাসীর প্রতি অকারণ সন্দেহ করিয়া তাহাদের বিরাগভাজন হইবেন না। তাহারা যে পুনঃ পুনঃ রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছে তাহার কি এই পুরস্কার? সিপাহী বিদ্রোহকালে ভারতবাসীগণ, বিশেষতঃ দেশীয় রাজগণ আপন জীবন পর্য্যন্ত বিপদগ্রস্ত করিয়াও যে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই, তাহার প্রতিশোধ কি তাঁহাদিগকে নিরস্ত্র করা, তাহাদের

আত্মরক্ষার উপায় পর্য্যন্ত কাড়িয়া লওয়া ? কৃতজ্ঞতা ! যখন সভ্যতাভিমানী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও এ প্রকার প্রতিশোধ দেখাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তখন কে আর তোমার আদর করিবে ? যদ্যপি প্রজার অনুরাগ রাজার সুখের ও মঙ্গলের কারণ হয়, তাহা হইলে আমরা সরল হৃদয়ে আমাদের দয়িত্বসম্পন্ন রাজপুরুষগণকে পরামর্শ দিতেছি যে, তাঁহারা এ বিষয়ের আন্দোলন পরিত্যাগ করুন। প্রেস অ্যাক্টের গলেৎ আরমস্ অ্যাক্ট প্রভৃতি কলঙ্ক সকল মোচন করুন ও আপনাদিগকে নবপরাজিত শত্রুর মধ্যস্থিত মনে না করিয়া বিশ্বস্তভাবে রক্ষকশূন্য হইয়া ভারতের পথে পথে, ঘাটে ঘাটে, ঘরের রাজার ন্যায় ভ্রমণ করুন। দেখিবেন, ভারতবাসীর রাজভক্তি কি উপাদানে নির্ম্মিত। তাহা হইলে ব্রিটিশরাজকে আর রুশরাজের ভয়ে কম্পিত হইতে হইবে না, ইংরাজ মানবের অজেয় হইবেন ও তাঁহাদের কীর্ত্তি পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। পৃথিবীর নিয়ম এই যে, একদল শাসন করিবে ও আর একদল শাসিত হইবে। তবে আমরা রাজাধীন থাকিতে কষ্ট বোধ করিব কেন ? যিনিই কেন রাজা হউন না, তিনি ন্যায়বান্ ও আত্মীয় হইলেই আমাদের ভক্তির পাত্র হইবেন ও আমরা তাঁহার জন্য অকাতরে শরীরের রক্ত ঢালিয়া দিব। ন্যায়পরতা ও আত্মীয়তাকে ভাল না বাসে এমত লোক কি এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে ? আমাদের রাজপুরুষগণের মধ্যে অবশ্যই অনেক রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা কি জানেন না যে লৌহময় শাসন পরিণামে কখন সুখপ্রদ হয় না ? ইতিহাস এ বিষয়ে উচ্চৈঃস্বরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইংরাজগণ এদেশ এই নূতন অধিকার করেন নাই, তাঁহাদের রাজত্বকাল শতবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে, এখনও কি তাঁহাদের ভয় ভাঙ্গিল না, এখনও কি তাঁহারা আমাদের হইতে পারিলেন না ? যদ্যপি তাহা না পারিয়া থাকেন তবে তাঁহাদের রাজত্বকে ধিক্, তাঁহাদের রাজনীতিকে ধিক্ ও তাঁহাদের সভ্যতাকে ধিক। এত দিন, এত ঘনিষ্ঠতার পর প্রেস্ অ্যাক্ট, আরমস্ অ্যাক্ট প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা দেখিয়া ইংলণ্ডের শত্রুদল কি মনে করিবে ? সুসভ্য ইয়ুরোপবাসিগণই বা কি ভাবিবেন ? তাঁহারা কি ইংরাজদিগকে, হয় দারুণ অত্যাচারী ও নিতান্ত রাজনীত্যনভিজ্ঞ, না হয় একেবারে হীনবীর্য্য

মনে করিবেন না? প্রজাকে রাজভক্ত বা রাজবিদ্রোহী করা রাজার হাত। সত্য বটে কোন দেশ নূতন জয় করিলে কিছু দিনের জন্য কঠোর নিয়মাবলি আবশ্যক হয়, কিন্তু শাসন একবার বদ্ধমূল করিতে পারিলে—প্রজাদিগের রাজার ন্যায়পরতার উপর একবার বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলে—আর কঠোর নিয়মের প্রয়োজন থাকে না। কোন্ সকল লোক যে গবর্ণমেণ্টকে কঠোর নিয়ম সংস্থাপনে পরামর্শ দেয় তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি। যাহাদের দায়িত্ব নাই, যাহারা প্রজার উপর অত্যাচার করে, যাহারা গবর্ণমেণ্টের দোহাই দিয়া ভাণ্ডার লুঠ করিয়া খায় ও যথার্থ অধিকারীগণকে স্বীয় স্বাভাবিক স্বত্বে বঞ্চিত রাখিতে চায়, তাহারাই এ প্রকার পরামর্শদাতা; কারণ, তাহারা আপনাদিগের কার্য্যদ্বারা বুঝিতে পারে যে, লোক তাহাদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভব। পাপীর মন সর্ব্বদাই শঙ্কিত, সুতরাং প্রজাদিগকে নিরস্ত্র ও নির্ব্বাক করিতে তাহারা কেন না পরামর্শ দিবে? এই সকল লোকই রাজগণের সৈন্যভঙ্গের আন্দোলনকারী। গবর্ণমেণ্ট হয়তঃ এ বিষয়কে মনে স্থান দিতে চাহেন না, কেবল এই সকল লোকই সংবাদপত্রাদিতে এতৎ-সম্বন্ধে আন্দোলন করিতেছে। কিন্তু ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কি কোন স্বার্থ আছে? কিছু না। গবর্ণমেণ্ট পুনঃ পুনঃ দেশীয় রাজাদিগের অকপট মিত্রতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং তাহাদের সৈন্যগণ যে কেবল শোভার্থ তাহাও বিলক্ষণ অবগত আছেন, তবে কি কারণে সৈন্যভঙ্গ লইয়া আন্দোলন হইল? গবর্ণমেণ্ট কুপরামর্শিগণের চক্রে পড়িয়া নিরপরাধে গরিব প্রজাদিগকে অস্ত্রশূন্য করিয়াছেন, এক্ষণে আবার কি দেশীয় রাজাদিগের অস্ত্র কাড়িয়া লইবেন? কে জানে, কিন্তু এই দুরূহ ব্যাপার যে সহজেই সম্পাদিত হইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে? ইহাতে যে মহৎ পবিত্র সন্ধিপত্র ভঙ্গ করা হইবে এমত নহে, হতভাগ্য ভারতবাসীদিগকে প্রাচীন ব্রিটন জাতির ন্যায় নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় নিক্ষেপ করা হইবে; কিছুদিন পরে ভারতবাসীগণ অস্ত্র দর্শনমাত্রেই মূর্চ্ছিত হইবে। ইহা কি সভ্যাভিমানী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের গৌরবের কারণ? অসভ্য রাজারাও এ প্রকার ভীরুতাকে মনে স্থান দেন না।

আফগান যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া প্রজাদিগকে নিরস্ত্র করা হয়, এক্ষণে সে কারণ অন্তর্হিত হইয়াছে, তবে গবর্ণমেন্ট এ কলঙ্কভার আর কেন বহন করেন? ইংলণ্ড এক্ষণে লিবারেল গবর্ণমেন্ট দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, ভারতবাসীগণ তাঁহাদের পদপ্রাপ্তিতে অনেক আশা করিয়াছিল, ভরসা করি, তাহাদের সেই আশা নিষ্ফল হইবে না। অকারণ সন্দেহ করিয়া নিরপরাধ, রাজভক্ত ভারতবাসীর মনে যে কষ্ট দেওয়া হইতেছে, তাহা তাঁহারা নিবারণ করুন। ভারত অধিক বাঞ্ছা করে না, শুদ্ধ কথা কহিবার ও আত্মরক্ষা করিবার স্বত্ব প্রার্থনা করে, যখন প্রথম স্বত্বটী প্রদান করা হইল তখন দ্বিতীয়টী কেন প্রদান করা না হইবে? স্বাধীনতাপ্রিয় ইংলণ্ড কি উনবিংশশতাব্দীতে একটী ক্রীতদাস জাতির উপর আধিপত্য করিতে চাহেন?

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মল্লিক।

বাণগড়।

(চতুর্দ্দশপদী)

বাণ নৃপতির* প্রিয় "শোণিত নগর"
ছিলে তুমি, নির্ভয়ে করেছ প্রদর্শন *
ঊষা-পরিণয়ে বিশ্বে বীরত্ব-ক্রীড়ন।*
কিংবা পালবংশ বীর নৃপতিনিকর
তব বক্ষে বিহার করেছে নিরন্তর। †

* দিনাজপুর নগরের দশক্রোশ দক্ষিণে "বাণগড়" নামে প্রসিদ্ধ একটি ধ্বংসাবশিষ্ট বনাকীর্ণ রাজপুরী আছে। দিনাজপুরবাসিগণ বলিয়া থাকেন, ঐ পুরী বাণ রাজার রাজধানী ছিল। তদনুসারে উহার পূর্ব্বনাম "শোণিত-পুর" বা "শোণিত নগর"। ঊষা বাণের কন্যা ছিলেন। পাঠকবর্গ বোধ হয় ঊষাহরণ ঘটনা অবগত আছেন।

† কেহ কেহ বলেন এ পুরী পালবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল। এই কথাই অধিকতর প্রমাণ্য বলিয়া বোধ হয়। এমন অনেক হেতু উপস্থিত

না চাহি জানিতে—আছে কিবা প্রয়োজন
সংশয়িত ইতিহাস করি আলোড়ন ?
এই মাত্র জানি মনে ওহে পুরবর !
আপন উন্নতিদিনে ছিলে অনুক্ষণ
বীরতার-গৌরবের মনোজ্ঞ নিলয়।
সে হেতু এখন' দর্পপূর্ণ তব মন
(যদিও হয়েছ এবে তুমি বনময়) ;
ভীরু বলি বাঙ্গালিরে করিয়া বর্জ্জন
নির্ভর শার্দ্দূলে হৃদে দিয়াছ আশ্রয়।

রাজা গণেশ।

(চতুর্দ্দশপদী)

ভীরুতা-তামসীময় এ বঙ্গ-গগনে
তুমি শুক্রতারা দীপ্ত নৈদাঘ বিভায়—
নাশিয়াছ যবন-তিমির-অন্তরায়
নিরমল সমুজ্জ্বল প্রতাপ কিরণে।
হে নৃপতি ! পক্ষপাতবর্জ্জিত শাসনে
পালিয়াছ প্রজাকুলে দাশরথি-প্রায়,
সমান যবন হিন্দু তব করুণায়—
সমান বাঁধিলে দোঁহে ভক্তির বন্ধনে।
তাই জীবনান্তে তব ল'য়ে মৃতকায়
দুই জাতি মাঝে এত বিরোধ ঘটন।*

করা যাইতে পারে, যদ্দ্বারা বাণ যে এ দেশের রাজা ছিলেন না ইহা প্রমাণিত করিতে পারা যায়।

* বঙ্গে স্বাধীন পাঠান রাজত্বকালে দিনাজপুর প্রদেশের অন্তর্গত বিঠুর নামক স্থানে গণেশ নামা জমিদার ছিলেন। তিনি বঙ্গের তৎকালীন মুসলমান নৃপতি শিহাব উদ্দীনকে যুদ্ধে নিহত করিয়া স্বয়ং স্বাধীন রাজা

যে শুনিলা সেই কথা, মানিলা বিস্ময়,
শত মুখে তব গুণ করিলা কীর্ত্তনী।
ধন্য বঙ্গভূমি হৃদে করিয়া ধারণ
তোমা হেন গুণরত্ন নৃপতিভূষণ।

রামগোপাল ঘোষের জীবনী

কোন জীবনবেত্তা বলেন যে, ইতিহাস অপেক্ষা জীবনচরিত পাঠ করিলে মনুষ্যজীবনের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে, কারণ, ইতিহাসে একত্রে বহুলোকের জীবনী লিখিত হয়, ইহা ব্যতীত যুদ্ধ, বিগ্রহ, সন্ধি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয় বর্ণিত হয়, সুতরাং কাহারও প্রতি পাঠকের মন তাদৃশ আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু একজনের জীবনচরিত পাঠ করিলে তাঁহার প্রতি আমাদের বিশেষ সহানুভূতি হয়, তাঁহার বিপদে আমরা নিজের বিপদ জ্ঞান করি, তাঁহার উদ্ধারে আমরা আহ্লাদিত হই, তাঁহার সাংসারিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা বিশেষ উপকার পাইয়া থাকি। বাস্তবিক, এ কথা যে সত্য তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। তাহা বলিয়া কাহারও যে ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা কমিবে তাহা আমরা সহ্য করিতে পারিব না। জীবনচরিতের মধ্যে আবার যে ব্যক্তি সামান্য অবস্থা হইতে সৎপথে থাকিয়া আপনার অবস্থার উন্নতি করিয়া বিশেষ সুখ্যাতির সহিত ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এবং কেবল আত্মীয়

হন। এই ঘটনা খৃষ্টীয় ১৪০৫ অব্দে ঘটে। গণেশ অপক্ষপাতে সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি সকলেরই এতদূর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যু হইলে হিন্দু এবং মুসলমানেরা স্বস্ব মতে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত করিবার নিমিত্ত ঘোরতর বিরোধ করিয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই সমস্ত লিখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীতারণবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

স্বজনের উপকার করিয়া বিরত না থাকিয়া স্বদেশের উপকারের জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এরূপ মহাত্মার জীবন পাঠে সাধারণের উপকার হইতে পারে।

বড় দুঃখের বিষয় এই, এদেশে জীবনচরিতের সে রূপ আদর নাই, বিশেষত স্বদেশীয় লোকের জীবনচরিত পাঠে এদেশীয় লোকের সেরূপ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেকে বরং ম্যাট্‌সিনি বা গ্যারিবল্ডি নেপোলিয়ান বা ওয়েলিংটনের জীবনচরিত আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বদেশীয় মহাত্মার জীবনচরিত পাঠে তাঁহাদের সেরূপ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভিন্নদেশীয় মহাত্মাগণের জীবনী অপেক্ষা স্বদেশীয় মহাত্মাদিগের জীবনীতে আমাদিগের অধিক সহানুভূতি জন্মায়, সুতরাং তাহা অধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

এই সকল বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া অদ্য আমরা মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের জীবনী লিখিতে আরম্ভ করিলাম। সামান্য অবস্থা হইতে কিরূপে কেবল নিজের অধ্যবসায় ও যত্নে আপনার অবস্থার উন্নতি করিতে হয়, এবং আপনার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের ও উন্নতির প্রতি কিরূপ যত্ন করিতে হয়, মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নানা প্রকার সাংসারিক এবং বৈষয়িক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি দেশের মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন।

সন ১২২১ সালের কার্ত্তিক মাসে (ইং ১৮১৫ খৃঃ অক্টোবর) রামগোপাল মাতামহ দাওয়ান রামপ্রসাদ সিংহের কলিকাতায় বেচুচাটুর্য্যের লেনের ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, হুগলি-জেলায় ত্রিবেণীর সন্নিকট বাগাটী গ্রামে তাঁহার বাসস্থান এবং কলিকাতার চিনাবাজারে তাঁহার একখানি সামান্য কাপড়ের দোকান ছিল। রামগোপাল প্রথমে কিছুদিন পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষা করেন, তাহার পর সেরবোর্ণ (Sherbourne) সাহেবের স্কুলে ইংরাজী শেখেন। কিন্তু শৈশবাবস্থায় লেখা পড়ায় তাঁহার তাদৃশ মনোযোগ ছিল না, তিনি সর্ব্বদাই খেলা করিয়া বেড়াইতে ভাল বাসিতেন। ১৩ বৎসর বয়ক্রমের সময় তিনি হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন, এবং এই খানেই তাঁহার ভবিষ্য মহত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। এই

রূপ কথিত আছে যে, তাঁহার নাম প্রথমে "গোপালচন্দ্র" ছিল, হিন্দু-কালেজে প্রবেশের সময় প্রধান শিক্ষক তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করাতে তিনি হঠাৎ কেবল "গোপাল" বলিয়া ফেলেন। শিক্ষক জিজ্ঞাসা করেন—"তোমার নাম কি তবে রামগোপাল?" তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই নাম স্বীকার করেন। সেই অবধি তাঁহাকে সকলে রামগোপাল বলিয়া ডাকিত।

রামগোপাল হিন্দুকালেজে পাঠ অভ্যাস করিতে লাগিলেন। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের যেরূপ পাখীপড়ান শিক্ষাপদ্ধতি হইয়াছে, তখন এ প্রকার ছিল না। বালকেরা যাহাতে কিছু শিখিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই তখন পাঠনাকার্য্য চলিত; আজকালের পাশকরা আর তখনকার লেখাপড়া কিছু শিখা এ দুইয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। শিক্ষাবিভাগের তখন এত ধুম ধাম ছিল না বটে, কিন্তু যাহা ছিল, তাহা ভালই ছিল; এমন পল্লবগ্রাহিণী শিক্ষাপদ্ধতি ছিল না। তা ছাড়া, কলেজে মাঝে মাঝে বালকদিগের উন্নতির জন্য ডিবেটিং ক্লব বসিত। সে প্রকার ডিবেটিং ক্লব আজকাল আর দেখা যায় না। যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তাহার ছায়া মাত্র। মিষ্টার ডি রোজারিও তাঁহার ছাত্রদিগকে লইয়া সেই ক্লবে অনেকানেক বিষয়ের মীমাংসা করিতেন। সভা করিয়া লম্ফ ঝম্প করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সভায় যে বিষয়ের প্রস্তাব হইবে পাঁচজনে মিলিয়া তর্কবিতর্কের পর তাহার সদুপায় স্থির করিয়া সেই মত কার্য্য করাই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। ছাত্রেরা গুরুর দৃষ্টান্ত দেখিয়া সেইমত কার্য্য করিতে প্রাণ পণ করিত। তখন আমাদের সমাজের বড়ই হীন অবস্থা। এখনকার মেলেরিয়ার ন্যায় গোঁড়ামি সকলের হৃদয়কে দূষিত করিত। ডিরোজারও তাঁহার ছাত্রসৈন্য লইয়া সেই গোঁড়ামির বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিলেন। অনেকে আসিয়া সেই সৈন্য মধ্যে যোগ দিল। রামগোপাল সেই পঠদ্দশায় তাঁহার সেই সহপাঠী-সৈন্যদলে প্রবেশ করিলেন। ডি রোজারিওর দীক্ষা-মন্ত্র সর্ব্বাগ্রে রামগোপলের কর্ণে গিয়া স্থান লাভ করিল। অচিরাৎ রাম গোপাল পিতৃধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার জীবনের প্রথম অঙ্ক দেখিয়া কেহ হর্ষ প্রকাশ করিল, কেহ বা দুঃখের অশ্রুতে বক্ষঃ প্লাবিত করিল। খ্রীষ্টান আনন্দিত হইল, হিন্দু কাঁদিল। আমরাও এখনও

কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাই ভাবি, অমন একজন বড় লোক—আহা! যদি স্বধর্ম্মে থাকিতেন!

কেহ হাসুক বা কেহ কাঁদুক, সময় কাহারও অপেক্ষা করে না, সেই সময়ের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া রামগোপালের জীবন-স্রোত বহিয়া চলিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলভিন কোম্পানির একজন মেম্বর এণ্ডারসন সাহেব ডেভিড হেয়ার সাহেবের নিকট জনৈক নূতন সদাগর জোসেফ সাহেবের জন্য একজন সহকারি কর্ম্মাধ্যক্ষের উপযোগী যুবক চাহিয়া পাঠান। হেয়ার ইতিপূর্ব্বে রামগোপালের অসাধারণ অধ্যবসায়, বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যপটুতার পরিচয় পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; তিনি সেই কার্য্যের জন্য রামগোপালকে মনোনীত করিলেন। রামগোপালের বয়ঃক্রম তখন ১৭ বৎসর মাত্র। রামগোপাল সেই নূতন কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াই কলিকাতায় এবং তাহার বাহিরের সকল স্থানের বাজারদর এবং দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই সে অধ্যয়নের ফল ফলিল।

দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে শর্করা তাঁহার মনকে বিশেষরূপ আকৃষ্ট করিল। কারণ, ঐ সময়ে উহাই বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্য ছিল। বঙ্গদেশের যে সকল অঞ্চলে চিনির কারখানা আছে স্বয়ং সে সকল অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এখনকার ন্যায় তখন চিনি মরিস্‌দ্বীপ কিম্বা আর কোন স্থান হইতে আমদানী হইত না, সুতরাং এই ব্যবসায়ে তখন বিলক্ষণ লাভ হইত। এই সময় তিনি রেশমের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ জানিবার জন্যও ঘাটাল, কাসিমবাজার প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। যে কোন কর্ম্ম তাঁহাকে করিতে দেওয়া হইত, তিনি কিছুতেই পরাঙ্মুখ নহেন এবং কোন রূপ পরিশ্রমে তিনি কাতর হইতেন না। তিনি প্রত্যহ সমস্ত দিন একজন সামান্য সরকারের ন্যায় বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, যখন একটু অবসর পাইতেন, তখন আহার করিতেন। এই রূপ গুরুতর পরিশ্রমের দ্বারা তিনি যাহা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, সে শিক্ষা তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল। এই সময় হইতে তিনি কিছু গম্ভীর হইতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে বাবু রসিক কৃষ্ণ মল্লিক জ্ঞানান্বেষণ নামক একখানি সংবাদ পত্র চালাইতেন। রামগোপাল ঘোষ মাঝে ২ তাহাতে প্রবন্ধ লিখিতেন। সে প্রবন্ধ দেখিয়া একদিন লর্ড বেণ্টিক পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। রসিক বাবু কিছু দিনের পর ডেপুটী কলেক্টরের পদে নিয়োজিত হইয়া মফঃস্বলে গমন করেন। তখন রামগোপাল সেই সংবাদ পত্রের সম্পাদক হইলেন। দুঃখের বিষয়, সে পত্রখানি টেকিল না, কিয়ৎকাল পরে তাহা উঠিয়াগেল। রামগোপাল অবশ্য পত্রখানির পরিণাম দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি শিক্ষার উন্নতির জন্য যে মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার যত্নে এবং চেষ্টায় সে সময়ে শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। রামগোপাল বেশ বুঝিয়াছিলেন, তখনকার শিক্ষিতসম্প্রদায় (ঠিক আজকালেরই মত) কলেজ ছাড়িলেই শিক্ষিত বিষয়গুলি ক্রমেং ভুলিয়া গিয়া সংসারের সাধারণ ব্যক্তিমণ্ডলী মধ্যে আপনাদিগকে মিশাইয়া ফেলিতেন। তাঁহাদিগের সে জ্ঞান লিপ্সা, সে অধ্যয়নশীলতা, সে অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণগ্রাম সংসার বায়ু হিল্লোলে ক্রমে ক্রমে শীতল হইয়া কমিয়া আসিত। সাধারণ ব্যক্তিদিগের হইতে তাঁহাদের অতি অল্পই প্রভেদ থাকিত। রামগোপাল এই সমস্ত বুঝিয়া, ইহার প্রতিকারের জন্য একটি জ্ঞানদায়িনী সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। খৃষ্টীয় ১৮৩৯ শকে সে সভা প্রথম প্রতিষ্ঠাপিত হয়। এই সভার যে তিনখানি কার্য্যবিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সে সময়ে উহা দ্বারা সমাজের যে কত মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। রামগোপাল "বেঙ্গল স্পেক্‌টেটার" বলিয়া এই সময়ে একখানি কাগজ বাহির করেন। তাঁহার অন্যতম বন্ধু বাবু প্যারিচাঁদ মিত্র তাহার সম্পাদকের কার্য্য করিতেন। বাস্তবিক, রামগোপাল আপিষে ডেস্ক কোলে করিয়া বসিয়া সারাদিন খাটিয়াও যেরূপ অধ্যবসায়ের সহিত দেশের সাহিত্য এবং রাজনীতি লইয়া আলোচনা করিতেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এই সময় হইতে অর্থ সম্বন্ধেও তাঁহার অদৃষ্ট ফিরিল। সে সব কথা পরে বলিতেছি।

(ক্রমশঃ)

স্বার্থ ও সমাজ।

এ পৃথিবীতে স্বার্থের উপাসনা বড়ই দেখিতে পাই। অমুক কার্য্য কর, ভাল হউক মন্দ হউক, উহা করিলে স্বার্থ বজায় থাকিবে, মানুষ তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতেছে। অমুক কার্য্য করিও না, করিলে অন্যের ভাল হইবে বটে, কিন্তু তোমার স্বার্থের হানি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, মানুষ প্রাণ গেলেও সে কার্য্য করিবে না। এই স্বার্থ রক্ষার জন্য মানুষ অক্লেশে তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি বলি দিতে পারে, কিন্তু প্রাণ থাকিতে ইহা ত্যাগ করিতে পারে না। ইংরাজ এক মুষ্ট্যাঘাতে একটা হতভাগ্য কুলির প্লীহা ফাটাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু আপনার বর্ণমর্য্যাদার স্বার্থ ছাড়িতে পারেন না, বাঙ্গালী আপনার মানমর্য্যাদা সকল বিসর্জ্জন দিয়া পরের জুতা বহিতে পারে, কিন্তু চাকরির স্বার্থ ছাড়িতে পারে না। জমিদার নিরীহ প্রজার ঘর জ্বালাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু খেতাবের স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারেন না। কুলেরবালা অর্থ-চেষ্টায় বিদেশগত স্বামীর বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু বেশভূষার স্বার্থ ছাড়িতে পারেন না। মানুষ স্বার্থের গোলাম।

এ স্বার্থ কি? ইহার অপর নাম স্বাতন্ত্র্য-জীবন। ইংরাজেরা ইহাকে (Individualism) বলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ইহার আদর বড় বেশী। পূর্ণ সুখ উপভোগ করিবার জন্যই মানুষ এ পৃথিবীতে আসিয়া জন্মিয়াছে। সুখ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমার সুখ আমার উদ্দেশ্য, আমি যাহাতে সুখ পাই, আমি তাহাই করিব, অপরের নিমিত্ত ভাবিব কিসের জন্য? তাহা হইলে পূর্ণসুখ উপভোগ হইল কৈ? স্বাতন্ত্র্য-জীবন ভিন্ন পূর্ণ সুখ উপভোগ করা যায় না। স্বার্থই সে স্বাতন্ত্র্য-জীবনের অস্থি মজ্জা। স্বার্থ না থাকিলে স্বাতন্ত্র্য কোথায়? স্বাতন্ত্র্য মনুষ্যের সৌন্দর্য্য, সে সৌন্দর্য্য না থাকিলে মানুষের আর রহিল কি? এ সব কথা যে সে লোকে বলে না। মিল্ (Mill), স্পেন্সর (Spencer) প্রভৃতি মহামনস্বী দার্শনিকগণ এই মতের উদ্ভব করিয়াছেন।

কিন্তু এ মত কি ভাল? এ সংসারে মানুষ যখন প্রথম একা আসিয়াছিল, যখন সে আপনা বৈ আর কাহাকেও জানিত না, তখন এ স্বার্থময় স্বাতন্ত্র্য-জীবন চলিতে পারিত; কিন্তু মানুষ যখন একা না থাকিয়া এখন বহু পরিবারে মিশিয়াছে, বংশবৃদ্ধি নিয়মে বাধ্য হইয়া সে যখন সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন আর সে স্বাতন্ত্র্য-জীবন চলিতে পারে না। সামাজিক জীবনে স্বার্থ অনর্থের মূল, একতার এখানে অনিবার্য্য প্রয়োজন। যে নিয়মে বাধ্য হইয়া মানুষ সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহাকে উচ্চতর হৃদবৃত্তি সকল সম্পূর্ণ রূপে প্রসারিত করিতে হইবে, অপরের সুখের দিকে চাহিতে হইবে, সুতরাং স্বার্থের মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। স্বার্থের মূলোচ্ছেদ হইলে যে পূর্ণ সুখ উপভোগ করা যাইতে পারে না, এ মতে আমাদের আস্থা নাই। অথবা এ মত তত যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এ সম্বন্ধে কোমৎ (August Comte) অনেকটা ঠিক্ বলিয়াছেন। তাঁহার অপেক্ষা আমাদের ঋষিদের মত আরও উচ্চতর। সামাজিক জীবনে সুখকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবনের উদ্দেশ্য না করিয়া পরম্পরা সম্বন্ধে উদ্দেশ্য করিতে হইবে, অর্থাৎ আত্মসুখ ভুলিয়া গিয়া এখানে অপরের সুখকেই প্রধান লক্ষ্য করিতে হইবে, অপরের জীবনের সঙ্গে আপনার জীবনকে মিশাইয়া ফেলিতে হইবে, সুতরাং স্বার্থের মূলোচ্ছেদ করিয়া নিস্বার্থপরতাকে প্রধান সহায় করিতে হইবে। তাহা না হইলে, প্রেম জন্মে না; পরের সঙ্গে একীভূত হইয়া তন্ময় হওয়া যায় না। আত্মসুখের স্থানে পরসুখকে জীবনের উদ্দেশ্য করিলে, যে পূর্ণ সুখ উপভোগ করা হয়, ইহা আরও অনেকে স্বীকার করেন। চিন্তাশীল ধীরপ্রকৃতি কারলাইল (Carlyle) এ মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেন।

আর মিল্? যে মিলের কথা আগে বলিয়াছি, সে মিল্ কি বলেন? পরজীবনে তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুখকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবনের উদ্দেশ্য (direct end) করার জন্য পূর্ব্বে তাঁহার যে মতের কথা উল্লেখ করিয়াছি, বিজ্ঞান-গতপ্রাণ পণ্ডিত পরে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তখন বলিয়াছিলেন— "আমার বিবেচনায় তাঁহারাই একমাত্র সুখী ব্যক্তি, যাঁহারা আত্মসুখ

নিমজ্জন দিয়া, অন্য কোন বিষয়ের প্রতি, কিম্বা অপরের সুখের প্রতি, অথবা মানবজাতির উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছেন; এবং কোনও কার্য্যকে উদ্দেশ্যের উপায় মনে না করিয়া, তাহাকেই মনসিজ উদ্দেশ্য ভাবিয়া তাহার অনুসরণ করিতে পারিয়াছেন। একবার আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি, তুমি সুখী কি না; এখনই দেখিবে, তুমি সুখী নহ। সুখকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবনের উদ্দেশ্য না গণিয়া, তাহার অতীত কিছু লক্ষ্য করাই সুখ-আয়ত্তির একমাত্র উপায় *।" স্বাতন্ত্র্য ছাড়িলা ইহা হইল, সমাজের কথা। সমাজ নিস্বার্থপরতার রাজা; স্বার্থের এখানে নাম গন্ধও নাই।

(ক্রমশঃ)

দেঁতোর হাসি।

আর হাসির কথা বলিও না। পোড়া মুখ বোজে না, তাই দাঁত বাহির হয়; নহিলে হাসিতে আর ইচ্ছা নাই। হাসি আসিবেই বা আর কোথা হইতে? তোমরা নবীন, রসিক, হাস্যপ্রিয়—তোমরা আমার এ কথা বুঝিবে না। আমার এ প্রাণের ভিতর যে কত দুঃখের খরস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, কত যন্ত্রণার আগুন যে রাবণের চিতার ন্যায় হৃদয়ের পরতে পরতে অহরহঃ জ্বলিতেছে, তোমরা হাসির তরঙ্গে প্রমোদের পাল তুলিয়া যৌবনতরি ভাসাইয়া চলিয়াছ, তোমরা তাহার কি বুঝিবে?

জানি, এ দোষ তোমাদের নয়। তোমাদের আশে পাশে চারিদিকে হাসির তুফান—সরোবরে ভ্রমর গুঞ্জনে মাতিয়া উঠিয়া সরোজিনী হাসিতেছে, বাগানে সখের গোলাপ মল্লিকা আপনার সৌরভে আপনি বিভোর হইয়া হাসিয়া হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে, চাঁদ হাসির রাশি ছড়াইয়া দিতেছে, নদীর জল সেই হাসির সঙ্গে জড়াজড়ি করিতে করিতে উছলিয়া উছলিয়া

* Those only are happy (I thought) who have their minds fixed on some object other than their own happiness, on the happiness of others, on the improvement of mankind, even on some art or pursuit, followed not as a means, but as itself an ideal end. * * * Ask yourself whether you are happy, and you cease to be so. The only chance is to treat, not happiness, but some end external to it, as the purpose of life.
Mill's Autobiography.

চলিতেছে, আর তোমাদের কামিনী জামিনী দামিনী যামিনী রঙ্গিনীর দল রসের হাটে হাসির বাজার খুলিয়া নিতুই কত বিকি কিনি করিতেছে ;— তোমাদের চারিদিকে হাসির জ্যোৎস্না, হাসির রাশি, হাসির মেলা। তোমরা আমার এ দুঃখের কাহিনী বুঝিবে কেন ? এ দোষ তোমাদের নয়।

আমারই কপাল। কে জানে, কার পাকা ধানে মই দিয়াছি, ইহারই মধ্যে হাসির পত্রে ইতি লিখিতে হইল। হাসির উপর আর আমার দাবি দাওয়া নাই, একেবারে তাহার আখিরি করিয়া ফারখতি লইয়া বসিয়াছি। এ জন্মে এই পর্য্যন্ত রোখ্‌শোদ। এ হাসিভরা লোকালয়ের সঙ্গে আর আমার বনিয়া উঠিল না। ধর্ম্ম জানেন, কেন বনিয়া উঠিল না। সকলই কপালে করে। আমার কপালে ইহারই মধ্যে মেয়াদের মেয়াদ পাট্টা ফুরাইয়াছে। আর হাসির অধিকার নাই। তাহার দিন কাল গিয়াছে।

তবে হাসি কেন ? বলিয়াছি তো, পোড়া মুখ বোজে না তাই দাঁত বাহির হয়, নহিলে হাসিতে আর ইচ্ছা নাই। তবে লোকে হাসে, আমি তাহার মন রাখিবার জন্য ঠোঁট হেলাই, সকলে ভাবে আমি হাসি। বন্ধু তাঁহার নবোঢ়া ভার্য্যার প্রথম আলাপের আধবাকি বলিতে বলিতে হাসিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়েন, ধর্ম্ম জানেন আমার সে সকল কথা কেমন লাগে, কিন্তু কি করিব—একবার একটু দাঁত বাহির করি, বন্ধু সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যান। কালাচাঁদ বাবু তাঁহার পুত্র কেমন করিয়া তাহার গুরুমহাশয়কে কাঁটা ফুটাইয়া জব্দ করিয়াছিল, সেই সকল কথা বলেন আর উচ্চ হাসি হাসিতে থাকেন, পদ্ম ঠাকুরুণ তাঁহারি নূতন নাতজামাইয়ের পরিহাসরসিকতার পরিচয় দিতে দিতে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন, যে গল্প অনেক দিন পূর্ব্বে কতবার শুনিয়াছি—যাহা শুনিয়া শুনিয়া কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে—যাহা এখন পচিয়া গলিয়া গিয়াছে, সেই গল্প বলিতে বলিতে পাড়ার বনমালি ঠাকুর আপনাআপনি হাসিয়া কুটকুটি হন, আবার যখন রমেন্দ্রনাথ বাহাদুরের বৈঠকখানার প্রবেশ করি, দেখিতে পাই, বাবু বিনাদোষে এক-জন ভদ্রলোকের উদ্দেশে কটূ গালি দিয়া উচ্চ হাসি হাসিতেছেন, আর সেই হাসি লুফিয়া লইয়া খোষদ', বোসজা, ভাটুয্যের দল এক কুড়ি বায়োটী দাঁত বাহির করিয়া হো হো শব্দে হাসির গর্‌রার ঘর ফাটাইয়া দিতেছেন—

বল দেখি, আমি এ সব ক্ষেত্রে কি করিব? ইহাদিগের ব্যবহার দেখিলে মনে দুঃখ হয়, তবে বাঁচায়ে পড়িয়া একবার একটু দৈত্যের হাসি হাসি।

মানুষের সমাজ কে গড়িয়াছিল? এখানে লোকের এত মন যোগাইয়া চলিতে হয় কেন? আমার দুঃখের অন্ত নাই, যন্ত্রণার পরিসীমা নাই, তথাপি লোকের জন্য এ পোড়া মুখে কেমন করিয়া দাঁত বাহির করিব? কোথায় কাঁদিয়া এ প্রাণটা কতক শীতল করিব, লোকের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া এ দুঃখের ভার কিছু নামাইব, তাহা না হইয়া আবার হাসি ডাকিয়া আনিতে হয়। প্রাণ ভরিয়া ডাক ছাড়িয়া যে দুঃখের কান্না কাঁদিব—কেহ তো শুনিবেই না—তাহাতেও অধিকার নাই। যদি একটু মুখ বিরস করিয়া রহিলাম, অমনি পাড়ার সকলে পেচকগম্ভীর বলিয়া কতই উপহাস করে, মাগীরা দূর হইতে দেখাইয়া পোড়ারমুঁখো বলিয়া আঙুল মট্‌কায়। তা ছাড়া, আবার, আজ হালদারদের খোকার ষষ্ঠী পূজা, কাল তারিণীর বিবাহ—এ সব শুভ কর্ম্ম, কাঁদিতে নাই, অমঙ্গল হইবে। ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে হাসির রোল উঠিতেছে, সকলকেই হাসিতে হইবে, না হাসিলে নিস্তার নাই। কাজেই চোকের জল চোখে মারিয়া দৈত্যের হাসি হাসি। যেখানে দুঃখে সহানুভূতি নাই, অতি কষ্টে সান্ত্বনা নাই, অথচ কান্নার সময়েও হাসিতে হয়—মানুষের এমন সমাজ কে গড়িয়াছিল?

আচ্ছা, সমাজের সকলেই যদি হাসে, আমারই বা হাসিতে দোষ কি? দোষ? বলিয়াছি তো সে আমার কপাল। আগে কি আর হাসি নাই? তখন তো কত হাসি হাসিয়াছি, আর এখনই বা একটু হাসিতে এত মর্ম্মপোড়ানি হয় কেন? লোকে যাহা লইয়া হাসে, তখন আমার তাহা ছিল, তাই তখন হাসিতাম। এখন আর তাহা নাই, সুতরাং এখন আর কি লইয়া হাসিব?

আর হাসিবার আছে কি? বৈঠকখানার ঠিক্ দক্ষিণের জানালার নীচে যে ফুল বাগানে এত সখ করিয়া বাছিয়া বাছিয়া গোলাপ, ডালিয়া, অর্কেরিয়া পুতিয়াছিলাম, সন্ধ্যার সময় মলয় মারুতের মৃদু সঞ্চালনে যাহা দুলিয়া দুলিয়া কত সৌগন্ধ ছড়াইত, প্রাণের ভিতর কত প্রীতি ঢালিয়া দিত, সে সব আর নাই। ফুল ঝরিয়াছে, পাতা শুখাইয়াছে, গাছ মরিয়া গিয়াছে। এখন সেখানে খড় ও ভাঁট গাছ জন্মিয়াছে।

আর হাসিবার আছে কি? যে দেবীবাবু এক দিন দান ধ্যান ও অতিথিসেবা করিয়া অশেষ যশ কিনিয়া গিয়াছেন, বার মাসে তের পার্ব্বণ যাঁহার বাটীতে কখন ফাঁক যাইত না; তাঁহারই পুত্র যাত্রার দল করিয়া ও নেশায় মজিয়া দিনকতক ধুমধামের পর, সমস্ত উড়াইয়া দিয়া এখন পেটের দায়ে পূজার দালানের ইট বিক্রয় করিতেছে।

আর হাসিবার আছে কি? যে ভগবান্ ঘোষ ব্রাহ্মণ দেখিলে ভূমে লুটাইয়া পড়িত, দুই বেলা বিপ্রপাদোদক পান না করিলে জল গ্রহণ করিত না, অষ্ট প্রহর নামাবলী গায়ে দিয়া ও রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া সময় কাটাইত, একসন্ধ্যা নিরামিষ আহার করিত, তাহারই পুত্র ব্রাহ্মণ মানে না, জুয়াচোর বলিয়া পুরোহিতকে অর্দ্ধ চন্দ্র দিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়, আবার শাস্ত্র দেখাইয়া কায়স্থদিগের উপবীত গ্রহণের অধিকার প্রমাণ করাইয়া স্বয়ং উপবীত গ্রহণ করিয়াছে। হ্যাটকোট তাহার পরিধেয়, কুক্কুট মাংস না হইলে এক বেলাও চলে না।

আর হাসিবার আছে কি? যে রতন বাবু 'বাপু বাছা' ভিন্ন প্রজাদিগকে সম্বোধন করিতেন না, প্রজাদের দায়ে বিপদে পিতার ন্যায় বুক দিয়া পড়িয়া যিনি তাহাদের দুঃখ মোচন করিতেন, একসন অজন্মা হইলে, দুই সনের খাজানা মকুব করিতেন, তাঁহারই বংশধরগণ রাজা খেতাব পাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট চাঁদার বহিতে লক্ষ টাকা সহি করিয়া প্রজাদের নিকট হইতে তাহা উঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছে, অজন্মা বা মারিভয় কিছুতেই রেহাই নাই। নায়েব, কারকুন, পাইক, পেয়দা জমিদারের নানা প্রকারের লোক আসিয়া প্রজাকে নানা প্রকারে পীড়ন করিতেছে, শেষ বাবুর হুকুমে হতভাগ্যের একখানি ঘর তাহাও ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে।

আর হাসিবার আছে কি? যে সুকুমারী একদিন রূপের গরবে মাটীতে পা দিত না, পাছে অঙ্গ মলিন হয় এই ভয়ে সংসারের কোন কাজ না করিয়া কেবল ইজি চেয়ারে বসিয়া কার্পেট বুনিত আর নাটক নভেল পড়িত, অথবা কেবল দর্পণের নিকট তাহার সেই তাম্বুলরাগরক্ত ঠোঁট দুখানি দেখিয়া সময় কাটাইত, সেই সুকুমারী এখন পতি পুত্র হারাইয়া বেনেদের বাড়ী পাচিকার কর্ম্ম করিতেছে। তাহার আর সে শ্রী নাই,

সে রূপ লাবণ্য নাই, সে এক ঢল চুল নাই। সে আর এখন বৈ পড়ে না, কার্পেট বুনে না, পান খায় না। রাঁধে আর কাঁদে।

আর ছাই কত বলিব? যে পাখী পুষিয়াছিলাম, তাহা মরিয়াগিয়াছে। যে ফুল ফুটাইয়াছিলাম, তাহা শুখাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। যে মুখ সব ভাল বাসিতাম, একে একে তাহারা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। যেখানে এত ভালবাসা প্রত্যাশা করিতাম, সেখানে এখন কেবল প্রতারণা মাত্র। যে পুত্রকে বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিলাম, সে এখন আমার কেবল উদ্দেশে সম্বাদ লয়। যাহাকে কোলে পিঠে করিয়া ক খ শিখাইলাম, সে এখন মূর্খ বলিয়া আমাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। বহু দিনের কথা নয়—পূর্ব্বে যাহার চাকরি করিয়া দিয়াছিলাম, যে আমাকে মুরুব্বি বলিয়া কতই মান্য করিত, সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে সাহস করিত না, সে এখন আমার হাত হইতে হুঁকা লইতে আসে। যে গৃহিণী আগে আগে কত ভক্তি দেখাইতেন—আমা বৈ আর জানিতেন না, তিনি এখন খড়্গ হস্ত। নিরাশ্রয় বলিয়া যাহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলাম, সে এখন দু টাকা আনিতে শিখিয়া আমার হকসিমানার জমি কাড়িয়া লইতে চায়। নিজের আর তেমন শক্তি নাই, সে বল নাই, সে বুদ্ধি নাই—আসল কথা—সে অর্থ নাই। পেটের আকার বিব্রত, শোকে রোগে অস্থিচর্ম্ম-সার, কষ্টে প্রাণ ফাটিয়া বাহির হইতেছে। আর হাসিবার আছে কি?

তবে এ হাসি কেন? হাসিবার যদি কিছুই নাই, তবে এ দেঁতোর হাসি কেন? পাখী উড়িয়াছে, পিঞ্জর কেন? ফুল শুখাইয়াছে, গন্ধ কেন? ভালবাসা গিয়াছে, আশা কেন? প্রাণ শেষ হইয়াছে, স্মৃতি কেন? দীপ নিবিয়াছে, আর তাহাতে তৈল কেন? বসন্ত ফুরাইয়াছে, কোকিলের ভাঙা সুর কেন? বাঁশী ফাটিয়াছে, সা ঋ গা ম কেন? তার ছিঁড়িয়াছে, উদারা মুদারা কেন? ঘর পুড়িয়াছে, আগুন নেবে না কেন? সুখ গিয়াছে, প্রাণ যায় না কেন? রাম নাই, তবে অযোধ্যা কেন? সে ফুল নাই, এ মালঞ্চ কেন? অর্থ নাই, তবে এ সংসার কেন? হাসিবার সে সময় নাই, তবে, ভাই, আর এ দেঁতোর হাসি কেন?

প্রেম প্রতিমা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আনন্দ সাগরে।

উপেন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে বাড়ি চলিয়াছেন, শারদীয়া পূজার আর দুই দিবস মাত্র বিলম্ব আছে, আজ বঙ্গের সুখের পঞ্চমী। দাসত্ব-পীড়িত বাঙ্গালি জীবনে আজ আর আনন্দের সীমা নাই। প্রবাসবাসী বাঙ্গালি এই দিনে আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখিয়া প্রবাসের সকল কষ্ট ভুলিয়া যায়। অতি প্রত্যূষে উপেন্দ্রনাথ খুল্লতাত পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ এবং একজন ভৃত্য সঙ্গে করিয়া কলিকাতার পটলডাঙ্গার বাসা হইতে শিয়ালদহের ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ষ্টেশন ভয়ঙ্কর লোকের জনতা এবং কোলাহলে পরিপূর্ণ; টিকিট ঘরের সম্মুখে সর্ব্বাপেক্ষা লোকের ভিড়; টিকিট ক্রয় করা দুঃসাধ্য। রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা সকলে একেবারে ব্যতিব্যস্ত। এই সকল জনতার মধ্যে অনেক জুয়াচোর প্রবেশ করিয়া আপনাপন অভিলাষ পূর্ণ করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে। কেহ আপনার দ্রব্যাদির ওজন দিতেছে, কেহ বা দ্রব্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, কেহ টিকিট ক্রয় করিতেছে, কেহ কোন সঙ্গীর প্রত্যাশায় ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছে, এবং মনে মনে তাহাকে গালি দিতেছে; এইরূপ সকলেই এক একটি কার্য্যে ব্যস্ত। উপেন্দ্রনাথকে এইখানে কোনরূপ কষ্ট পাইতে হইল না; তাঁহার ভ্রাতা ধীরেন্দ্র এবং ভৃত্য সকল আবশ্যকীয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিল। গাড়ি ছাড়িবার আর দশ মিনিট বিলম্ব আছে, উপেন্দ্রনাথ ধীরেন্দ্র ও ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠিলেন।

গাড়িতে বসিবার তিলার্দ্ধ স্থান নাই, সকল গাড়িই লোকে পরিপূর্ণ, কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক গাড়িতে উঠিতে পারিলেই আজ সকলে সন্তুষ্ট। সকলের মন বাড়ি যাইবার জন্য এরূপ উৎসুক যে গাড়ি ছাড়িবার যে দশ মিনিট বিলম্ব আছে সে বিলম্বও কাহারও সহ্য হয় না; কেহ সঙ্গীর

প্রণয়ের বিষয় কেহ, জননীর স্নেহের বিষয় কেহ, আত্মীয় স্বজনের যত্নের বিষয় ভাবিয়া একবারে আনন্দে অধীর হইতেছে; অনেকেরই প্রিয়তমার মুখ মনে পড়িতেছে। আবার কাহার কাহার প্রিয়তমার ফরমাসী দ্রব্য ক্রয় করিতে পারেন নাই বলিয়া এখন তাহার আনন্দ সাগরে দুঃখের তরঙ্গও উঠিতেছে, তিনি মনের দুঃখ মনে মনে চাপিয়া রাখিয়া আপনার জীবনকে ধিক্কার দিতেছেন।

আর বিলম্ব নাই—শেষ ঘণ্টা বাজিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিবার হুস্ হুস্ করিয়া গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল; এই গাড়ি ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের হৃদয় দুগপৎ-আনন্দে উথলিয়া উঠিল। হৃদয়ে একটা আনন্দের প্রকাণ্ড তরঙ্গ ভীষণ বেগে উঠিয়া সকলের হৃদয়কে নাচাইতে লাগিল। এই মুহূর্ত্তে প্রবাসীর মনের অবস্থা প্রবাসী ভিন্ন কাহার হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা নাই; গ্রন্থকার মনের সে ভাব বর্ণনায় অক্ষম।

দমদমা, বেলঘরিয়া, সোদপুর প্রভৃতি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গাড়ি ভীষণ বেগে ছুটিল; কিন্তু ইঞ্জিনের সেই ভীষণ বেগ এই স্থানে পরাস্ত হইল, অনেকেরই মন মুহূর্ত্তের মধ্যে গৃহে গিয়া জনক জননী প্রভৃতি গুরুজনের চরণে প্রণাম করিল, সন্তান সন্ততির মুখ চুম্বন করিল, প্রণয়িণীকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিল। মনের ন্যায় দ্রুতগামী এজগতে কিছুই নাই; মন ইচ্ছা করিবা মাত্রেই আমাদিগকে পৃথিবীর যে কোন স্থানে হউক না কেন লইয়া যাইতে পারে।

ক্রমে ক্রমে গাড়ি বগুলা ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। এই স্থানে উপেন্দ্রনাথকে নামিতে হইবে, তিনি পূর্ব্ব হইতে তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন—গাড়ি থামিবা মাত্র গাড়ি হইতে নামিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ধীরেন্দ্র ও ভৃত্য নামিল। দ্রব্যাদি সকল বুঝিয়া লইয়া উপেন্দ্রনাথ একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া গ্রামাভিমুখে চালাইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

উপেন্দ্রনাথের যে গ্রামে বাস তাহার নাম উমীপুর, বগুলা ষ্টেশন

হইতে সে গ্রাম ১২ ক্রোশ। পল্লীগ্রামের রাস্তা যেরূপ কদর্য্য, তাহাতে আবার গাড়ী ও ঘোড়ার অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, সুতরাং এই ১২ ক্রোশ রাস্তা যাইতে অধিক বিলম্ব হইবে। আমরা এই সুযোগে উপেন্দ্র ও ধীরেন্দ্রের পরিচয় দিতেছি।

উপেন্দ্র রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। বয়ঃক্রম অষ্টবিংশতি বৎসর। রামগোপাল একজন পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র জমীদার, জমীদারীর আয় প্রায় বৎসরে ৮।১০ হাজার টাকা। রামগোপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতায় সদর দাওয়ানী আদালতে মোক্তারী করিতেন, এই সময় তিনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়া দেশে ভ্রাতার নিকট পাঠাইতেন, রামগোপাল বাড়িতে বসিয়া সংসারের খরচ পত্র বাদে আপনার নামে এই সকল জমীদারি খরিদ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল; লোকে অনেক সময় জ্যেষ্ঠের বিপক্ষে অনেক কথা বলিত, কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোনরূপ সন্দিহান ছিলেন না, সুতরাং জ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তি অচলা ছিল। কলিকাতায় বিসূচিকা রোগে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়; তিনি পঞ্চম বৎসরের এক পুত্র রাখিয়া যান, পুত্রের নাম ধীরেন্দ্র কুমার। পিতার মৃত্যুর দুই বৎসর পরেই ধীরেন্দ্রের বিধবা মাতারও মৃত্যু হয়। ধীরেন্দ্র আজ শৈশবাবস্থায় পিতৃ মাতৃ হীন হইল। রামগোপাল বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মহেন্দ্রলাল। রামগোপাল বাবু বড় সরল লোক ছিলেন না; ভ্রাতুষ্পুত্রকে সকল বিষয়ে বঞ্চিত করিবার মানস তাঁহার প্রথম হইতেই ছিল; এবং ধর্ম্ম পথে থাকিয়াই হউক, আর অধর্ম্ম পথে থাকিয়াই হউক পুত্রদিগের জন্য কিছু সম্পত্তি রাখিয়া যাইবার ইচ্ছা তাঁহার চিরকাল বলবতী। পাছে ভ্রাতুষ্পুত্র লেখা পড়া শিখিলে আপন বিষয় বুঝিয়া লইতে পারে, এই জন্য তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে লেখা পড়া শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহেন্দ্রনাথও ভিতরে ভিতরে তাঁহার এই সকল কার্য্যের পোষকতা করিত, কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনাথ পিতার এইরূপ অন্যায় কার্য্য দেখিতে পারিতেন না; পিতাকে বিনীতভাবে অনেক সময় এরূপ কার্য্য করা যে অন্যায় তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। উপেন্দ্র ধীরেন্দ্রকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত, ধীরেন্দ্রও ছোট দাদা বলিতে অজ্ঞান হইত।

যখন উপেন্দ্রের কলিকাতায় কোন গবর্ণমেণ্ট আফিসে কর্ম্ম হইল, তখন তিনি ধীরেন্দ্রকেও কলিকাতায় আনিয়া লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা রামগোপাল ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহেন্দ্র এই বিষয়ে উপেন্দ্রকে অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও আপত্তি শুনিলেন না। ধীরেন্দ্র কিছুকাল কলিকাতায় থাকিয়া অল্প দিনের মধ্যেই বিশেষ সুখ্যাতির সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন; এই বৎসর তাঁহার ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষার বৎসর। তিনি সেই জন্য পূজার অবকাশে বাড়ি আসিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কেবল উপেন্দ্রের এবং ভার্য্যা চপলার অনুরোধে বাড়ি আসিতে বাধ্য হইলেন।

পিতৃমাতৃহীন খুল্লতাত পুত্র ধীরেন্দ্রের প্রতি স্নেহ ও যত্ন করা, দুঃখী প্রতিবেশীকে অর্থ সাহায্য করা, সংসারে সকল বিষয়েই কেবল ধর্ম্মপথে চলা, প্রভৃতি এই সকল কারণে উপেন্দ্র পিতার বড় প্রিয় ছিলেন না। মহেন্দ্র সম্পূর্ণ পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিত, এই জন্য তিনি পিতার বড় প্রিয় পাত্র ছিলেন; তবে উপেন্দ্র যে প্রতি মাসে আপনার বেতন হইতে ১০০৲ টাকা পিতাকে দিতেন, এই জন্য তিনি তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিতেন, এবং প্রকাশ্যে তাঁহাকে কোন কথা বলিতেন না। রামগোপাল টাকা বড় ভাল বাসিতেন, যে কোন উপায়ে হউক কিছু টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিলে তিনি তাহাতে বিমুখ হইতেন না। মহেন্দ্র বাড়িতে থাকিয়া জমীদারীর কাজকর্ম্ম দেখিতেন, এবং পিতাকে সকল সময়ে তাঁহার মনোমত পরামর্শ দিয়া তাঁহার প্রিয় হইতেন।

অতি শৈশবাবস্থায়ই মহেন্দ্রের বিবাহ হয়, তখন ধীরেন্দ্রের পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, এবং মহেন্দ্রের শ্বশুর ও একজন ধনী লোক, সুতরাং সে বিবাহ অতি সমারোহের সহিত হইয়াছিল। মহেন্দ্রের স্ত্রীর নাম শশীকলা— সে কিছু গর্ব্বিতা, আপনার রূপের ও ধনের গৌরবে উন্মত্তা। উপেন্দ্র নাথ সুশিক্ষিত হইয়া পরে আপনি মনোমত করিয়া বিবাহ করেন, তাঁহার শ্বশুর ও একজন সম্ভ্রান্ত লোক, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী প্রিয়ম্বদার কোনরূপ অহঙ্কার ছিল না, সর্ব্বদাই নম্র, বিনীত, পরদুঃখকাতরা। আজ চারি বৎসর হইল ধীরেন্দ্রেরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী অতি

দরিদ্র কন্যা, এবং মহেন্দ্র ও উপেন্দ্রের স্ত্রীর ন্যায় রূপবতী ছিল না। এ সকল গুণ না থাকিলেও ধীরেন্দ্রের স্ত্রী চপলা অতি শান্ত, ধীর, ও পরিশ্রমী ছিল। এ পর্য্যন্ত মহেন্দ্রের ও ধীরেন্দ্রের কোন সন্তান সন্ততি হয় নাই, উপেন্দ্রের একটি তিন বৎসরের কন্যা, এবং ছয় মাসের পুত্র।

আমরা দুই চারি কথায় এখন এক প্রকার উপেন্দ্র ও ধীরেন্দ্রের পরিচয় দিলাম, অন্যান্য বিষয় পরে প্রকাশ হইবে। তিনি ক্রমে ক্রমে যত গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন ততই তাঁহার হৃদয় আনন্দে উছলিয়া উঠিতে লাগিল। যখন দূর হইতে নিজ গ্রামের বৃক্ষাদি দেখিতে পাইলেন, তখন আর তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না; মনে কত কথা উদয় হইতে লাগিল। তিনি আপনার পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া বলিলেন—"ভাই ধীরেন্ বেলা সাড়ে তিনটা বাজিয়াছে, বাড়িতে পৌছিতে চারিটা বাজিবে, এত বেলা অবধি তোমার খাওয়া হইল না; তোমার মুখ দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছে।"

ধীরেন উত্তর করিল—

"দাদা, আমার কষ্ট কিছুই হয় নাই; আমার অপেক্ষা আপনার কষ্টই অধিক হইয়াছে, আমি ভাল করিয়া জলখাবার খাইয়াছি, কিন্তু আপনি এখনও কিছুই আহার করেন নাই।"

"দেখ্ ধীরেন, বাড়ি যাইবার সময় আমার মনে এত আনন্দ হয় যে, ক্ষুধা তৃষ্ণার বিষয় আমার কিছুই মনে থাকে না।"

ধীরেন্দ্র ঈষৎ একটু হাসিয়া মনে মনে বলিল—"সকলি বৌঠাকুরাণীর অনুগ্রহে।" এইরূপ দুই চারি কথা হইতে হইতে তাঁহারা গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন। গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থলে এক বাজার আছে, সেইখানে গাড়ি থামাইয়া তাঁহারা পদব্রজে গ্রামের ভিতর চলিলেন। উপেন্দ্র ও ধীরেনকে দেখিয়া গ্রামবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই একেবারে আহ্লাদে অধীর হইল। কেহ দৌড়িয়া তাঁহার পিয়া বাড়িতে সংবাদ দিল, কেহ বা কুশল-প্রশ্ন করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুখের রজনী।

রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে; প্রিয়ম্বদা স্বামীর জন্য আহারাদি লইয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে; উপেন্দ্র অপরাহ্নে আহার করিয়াছিলেন, সুতরাং এখন তাঁহার আহারের এমন বিশেষ কোন আবশ্যক ছিল না। কিন্তু উপেনের সে আহার প্রিয়ম্বদার মঞ্জুর নহে, সে আহার প্রিয়ম্বদা সচক্ষে দেখে নাই, উপেনকে যত্ন করিয়া মাথার দিব্য দিয়া 'এটি খাও, ওটি খাও' বলে নাই, সে আহারের সময় শ্বশুর শাশুড়ী নিকটে ছিলেন, সেই জন্য লজ্জায় প্রিয়ম্বদা সে আহার দেখিতে যাইতে পারে নাই; সুতরাং প্রিয়ম্বদার নিকট উপেনের সে আহার মঞ্জুর হয় নাই। উপেন আহারান্তে প্রতিবেশীদিগের বাড়ি বাড়ি গিয়া সকলের সহিত দেখা করিতে ছিলেন, সকলের সংবাদ লইতে ছিলেন, আত্মীয় ও বন্ধু সকলের নিকট নানা প্রকার গল্প করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহার বাড়ি ফিরিয়া আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। প্রিয়ম্বদার তাহা অসহ্য হইতে লাগিল। তিনি কন্যা ও পুত্রকে ঘুম পাড়াইয়া একখানা কি পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিলেন, দুই চারি বার পাতা উলটাইয়া পুস্তক বন্ধ করিলেন; এই সময় কাহার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলেন; সেই পায়ের শব্দ শুনিয়া কে আসিতেছে জানিতে পারিলেন। হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষু সতৃষ্ণনয়নে একবার দরজারদিকে চাহিল, অমনি দরজা খুলিয়া সেই সময় উপেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিল।

উপেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন যে প্রিয়ম্বদা তাঁহার আহারের উদ্‌যোগ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—

"প্রিয়ম্বদা, তুমি এখনও আমার জন্য বসিয়া রহিয়াছ?"

প্রিয়ম্বদা ঈষৎ হাসির উত্তরে ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ঘুম এখনও আসে নাই, তাই বসিয়া রহিয়াছি; তোমার কি আহারের কথা মনে নাই? বাড়ি আসিবামাত্রেই কি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়?"

"আমার ক্ষুধা নাই, যাহা কিছু ছিল এখন আর তাহাও নাই; তোমার ঐ সুন্দর মুখ খানি দেখিলে কি আর ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে?"

"আমি তোমার সুখী। এখন তুমি আহার করিতে বস।"

এই বলিয়া প্রিয়ম্বদা উপেনের হাত ধরিয়া আহার করিতে বসাইল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও পত্নীর অনুরোধে তিনি আহার করিতে বসিলেন। আহার কালে বসিয়া উপেন পত্নীর সহিত নানা প্রকার গল্প করিতে লাগিলেন। গল্প এইরূপ চলিতে লাগিল।—

উপেন জিজ্ঞাসা করিল—

"সরোজিনী—আর খোকা কি ঘুমাইয়াছে?"

উপেনের কন্যার নাম সরোজিনী।

প্রিয়ম্বদা উত্তর করিল—

"তাহারা এই মাত্র ঘুমাইল; আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, সরোজিনীকে আর খোকাকে তুমি কোলে করিয়া লইবে; আমি সেই জন্য তাহাদের এতক্ষণ ঘুমাইতে দিই নাই।"

"কেন, আমি ত আসিয়াই তাহাদের কোলে লইয়াছিলাম।"

"আমি তাহা দেখি নাই, আমার চক্ষু ত তাহা দেখিয়া সার্থক হয় নাই।"

"প্রিয়ম্বদা, আমি সরোজিনীর জন্য যে পোষাক আনিয়াছি, তাহা কেমন হইয়াছে?"

"আমি ত পূজার সময় সরোকে সে পোষাক পরিতে দিব না।"

"কেন?"

"দেখ, পাড়ায় কত দুঃখী লোকের ছেলে মেয়ে রহিয়াছে, তাহারা এই পূজার সময় একখানা নূতন কাপড়ও পায় না; ঘোষেদের অমন সুন্দর ছেলেটি আজ একখানা নূতন কাপড়ের জন্য ধুলায় পড়িয়া আছাড় কাছাড় খাইতেছিল, তাহা দেখে আমার চক্ষে জল আসিল; আমি তাহার মাকে একটা টাকা দিতে যাইতেছিলাম, ঠাকুরুণ দিতে দিলেন না; সে জন্য আমার মনে বড় কষ্ট হইয়াছিল। ঘোষেরা আর আমাদের পুকুরের ধারের বাগ্দীরা বড় দুঃখী, তুমি তাহাদের ছেলেদের কাপড় না আনিয়া, সরোর জন্য অমন দামী পোষাক আনিলে কেন?"

"তাহার জন্য ভাবনা কি? আমি কালই তাহাদের ছেলের কাপড় কিনিয়া দিব। দেখ প্রিয়ম্বদা, তুমি যে দুঃখী লোকের প্রতি দয়া কর,

তাহাতে আমি বড় সুখী হই; তুমি যদি সরোজিনীর অমন সুন্দর পোষাকটি কোন দুঃখী লোকের মেয়েকে দান করিতে তাহা হইলেও আমি তোমার প্রতি বড় সন্তুষ্ট হইতাম।"

"দেখ, গরিব লোকের দুঃখ দেখিলে আমার মনে বড় কষ্ট হয়, কিন্তু ঠাকুরুণের ভয়ে আমি কাহাকে কিছু দিতে পারি না। আমি সকালে উঠিয়াই ঘোষেদের আর বাগদীদের বাড়ী যাইব; আর তুমি যে তাহাদের ছেলে ও মেয়েদের কাপড় কিনিয়া দিবে, তাহা বলিয়া আসিব। শুনিলে তাহাদের কত আহ্লাদ হবে। আর উত্তর পাড়ায় যে একজন গরিব ব্রাহ্মণ আছে, তাহাকে তোমায় কিছু টাকা দিতে হইবে। ব্রাহ্মণ আজ তোমার আসিবার কথা ছিল বলিয়া তিন চারি বার আমাদের বাড়িতে আসিয়াছিল; তাহার নাকি বড় কষ্ট, তুমি কিছু টাকা তাহাকে দিলে তিনি তোমায় কত আশীর্ব্বাদ করিবেন।"

"আচ্ছা তাহাই হইবে" বলিয়া উপেন আহার শেষ করিল।

প্রিয়ম্বদা তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে হাত মুখ ধুইবার জন্য জল আনিয়া দিল। এই সকল কার্য্যের পর উভয়ে পালঙ্কের উপর বসিল। উপেন পত্নীর হাত ধরিয়া বলিল—

"প্রিয়ম্বদা, সুখ্যাতি তোমার হৃদয় দয়ায় পরিপূর্ণ, তোমার ন্যায় স্ত্রীরত্ন-লাভ করা অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে।" প্রিয়ম্বদা লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল।—

"তোমার সুখ্যাতি শুনিলে আমার বড় আহ্লাদ হয়, আমি যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাই। তুমি কখন মন্দ হইও না, যেন পৃথিবী শুদ্ধলোক তোমার সুখ্যাতি করে, আর আমি যেন তোমার সুখ্যাতি শুনিতে শুনিতে তোমার কোলে মাথা আর খোকাকে দেখিতে দেখিতে মরিতে পারি।"

কথা শুনিয়া উপেন শিহরিয়া উঠিল; "রাক্ষসী" বলিয়া প্রিয়ম্বদাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল। এইরূপে সেই দিনের সুখের রজনী শেষ হইল।

স্বার্থ ও সমাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

স্পেন্সর (Spencer) আবার দুই মতের একত্র সমন্বয় করিতে চাহেন। তিনি বলেন, সমাজে থাকিয়া অন্যের সুখে ব্যাঘাত যাহাতে না জন্মে, এমনি করিয়া সকলে আপন আপন সুখের অনুসরণ করুক। কথাটি মন্দ নহে। ইহাতে স্বার্থ ও সমাজ দুই বজায় থাকে। কিন্তু, ইহা কোনও ছেলেভুলান কথা। স্বার্থ ও সমাজ এ দুইয়েরই একত্র উপাসনা হইতে পারে না। স্পেন্সর যে কথা বলিলেন, তাহাতে সম্ভবমত সুখ আয়ত্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু পূর্ণ সুখ লাভ করিবার আর পথ রহিল কৈ? অপরের যাহাতে সুখে ব্যাঘাত না ঘটে, এমন করিয়া চলিতে গেলে মানুষের কপালে অতি অল্পই সুখ ঘটিবার সম্ভাবনা। তোমার বাড়ী দুর্গোৎসব, তুমি তাহার আয়োজনে সদা ব্যস্ত, সুখের সপ্তমীর প্রতীক্ষা করিতেছ, কয়দিন ধরিয়া পূর্ণসুখের সরিৎ তরঙ্গে ভাসিবে সেই স্বপ্ন নিশা যাপন করিতেছ; কিন্তু তোমার পার্শ্ববর্ত্তী পর্ণকুটীরে যে পতিপুত্রহারা দুঃখিনী বাস করিতেছে, সে তোমার বাড়ী পূজার দিন ঢাকে কাটি পড়িলেই উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার ছাড়িয়া উঠিবে, সে যে এতদিন বিস্মৃতির সুখ ভোগ করিতেছিল, তাহার সে সুখে ব্যাঘাত দিয়া তুমি পূর্ণসুখ উপভোগ করিবে কেমন করিয়া? বিশেষ কথা, এ সংসার বৈষম্যপূর্ণ। সকলের দিন সমান যায় না, সকলের অবস্থা সমান হয় না। একের সুখ, অন্যের দুঃখ; একের ভাল, অন্যের মন্দ। কেহ হাসে, কেহ কাঁদে। যে কাঁদে, তাহার নিকট না কাঁদিলে ভাল বাসে না, হাসিলে মনে কষ্ট পায়—কাঁদিয়া যে সুখ, তাহার সে সুখে ব্যাঘাত জন্মে। আমি পূর্ণ সুখ আয়ত্ত করিবার জন্য ফিরিতেছি; কিন্তু স্পেন্সরের কথা শুনিয়াও তাহার নিকট হাসিব কেমন করিয়া? অন্যের সুখে যাহাতে ব্যাঘাত না ঘটে, এমন করিয়া এ সংসারে থাকিয়া সুখ আয়ত্ত করা বড়ই দুঃসাধ্য।

বাস্তবিক, স্বার্থের সহিত সমাজের সংঘর্ষ হইলে স্পেন্সরের কথা কোনও স্থানে স্থান পাইতে পারে না। একজনকে অবশ্যই অপরের স্বার্থজন্য অনিষ্ট ভোগ করিতে হয়। জর্ম্মানির স্বার্থের জন্য তুরস্ক আজও ক্ষতদেহে প্রলেপ দিতেছে, একজনের স্বার্থরক্ষায় একটু ব্যাঘাত দিতে গিয়াছিল বলিয়াই সেই পাপে দেশহিতৈষী বীরধর্ম্ম আরাবি আজ রাজ্যভ্রষ্ট, নির্ব্বাসিত, বন্দী! ইংরাজের স্বার্থ আছে বলিয়াই আজ ভারত পেটে না খাইয়াও কাবুল যুদ্ধের ব্যয়ভার বহিয়া মরিতেছে। সমাজে থাকিয়া অন্য লোকের সুখে ব্যাঘাত না দিয়া কেহ যে কখন স্বার্থের অনুসরণ করিতে পারিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত মিলে না।

সমাজের প্রবর্ত্তিত নিয়মগুলি একটু ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে, স্বার্থের সংঘর্ষজনিত অনিষ্ট নিবারণ করিবার জন্যই সে সকল নিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে। স্বাতন্ত্র্যজীবনে যাহা অবাধে চলিত, সমাজিক জীবনে তাহা সেরূপ চলিলে ঘোর অনিষ্টপাত হয়। স্বার্থ বজায় করিবার জন্য একজন অন্যজনকে প্রবঞ্চনা করে, পরদ্রব্য অপহরণ করে, প্রাণিহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। স্বাতন্ত্র্যজীবনে স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রূপে রক্ষিত হইতেছিল, সামাজিক জীবনে তাহা হইতে পারে না। একজনকে আর এক জনের প্রতিহিংসা-ভোগী হইতে হয়। সুতরাং সম্ভবমত তাহা নিবারণ করিবার জন্যই সামাজিক নিয়ম এবং নীতির প্রবর্ত্তনা। পিনাল কোডের ব্যবস্থা যতদিন থাকিবে, ততদিন স্পেন্সরের কথা আমরা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

স্পেন্সরের কথা আরও অযৌক্তিক বলি এই জন্য যে, এ সংসারের মধ্যে কে কখন কোথায় কি সুখের অনুসরণ করিতেছে তাহা আমরা জানিব কেমন করিয়া? হইতে পারে, আমি জানি অমুক ব্যক্তি এই সুখের চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন, আমি যাহাতে তাঁহার সে সুখের কোনও ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়, এমন করিয়া আত্ম সুখ অনুসরণ করিলাম। কিন্তু তিনি যে সে সময়ে সেই সুখচিন্তায় নিবিষ্ট ছিলেন, তাহা না জানিতে পারিলে কি হইবে? বন্ধু যে কোনও কারণে হউক গৃহে বসিয়া নির্জ্জনতার সুখ অনুভব করিতেছেন, আমি যদি তাহা জানি, তাহা হইলে না হয় তাঁহার

নিকট সে সময়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সে সুখে ব্যাঘাত দিলাম না; কিন্তু যদি তাহা জানিতে না পারি, অথচ সে সময়ে সেই বন্ধুর সহিত দুই হাত দাবা খেলিয়া সুখ ভোগ করিবার জন্য যদি বড়ই ইচ্ছা হয়, আমি সে ক্ষেত্রে কেমন করিয়া তাঁহার সুখের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া নিজের সুখের অনুসরণ করিব? স্পেন্সার নিশ্চয় একটা ছেলেভুলান কথা কহিয়াছেন।

স্পেন্সারকে ছাড়িয়া আমরা যদি বেন্থামের (Bentham) ইউটিলিটির কথা একবার ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, তাহাতেও স্পষ্ট বুঝা যায়, বেন্থাম ইউটিলিটির কথা বলিতে গিয়া সমাজ ছাড়িয়া অনেকটা স্বার্থের কথা বলিয়াছেন। ইউটিলিটি মানুষকে সাধারণতঃ স্বার্থের পথে লইয়া যায়। মানুষ কর্ত্তব্যতার সাধনা করিতে গিয়া প্রকারান্তরে স্বার্থের সাধনা করে। একথা বোধ হয় আর দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে হইবে না। বেন্থাম দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ, তাঁহার দর্শনশাস্ত্রের আমরা অমান্য করি না; কিন্তু জনসাধারণকে বুঝা-ইবার জন্য কোন একটা নূতন শাস্ত্রের অবতারণা হইল বলিয়া তাহা স্বীকার করিতে আমরা অনেক সময়ে কুণ্ঠিত হই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সংসারে স্বার্থের উপাসনা কে না করে? ইউটিলিটিসাধনা যদি স্বার্থসাধনার রূপান্তর হয়, তাহা হইলে ইহা নূতন নয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানগুরু হেমিল্টন (Hamilton) বোধ হয় এই জন্যই হিতবাদীসম্প্রদায়ের তত আবশ্যকতা স্বীকার করেন না।* ইউটিলিটিসাধনার প্রশ্রয়প্রবণতা সমাজের পক্ষে অনেক সময়ে ঘোর বিপত্তির কারণ হইয়া উঠে। ইউটিলিটির দোহাই দিয়া ইংরাজ দুঃখীর মুখ না তাকাইয়া অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট ভারতবাসীর উপর নিত্য নূতন ট্যাক্স বসাইয়া থাকেন। সমাজের সহিত স্বার্থের সংঘর্ষ হইলে যে অনিষ্ট ঘটে, সমাজের সহিত ইউটিলিটির সংঘর্ষেও প্রায় সেই প্রকার অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। সুতরাং সামাজিক জীবনে এ প্রকার মতের আদর বাড়িলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হইবে না।

* But what is a Utilitarian? Simply one who prefers the useful to the useless; and who does not?

Sir. W. Hamilton.

অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন বিজ্ঞানবিদ্ মনীষিদিগের কথা টানিয়া আমরা সামাজিক জীবনের নিকট স্বাতন্ত্র্যজীবনকে নত করিতেছি দেখিয়া যদি কেহ তীব্রভাবে ভ্রূকুটী করেন, কি করিব ? সে আশঙ্কার জন্য সরল সত্যের অপলাপ করিতে পারি না। সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, সমাজ ঠিক আমাদের শরীরের ন্যায়। শরীরের প্রত্যেক অংশগুলি যদি স্বেচ্ছামত কার্য্য করে, মানুষ শরীর রাখিতে পারে না, তাহা দুই দিনেই নষ্ট হইয়া পড়ে। তেমনি সমাজের প্রত্যেক মনুষ্যই যদি স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, মনুষ্যসমাজ চলে না, তাহা অতি অল্পদিনেই ছারখার হইয়া যায়। তা ছাড়া আবার, শরীরের সহিত শরীরের অংশগুলির এমনি সম্বন্ধ, শরীরের ধ্বংসের সহিত সে অংশগুলির একে একে ধ্বংস হইতে থাকে। তেমনি সমাজের সহিত মনুষ্যের এমনি সম্বন্ধ, সমাজের ধ্বংসের সহিত তাহারও ধ্বংস আরম্ভ হয়। মানুষ সমাজ সংগঠন করিলে কি লইয়া ? সৃষ্টির আদি কালে কদাচিৎ মানুষ স্বাতন্ত্র্যময় হইয়া চলিতে পারিত, কিন্তু এক্ষণে সে বংশবৃদ্ধির নিয়মে বাধ্য হইয়া বহুপরিবারে মিশিয়াছে,—মানুষ এখন সমাজ না হইলে থাকিতে পারে না। স্বার্থ অপেক্ষা সমাজ বহুপ্রকারে উপাস্য।

সত্য, সমাজ অনেক সময়ে স্বার্থের কঠোর আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাও সত্য, স্বার্থ সকল সময়েই সমাজকে ভয় করিয়া চলে। সমাজের বিরুদ্ধে স্বার্থ যাহাই কেন করুক না, কিন্তু ইহা তাহাকে অবশ্যই মানিতে হইবে যে, তাহা অপেক্ষা সমাজ অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর। সমাজ যাহা করে, তাহার প্রকৃত কারণ কখনও গোপন করিবার আবশ্যক হয় না; কিন্তু স্বার্থ যাহা করে, তাহা অনেক সময়ে লুকাইতে হয়। ইংরাজী আরাবীকে বন্দী করিলেন—কেন ? ইংরাজের স্বার্থ কি সে কথার ঠিক উত্তর দেয় ? ইংরাজ ঘোষিতের কথা পড়িয়া নানা বাক্ছলে প্রকৃত কথা গোপন করেন। গোপন করেন, সমাজের ভয়ে। স্বার্থ একদিকে সমাজকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছে। তথাপি সমাজের ভয় তাহার এখনও যুচে নাই। ইংরাজ বল, মুসলমান বল, ফিরিঙ্গি বল, বাঙ্গালী বল, এখনও অনেকে স্বার্থের শক্তি-পূজার মাতিয়া দেখ যে রসাতলে যেন নাই, সে কেবল সমাজের ভয়ে। স্বার্থ যতই আরি-ক্কন, যতই তাহাপেক্ষা সমাজ অনেক গুণে বড়।

যদি মনুষ্য-জীবনের ইতিহাস মনোযোগের সহিত পাঠ করা যায়, স্পষ্ট প্রতীত হইবে, মানুষ মানুষের জন্য জন্মিয়াছে। মানুষ মানুষের সঙ্গ না হইলে প্রাণ ধারণ করিতে পারে না। সমাজ এই ঘনিষ্ঠতা আরো দৃঢ়তর করিয়া দেয়, কিন্তু স্বার্থ এই ঘনিষ্ঠতার শৃঙ্খল বিযুক্ত করিতে চেষ্টা পায়, মানুষ হইতে মানুষকে পৃথক করিয়া দেয়। উভয়ে যখন স্বার্থের দাস, উভয়ে যখন স্বাতন্ত্র্য-পরবশ, উভয়ে যখন স্বেচ্ছাচারী, তখন পরস্পরে মিল হইবে কি প্রকারে? অথবা একজন যদি স্বার্থ সাধন করিবার জন্য অন্য জনের প্রতি পীড়ন করে, পীড়কের সহিত পীড়িতের প্রীতি হইবে কেমন করিয়া? স্বার্থের প্রশ্রয় হইলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটে, সুতরাং মনুষ্য সামান্য সুখের জন্য প্রধান সুখে বঞ্চিত থাকে। সমাজ ভিন্ন মনুষ্যের প্রকৃত সুখ কোথায়? সমাজ ভিন্ন মনুষ্যের হৃদয়ে শান্তি আনিয়া দিবে কে? মানুষ শান্তি হারাইলে সমাজ কি প্রকারে তাহার হৃদয়ে শান্তি আনিয়া দেয় বিজ্ঞানবেত্তা স্মিথ (Smith) তাহা বুঝাইয়াছেন।● তাঁহার মতে সমাজ মনুষ্য হৃদয়ে আত্মপ্রসাদ জন্মাইবারও বিলক্ষণ সহায়তা করে। বাস্তবিক; সুখকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উদ্দেশ্য না গণিয়া পরম্পরা সম্বন্ধে গণনা করাই কর্তব্য। সমাজ তাহাই করিতে বলে। তাহা না করিলে, উচ্চতর বৃত্তি সকল প্রসারিত হইতে পারে না, মনুষ্যজীবন পশুজীবনে পরিণত হয়।

কিবতী মারিয়া।

পারস্য ভাষার সুপ্রসিদ্ধ মহাকবি গঞ্জবি নেজামদ্দিন সেখ সি, মহাবীর আলেকজাণ্ডারের জীবনবৃত্ত অবলম্বন করিয়া "সেকেন্দরনামা" নামক যে

● **Society and conversation, therefore, are the most powerful remedies for restoring the mind to its tranquility if at any time, it has unfortunately lost it: as well as the best preservation of that equal and happy temper, which is so necessary to selfsatisfaction and enjoyment.**

Adam Smith's Moral Sentiment.

সুবিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করতঃ সাহিত্যরাজ্যে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা 'সরফ্ নামা' ও 'নহবি' এই দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। বিদ্যোৎসাহী নবাব নসরতুদ্দিনের প্রোৎসাহে ও আনুকূল্যে হিজরী ৪৯৮ সালের কিশোরাবস্থায় এই মহাগ্রন্থ পরিসমাপ্ত করিয়া, গঞ্জবি, ৬৩ বৎসর ৬ মাস কাল বয়ঃক্রমে (হিজরী ৫৯৯ সালের ১০ই চৈত্র দিবসে) জীবলীলা সম্বরণ করেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য তিনি বাদসাহের নিকট হইতে বিংশতি সহস্র রৌপ্য মুদ্রা এবং বহুবিধ মূল্যবান ঘোটক, পরিচ্ছদ ও কনক নির্ম্মিত ভোজনপাত্র পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গঞ্জবি যত দিন জীবিত ছিলেন তত দিন প্রতি বৎসরে বৃত্তিস্বরূপ দুই শত স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন। ফলতঃ, এরূপ গ্রন্থকারের কবিত্ব, রচনা-পারিপাট্য এবং অনুসন্ধিৎসা নিতান্ত প্রশংসনীয়। নবাব নসরতুদ্দিনের বিদ্যোৎসাহিতা চির কাল ইতিহাসে জীবন্ত এবং জ্বলন্ত ভাবে বিদ্যমান থাকিয়া ইরাণদেশজ 'কর্' বংশীয় রাজাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করিবে। আমি গঞ্জবি প্রণীত মহামূল্য মহাকাব্য হইতে 'নয়োশাবা' এবং 'কিবতী মারিয়া' নাম্নী দুইটী রমণীর মনোরম জীবনবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছি; অদ্য কিবতী মারিয়া সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিলাম, পর প্রস্তাবে নয়োশাবার কথা লিখিব। "কল্পনার" পাঠক এবং পাঠিকাগণ দেখিবেন যে, যে উপাদানে পৃথিবীর পুরুষ জাতি নির্ম্মিত হইয়াছেন, জগদীশ্বর অবলা নারী জাতিকেও সে উপাদানে সৃজিত করেন নাই।

যিশুখৃষ্টের জন্ম গ্রহণের প্রায় সার্দ্ধ তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে বাক্টিশ্ নামে একজন প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি শ্যাম দেশের সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রঘুকুলতিলক রাজা রামচন্দ্রের ন্যায় অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপুঞ্জ পালন করিয়াছিলেন। তিনি অপুত্রকাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে তদীয় প্রথমা কন্যা কিবতী মারিয়া শ্যামদেশের সিংহাসনে রাণী ও কর্ত্রীরূপে আরোহণ করেন। গঞ্জবি বলেন "রাণী মারিয়া রূপে এবং গুণে ভূষিতা ছিলেন। তাঁহার শাসনে প্রজারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল, এবং তাঁহার সমগ্র রাজ্যে বহুবিধ কোষাগার ও প্রস্তরনির্ম্মিত সুদৃঢ় দুর্গ দৃষ্টিগোচর হইত। মারিয়া সুন্দরী পারস্য, গ্রীক এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন

ছিলেন। সেকেন্দার বাদসার অন্যতম প্রধান মন্ত্রী আরস্তু (Ariatotus ?) পণ্ডিতের নিকটে তিনি গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। মারিয়ার বিদ্যাবত্তা, সুশীলতা এবং প্রজাবাৎসল্য দেখিয়া প্রজারা তাঁহাকে জননী বলিয়া সম্বোধন করিত।" প্রায় সার্দ্ধেক বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিয়া কিবতী পরম সুখে জীবন যাপন করিবার পর, এক সম্প্রদায় অরণ্য-বাসী বলবান দস্যু তাহাদের মধ্যে একজন দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে আপনাদের নেতা করিয়া কিবতীর নিকটে উপস্থিত হইল। ঐ দলপতি দস্যু 'শিওজন্দুল' নামে বিখ্যাত। ব্যাঘ্র চর্ম্মে সর্ব্ব শরীর ভূষিত করিয়া কিবতীর সিংহাসন সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক জন্দুল বলিতে লাগিল "ওহে কিবতি! তোমার পরলোকগত পুত্রশাহ্ জনক মহাশয় মৃত্যুর প্রায় ছয় মাস কাল পূর্ব্বে আমাকে শ্যামদেশের অধিপতি-পদে বরণ করিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহার মৃত্যুর এক সপ্তাহ কাল পূর্ব্ব হইতে অন্য অন্য রাজ্যে ভ্রমণ করিতে ছিলাম, তাহাতেই এত দিন এ রাজ্য গ্রহণ করি নাই। তুমি যদি আমার শাণিত তরবারি হইতে তোমার কোমল মস্তককে রক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে এই দণ্ডে এই রত্নময় সিংহাসন হইতে অবরোহণ করিয়া আমাকে উহাতে উপবিষ্ট করিয়া দাও, নতুবা আমার ক্রোধ হইতে তোমার আর পরিত্রাণের উপায় নাই। যে চর্ম্ম দণ্ডে পরলোকগত রাজা আমাকে শ্যামদেশের নরপতি বলিয়া লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা আমার হস্তে রহিয়াছে।" এই বলিয়া দস্যুবর জন্দুল একখানি কৃত্রিম দলিল দেখাইল। কিবতী বলিলেন "জন্দুল! আমি তোমার একটী কথাও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না। কৃত্রিম দলিলের উপর নির্ভর করিয়া আমি (বিনা যুদ্ধে) তোমাকে একটী সর্ষপ পরিমিত ভূমি দিতেও প্রস্তুত নহি।" দস্যু কহিল "রাণি! যদি তুমি সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে একান্ত অনভিলাষিণী হইয়া থাক, তবে আইস, আমরা দুই জনে এই রাজ্য শাসন করি।" এ কথা শ্রবণ করিয়া কিবতী মারিয়া মৃদু হাস্য করতঃ বলিলেন—

"দঃ দোর্‌বেশ্‌ দর্‌ গিলিমে বখুস্‌ পন্দ্‌।
দো পাদ্‌শা দর্‌ এক্‌লিমে না গুন্‌জন্দ্‌॥
নিম্‌নানে গর্‌ খোরদ্‌ মর্দে খোদা।
বোজ্‌লে দোর্‌বেশা কুনদ্‌ নিমে দিগর্‌॥

অর্থাৎ—একটি কম্বলের মধ্যে দশ জন ফকির উপবেশন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, কিন্তু একটী সুবিশাল রাজ্যে দুই জন রাজা বসিয়া শান্তি লাভ করিতে পারে না। একজন ফকিরের নিকটে এক টুকরা রুটি প্রার্থনা করিলে পাওয়া যায়, কিন্তু একজন নরপতির নিকট হইতে একখণ্ড ভূমি চাহিলে পাওয়া যায় না। এক রাজ্যে দুই রাজা বসিলে, শতরঞ্চের রাজার ন্যায় বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়া থাকে।

এই রূপে কিছুতেই রাণীকে হস্তগত করিতে না পারিয়া, দস্যুবর জঞ্জুন শায়দেশে ভয়ানক উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে মহাবীর আলেকজাণ্ডার চীন এবং রুসিয়া দেশের রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পারস্য দেশে আগমন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিবতী মাহিয়া জঞ্জুনকে দমন করিবার নিমিত্ত তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। কথিত আছে, আলেকজাণ্ডার একদা ৫সহস্র শিক্ষিত অশ্বারোহী প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিবতী সেই সৈন্যের সাহায্যে এবং নিজের অমিত সাহস ও বুদ্ধি কৌশলে উপদ্রবকারী দস্যুদলকে দমন করিয়া রাজ্যের সর্ব্বত্র পুনরায় শান্তিময় করিয়া তুলিলেন*। প্রজারা দুই হাত তুলিয়া সহস্র মুখে তাঁহার যশোকীর্ত্তন করিতে লাগিল। সেকেন্দর নামায় লিখিত আছে "দস্যু সম্প্রদায় অনেক দিন ও অনেক দূর ব্যাপিয়া উপদ্রব করায় প্রজাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। সেই জন্য কিবতী শায়দেশের সমস্ত প্রজাকে এক বৎসরের রাজকর হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন। এই এক বৎসর কাল পরে রাজকোষের অবস্থা এরূপ স্বচ্ছল এবং প্রজাদিগের অবস্থা এরূপ সুখকর হইয়াছিল যে, রাজ্যে প্রায় ভিক্ষুক দৃষ্ট হইতনা এবং রাজকর্ম্মচারিরা ৩মাসের অগ্রিম বেতন পাইতেন। কিবতীর শাসন কালে এমন কোন সৈনিক দৃষ্ট হইত না যে তাহার ঘোটকের খুর স্বর্ণমণ্ডিত থাকে নাই। রাজবাটীর সমুদয় ভৃত্য ধনবান হইয়া উঠিয়াছিল এবং কুকুরেরা পর্য্যন্ত স্বর্ণময় শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিত।"

কিছুকাল পরে কিবতী মাহিয়া, মেহের গিয়া ভুণ এবং আহ্রাণ নামক প্রস্তর যোগে স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার পন্থা আবিষ্কার করিয়া ছিলেন। এই স্বর্ণ প্রস্তুত সম্বন্ধে একটি উত্তম গল্প আছে। একদিন কতক গুলি বৃদ্ধ আসিয়া

বলিলেন' " রাণি ! অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে স্বর্ণ প্রস্তুত করণের বিদ্যায় শিক্ষিত করুন, তাহা হইলে আমরা দারিদ্র্যজ দুঃখ অপনোদিত করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব।" রাণী কহিলেন "তোমরা এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছ ; স্বর্ণ প্রস্তুত করণবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেও তোমরা অধিক স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারিবে না। তোমরা আগামী কল্য প্রভাতে এ স্থানে আগমন করিলে আমি তোমা-দিগকে স্বর্ণ প্রস্তুত করণের এমত এক উপায় শিখাইয়া দিব, যদ্দ্বারা তোমাদের পুত্র পৌত্রাদি পর্যন্ত ভূরি ভূরি স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবে।" পরদিন প্রাতঃকালে তাহারা আগমন করিলে, রাণী কহিলেন "দেখ, বৃদ্ধগণ! বিদ্যারূপ স্বর্ণই উত্তম স্বর্ণ, ইহা যত ব্যয় করিবে ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, কখনই লঘু হইয়া যাইবে না। যতই ব্যয় কর ইহাতে আক্ষেপ জন্মিবে না। ধাতুরূপ স্বর্ণকে দস্যুরা অপহরণ করিয়া লইতে পারে, এবং তজ্জন্য তোমাদের প্রাণ সংহার করিতে পারে, কিন্তু বিদ্যারূপ স্বর্ণ কখ-নই হৃত হইবার সামগ্রী নহে। অতএব তাহাই সংগ্রহ করিবার চেষ্টা কর।" বৃদ্ধগণ কহিল, "আমাদের বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত, এ বয়সে আমরা কেমন করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারিব? অসময়ে কার্য্য আরম্ভ করিলে কোন সুফল প্রসূত হয় কি?" কিবতী বলিলেন "বৃদ্ধ! সকল বয়সে এবং সকল সময়ে জ্ঞানোপার্জ্জন করা যাইতে পারে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াও জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে ঔদাস্য স্বীকার করা বিজ্ঞের কার্য্য নহে।" এই কথা বলিয়া দরিদ্র বৃদ্ধগণকে বহু শত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া তিনি বিদায় করিয়া দিলেন। বৃদ্ধেরা তাঁহার গুণরাশির প্রশংসা করিতে করিতে গৃহে চলিয়া গেল।

কিবতী মারিয়া ৩২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। শ্যামদেশের লোকেরা এখনও 'কিবতী মারিয়া' নামটি প্রভূত ভক্তি সহকারে উচ্চারণ করিয়া থাকে এবং তত্রত্য ধর্ম্মশীলা বৃদ্ধা রমণীগণ 'কিবতী মরিয়া' নাম শুনি-লেই চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করেন। আলেকজান্দর লিখিয়াছেন "আমি মারিয়া রাণীর গুণরাশি দর্শন ও শ্রবণে এতদূর মোহিত হইয়াছিলাম যে প্রতি বৎসর তাঁহাকে সন্দেশ উপহার না পাঠাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতাম না।" *

* "সেকেন্দর নামা ;" বহরি, ১৭-১৮-১৯ ২০ অধ্যায় ভাল পাঠ কর।

নয়োশাবা ।

"পর্ রে তাউস্ বর্ আয়োরাক্ মোসাহাফ্ দিদম্ ।
গোফ্তম্ ঈ মন্জলৎ আজ্ কদরে তোমেয়ে বিনম্ বেশ্ ॥
গোফ্ৎ খামোষ ! হারাকেহ্ জমালে দারদ্ ।
হর্ জাকে পা নেহদ্ দস্তে আদবারশ্ পেশ্ ॥"

(গোলেস্তাঁ ।)

কিওমারিয়ার কথা বলিয়াছি, এক্ষণে নয়োশাবার (১) কথা বলিতেছি ।—

দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজান্দর (সেকেন্দর বাদসাহ) জঙ্গবার, মিসর, আজম্, পারস্য ও আরব্য দেশে জয়পতাকা উড়াইয়া, তগ্‌লিশ্ মরুর সন্নিহিত বর্দা দেশের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। তথাকার কুসুম-কাননের সৌরভ, সুকণ্ঠ বিহঙ্গ বর্গের মধুর রব, মনোহর শস্যক্ষেত্রের অপরূপ দৃশ্য, তড়াগ সকলের বিমল সলিলের হিল্লোল, অগণিত জাফ্রাণ্ বৃক্ষের আঘ্রাণ সুগন্ধি, এবং রত্ন মণ্ডিত অত্যুচ্চ প্রাসাদ সকলের শোভা নিত্য নিত্য তাঁহার নয়ন ও মনের তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল। বহুদিনের নরশোণিত-লোলুপ যুদ্ধকাণ্ডের অস্থিমাংসভেদী পরিশ্রমের পরে, বহুদিনের মরু, গিরি, উপত্যকা, অরণ্য পর্য্যটনের কঠোর ক্লেশের পরে, আলেক্‌জান্দার এই সুন্দর স্থান দর্শন করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে বিশ্রামলাভ করিতে লাগিলেন। বাদসাহ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আহা! এমন মনোহর স্থান আর আমি কখন দেখি নাই; এ স্থানের অধীশ্বর কে বলিতে পার? করুণাময় জগদীশ্বর এমন সুন্দর রাজ্যের রক্ষার ভার যাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, তিনি নিতান্ত সৌভাগ্যবান্।" মন্ত্রী বলিলেন "প্রভো! এই বর্দা (২) রাজ্যের রক্ষার ভার ঈশ্বর যাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, তিনি একজন স্ত্রীলোক। তাঁহার নাম নয়োশাবা। নয়োশাবার মন সরল

(১) প্রসিদ্ধ পারস্য গ্রন্থ "সেকেন্দর নামা" হইতে সংগৃহীত।

(২) বর্দা দেশ কোথায় ঠিক করিতে পারিলাম না। সেকেন্দর নামায়

বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, জিহ্বা মিষ্টভাষিণী, চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, পাণ্ডিত্য অগাধ এবং শরীর দেবদুর্লভ সৌন্দর্য্য মূর্ত্তিমান। ত্রিংশত সহস্র অশ্বারোহী এবং দুই সহস্র বীরনারী রাজ্যের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সুচারু রূপে রাজ্য রক্ষা করিতেছে। তাঁহার রাজ্যে কৃষি কার্য্যের উন্নতি জন্য বহুল খাল আছে, ধর্ম্মসাধনার জন্য অসংখ্য মস্‌জিদ্‌ আছে, বিদ্যা শিক্ষার জন্য আধুনিক বৈঠক আছে, বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি জন্য অসংখ্য শকট আছে এবং দস্যুভয় নিবারণ জন্য সর্ব্বত্র প্রশস্ত বর্ত্ম ও সুদক্ষ রক্ষক নিযুক্ত আছে।" এই কথা শুনিয়া বাদসাহ কহিলেন "সচিব-শ্রেষ্ঠ! সেই অপর্ব্ব সদ্গুণসমন্বিতা বর্দ্দাধিশ্বরীকে দেখিবার জন্য আমার মন নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছে। কিন্তু আমি নিজের নাম এবং রাজবেশ গোপন করিয়া দূতবেশে তাঁহার নিকট গমন করিব।"——পাঠক! এই অবসরে আমি আপনাকে নরো-শাবার কথা কিছু বলিয়া দিই।

নরোশাবা যবনবংশ সম্ভূতা, কখন বিবাহ করেন নাই, চিরকৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি সমুদয় রাজকার্য্য নিজে নিষ্পাদন করিতেন এবং রাজ্যসংক্রান্ত সমগ্র বিভাগে স্ত্রীলোকেরাই নিযুক্ত ছিল। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে নরোশাবা পুরুষের মুখ দর্শন করিতেন না। পারস্য কবিরা এই নারীর সাহস এবং বুদ্ধির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। শুনা যায়, মল্ল যুদ্ধের জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। নরোশাবার প্রকৃতি সরল ছিল, কিন্তু যখন তাঁহার ক্রোধ হইত তখন সে ক্রোধাগ্নি সহজে নির্ব্বাপিত হইত না। সহসা তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিতেন না, এবং ক্রোধান্বিতা হইয়া কখন কাহারও সর্ব্বনাশ সাধন করিতেন না। তিনি পট্টবস্ত্র পরিতে বড় ভাল বাসিতেন; সুরা এবং সঙ্গীত তাঁহার প্রিয় ছিল। কথিত আছে, নরোশাবা এবং তাঁহার সহচরী ও দাসীগণ রতি-ক্রীড়ায় সম্পূর্ণ রূপে বিরত ছিলেন। সেকেন্দর নামায় লিখিত আছে

লিখিত পূর্ব্বে এই দেশের নাম 'হরুম্' ছিল। গ্রন্থকার নেজামি বলেন "বর্দ্দা দেশের আর পূর্ব্বতন সৌন্দর্য্য নাই, কিন্তু এখনও যেরূপ শোভা আছে, সর্ব্বত্র পৃথিবীর মধ্যে দুই চারিটি রাজ্য ভিন্ন আর কাহারও তেমন শোভা নাই।"

"নয়োশাবার কিছুরই অভাব ছিল না, কিন্তু তিনি প্রতিদিন প্রভূত ভক্তি সহকারে পরমেশ্বরের উপাসনা ও ধর্ম্মসাধনার জন্য বিশেষ কঠোরতা স্বীকার করিতেন।" নয়োশাবার পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তখন তাঁহার বয়ক্রম অষ্টাদশ বৎসর মাত্র। তাঁহার সমগ্র রাজ্যের আয় সাত কোটি স্বর্ণ মুদ্রা ছিল।

চল, পাঠক! এখন দূতবেশধারী সেকেন্দরের সহিত নয়োশাবার বিরাট সভায় একবার প্রবেশ করি। নয়োশাবার অট্টালিকার দ্বারদেশে বাদসাহ উপস্থিত হইলে, দাসীগণ দ্রুত পদে রাজ্যেশ্বরীর নিকট গমন করিয়া বলিল "রাজ্ঞি! আমাদের দেশের প্রান্তভাগে যে একজন মহাবীর বাদসাহ শিবির সন্নিবেশ করিয়া সগৌরবে কালযাপন করিতেছেন, তাঁহারই প্রেরিত একজন দূত আপনার দ্বারদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান আছেন। সে ব্যক্তিকে দেখিয়া নিতান্ত বিবেচক ও গম্ভীর বলিয়া বোধ হইল। তাহার মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত অবয়বে বিজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। তাহার সুন্দর মূর্ত্তি দর্শন করিলে পরমেশ্বরের মহিমা স্মরণ হইয়া উঠে।" এই কথা শুনিয়া নয়োশাবা অন্তঃপুর হইতে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। ছদ্মবেশী সেকেন্দার তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে, তাঁহাকে কিয়ৎক্ষণ অনিমিষ লোচনে নিরীক্ষণ করিয়াই রাজ্যেশ্বরী বুঝিতে পারিলেন যে ইনিই সেকেন্দার। কিন্তু বাদসাহ কিছুতেই আপনার পরিচয় দিলেন না। এই সময়ে রাণীর সহিত সেকেন্দর বাদসাহের যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ বিবৃতি দিতে গেলে প্রস্তাব অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, এই জন্য উদ্ধৃত করিলাম না। ফল কথা এই যে, বাদসাহ শেষে বাক্যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং আত্ম পরিচয় দিয়া রাজ্ঞীকে আপ্যায়িতা করিলেন। সেকেন্দার সহজে পরিচয় দেন নাই। নয়োশাবার নিকটে রুম হইতে হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত সমস্ত রাজাগণের প্রতিকৃতি (Photograph) ছিল; যখন রাজ্ঞী আলেক্জাণ্ডারের সম্মুখে তাঁহার ছবি খানি আনিয়া বলিলেন "বলুন দেখি, মহাশয়! এ খানি আপনার তসবির কি না?" তখন তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না। এই সময়কার উভয়ের কথোপকথনে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, বাক্যুদ্ধের পর নয়োশাবার অনু

যোগে আলেকজান্দার বাদসাহ আহার করিতে বসিলেন। সমুখস্থ ভোজন পাত্র গুলি শুভ্র বস্ত্র খণ্ডে আচ্ছাদিত ছিল; বাদসাহ ঐ সকল পাত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিলেন তাহাতে আহারীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অগণিত স্বর্ণ মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা, বহু মূল্য রত্ন, মাণিক্য এবং হীরক খণ্ড সাজান রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহার আহার হইল না, প্রসারিত হস্ত নিজেই লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। এই সময়ের একটু জ্ঞানগর্ভ রহস্য আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

নরোশাবা।—ভূপাল! যে সমস্ত ভক্ষ্য দ্রব্য আপনার সমুখে রহিয়াছে, আপনি তাহা ভক্ষণ করুন।

সেকেন্দর।—হে অকপটচিত্তে! মনুষ্য কি রত্ন ভক্ষণ করে? মনেরই বা ইহা ভক্ষণ করিতে অভিলাষ হইবে কেন? ভোজন করিবার উপযুক্ত খাদ্য পাইলে ভোজন করিতে পারি।

নরোশাবা।—ভূপাল। যদি রত্ন ভক্ষণই করা যায় না, তবে আপনি কেন এই অভক্ষ্য রত্ন সংগ্রহের জন্য যুদ্ধ, বিগ্রহ, শোণিতপাত, বধ প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া নিত্য নিত্য পৃথিবীকে জীবরক্তে প্লাবিত করিতেছেন? পণ্ডিতেরা বলেন, এ সকল প্রস্তর মাত্র, সুতরাং তাঁহারা প্রস্তর বোধে এ সকল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমরা রিক্ত হস্তে সংসারে আসিয়াছি, রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যাইব, ধনরত্ন আমাদের সঙ্গে যাইবে না।

সেকেন্দর।—নারীশ্বরি! তোমার রহস্য বিশেষ জ্ঞানগর্ভ বটে। যাঁহারা রত্ন সঞ্চয় করেন, পরিণামে প্রস্তর ভিন্ন আর কিছু তাঁহাদের হস্তগত হয় না। কিন্তু তুমি যদি স্বয়ং রত্ন সঞ্চয় না করিতে, তোমার মূল্যবান মুকুটে যদি অত্যুজ্জ্বল রত্ন দীপ্তি বিস্তার না করিত, যদি তোমার প্রাসাদে রত্ন খচিত মনোহর দ্রব্যাদি তুষার নয়নের তৃপ্তি সাধন না করিত, তাহাহইলে এ কথা তোমার মুখে শোভা পাইত। হায়! পরিণামে তুমি ও আমি এক পথের পথিক; পরিণামে এ সমস্ত প্রস্তরবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এই রূপে রহস্য সমাপ্তে বাদসাহ বিবিধ প্রকার সুস্বাদু ভক্ষ্য দ্রব্য আহার

করিতে বলিলেন। অতঃপর মহাবীর আলেকজাণ্ডার নরোশাবার প্রাসাদ হইতে গমনোদ্যত হইলে রাজ্ঞী তাঁহাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ সমূহ উপঢৌকন দিতে লাগিলেন। নরোশাবার ব্যবহারে বাদসাহ নিতান্ত প্রীত হইয়া বলিলেন "সম্রাজ্ঞি! কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অন্যথায় অধর্ম আছে। তুমি আমার প্রতি আজি যে সকরুণ ভাব প্রকাশ করিলে, তজ্জন্য আমি আজীবন তোমার নিকটে বাধিত হইয়া রহিলাম।" এই কথা বলিয়া পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করত রাজ্ঞীর হস্তে দিয়া চলিয়া গেলেন। রাজ্ঞী দেখিলেন তাহাতে লেখা আছে "মহারাজ্ঞী নরোশাবা যে সকল ভূষণে ভূষিতা, আমাতে সে সকল মহামূল্য নাই। আমার প্রতি তিনি যে রূপ উদার ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি কখন তাঁহার প্রতি তেমন ব্যবহার করিতে পারিব কিনা সন্দেহ। আমি একণে হজরৎকে প্রত্যক্ষ স্বরূপে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যত দিন জীবিত থাকিব, তত দিন নরোশাবার রাজ্যে কখন উপদ্রব করিব না, এবং সকল সময়ে তাঁহার সাহায্য করিব।" কিয়দ্দিবস পরে রাজ্ঞী নরোশাবা সেকেন্দরের শিবিরে নিমন্ত্রিতা হইয়া গমন করিলে বাদসাহ তাঁহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা ও সমাদর করিয়াছিলেন। বাদসাহ তাঁহাকে রত্নখচিত পরিচ্ছদ, সুবর্ণ নির্ম্মিত আস্তরণ, পান্নার অঙ্গুরি, আতলস বস্ত্র, বহুমূল্যবান ইয়াকুত প্রস্তর, উৎকৃষ্ট মৃগনাভি, ৩ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা, বহুল রত্ন. মাণিক্য, হীরক খণ্ড, বেগবান অশ্ব, সুন্দর উষ্ট্র এবং মরুক দেশীয় বৃহদাকার হস্তী সমূহ উপঢৌকন দিয়াছিলেন।

এই রূপে সুন্দরী নরোশাবা কিছুকাল নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করিলে পর রুসিয়া দেশের লোকেরা আসিয়া তাঁহার রাজ্যে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। এই উপদ্রব এবং অত্যাচার পরিণামে বিষম যুদ্ধে পরিণত হইয়া উঠিল। সেকেন্দর নামায় এই অত্যাচারকারী সম্প্রদায়গণ পুরতাসী, গরগী খকচাক, আলানী, খেজরাণ প্রভৃতি নামে খ্যাত। ইহারা সকলে রুস রাজার অধীন। তাহাদের নিত্য নিত্য অত্যাচার সমূহ দর্শন করিয়া নরো-শাবা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, সুতরাং অবিলম্বে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। নরোশাবার সহিত রুসরাজ-প্রেরিত সৈন্য-সম্প্রদায়ের ৩ দিন ব্যাপিয়া মহা যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এই যুদ্ধে পরিশেষে নরোশাবা পরাজিতা

হইয়া রুসরাজ হস্তে বন্দিনী হয়েন। তিনি যুদ্ধে পরাজিতা হইয়াছিলেন বটে কিন্তু যেমন অদ্ভুত বীরত্ব এবং অমিত সাহস আর কেহ কখন দেখে নাই। প্রবল পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী রুসরাজের সহিত একজন যুবতী স্ত্রীলোকের যুদ্ধ!! ফলতঃ যে নারীর দুর্দমনীয় শক্তি রুসিয়ার ন্যায় একজন মহাবীর সম্রাটের বাহুবলকে বিসপ্ততি ঘণ্টাকাল নিরস্ত্র ও অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছিল, যে শক্তি ঐরাবত হইতেও অধিক তেজ ধারণ করিয়া প্রায় দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বলবান সৈন্যের গতি রোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা সামান্য নহে। পারস্য কবিরা বলেন "সেই যুদ্ধের বিবরণ যাহারা পাঠ অথবা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাঁহারা নয়োশাবাকে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সুপবিত্র সিংহাসনের বামপার্শ্বে বসাইতে স্বতঃ স্বীকৃত হইবেন। একথা যিনি অস্বীকার করেন, তিনি হয় মানবপ্রকৃতি বুঝেন না, কিম্বা একটা সহজ কথা বুঝিবার সহজ জ্ঞান তাঁহার নাই। বামাবোধিনীর যে সকল পাঠিকা নারীজাতি পুরুষ জাতির সমকক্ষ নহে বলিয়া প্রতিনিয়ত আক্ষেপ করেন, তাঁহারা এখন দেখুন নারী কোন অংশেই পুরুষাপেক্ষা কম নহে। কোন গীতকার বলেন——"নারী যেমন পুরুষ তেমন নয়।"——একথা যে বলে, সে স্ত্রীচরিত্র বুঝে না, সংসারের কোন খবরই রাখে না।

যাহা হউক, মহামতি আলেকজণ্ডার নয়োশাবাকে রুসরাজের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া এরতাজ দেশাধিপতি দেওয়ালির সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। তখন কেণ্ডাল রুসিয়ার ভূপতি ছিলেন। নয়োশাবা ৩১ বর্ষকাল বয়সে জীবলীলা সম্বরণ করেন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

লৌহশিল্প।

আমি এইরূপ বুঝি, সংসারে থাকিতে হইলে যত কিছু বিদ্যার প্রয়োজন, তাহার মধ্যে শিল্পবিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। অন্যান্য বিদ্যার উপকারিতা আছে সত্য, কিন্তু উপকারিতায় শিল্পবিদ্যার সহিত সে সব তুলনা হইতে পারে কি না সন্দেহ। মানুষ পেটের দায়ে জ্বালাতন, অন্নের

চেষ্টায় সংসাধিত, অন্ন যাহাতে জুটে এমন শিল্পবিদ্যার ন্যায় অন্য বিদ্যা দেখি না। টোলের পণ্ডিত আজীবন ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, দর্শন পড়িয়া তর্কসিদ্ধান্ত, ন্যায়রত্ন প্রভৃতি উপাধির হার গলায় ঝুলাইলেন, কিন্তু গৃহিণীর গৃহশূন্যতার জন্য তর্জ্জন গর্জ্জনের ভয় ঘুচিল না। স্মার্ত্তবাগীশ পাড়ার পাড়ার ব্যবস্থা দিয়া বেড়াইয়া থাকেন, কিন্তু আপনার অন্নহীনতার ব্যবস্থা আজও হইল না। শাস্ত্রবিদ্যার কথা যাউক, শস্ত্রবিদ্যার দশা তাহা অপেক্ষাও হীন। শস্ত্রবিদ্যার চর্চ্চা আমাদের দেশে নাই, যাহা আছে তাহার উপকারিতা অতি যৎসামান্য। সিপাহীরা যুদ্ধে প্রাণ দিবার জন্য সদাই প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহাদের মাসিক বেতন ৮ আট টাকা! সঙ্গীত বিদ্যার শ্রেষ্ঠতার কেহ কেহ প্রতিপন্ন করিতে যত্ন পান, কিন্তু সে ভ্রান্তি মাত্র। 'গানাৎ পরতরং নহি' ভরত মুনির এ কথা যে মানে সে মানুক, আমি মানি না। সঙ্গীতবিদ্যায় পেট ভরে না, চালে খড় জুটে না। তাহার এক মাত্র কারণ, সঙ্গীতের আদর কয় জনে বুঝে? পাশ করা বিদ্যার আদর আজ কাল বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহারও উপকারিতা দেখি না। এম, এ পাশ করিয়া শেষ যাবজ্জীবন উপার্জ্জন করিলেও পাশ করিবার খরচ পোষায় না। চাকুরি ভিন্ন তাহার অন্য গতি নাই। যিনি রসিক, তিনি হয়ত বিদ্যার তুলনার কথা শুনিয়া বলিবেন, "চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা," কিন্তু সে সব রসের কথা হইতেছে না। বাস্তবিক পেট ভরাইতে পারে শিল্পবিদ্যার ন্যায় এমন বিদ্যা আর নাই। ইহাতে স্বাধীন থাকা যায়, পরের গোলামি করিবার তত আবশ্যকতা করে না, অথচ যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন হইয়া থাকে। শিল্পবিদ্যার চর্চ্চা দেশে যত বাড়িবে ততই দেশের উন্নতি হইবে। উপকারিতায় ইহার তুল্য অন্য বিদ্যা নাই।

এখন আমাদের দেশের কথা বলি। পূর্ব্ব হইতে আমাদের দেশে শিল্পের আলোচনা ছিল। বৈদিক সময়ে, আর্য্য ঋষিদিগের সময়ে, পৌরাণিক সময়ে সকল সময়েই ভারতে শিল্পের চর্চ্চার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সে সময়ের শিল্পীদিগের নাম উচ্চারণ করিয়া একথার প্রমাণ দেখাইবার আবশ্যকতা করে না। আবালবৃদ্ধ সকলেই তাহা জানেন। তার পর যে সময় আসিয়াছিল, তখনও এ বিদ্যার চর্চ্চা কমে নাই। শিল্পকর্ম্মের জন্য

স্বতন্ত্র সম্প্রদায় ছিল। কর্ম্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতি এক একটি শ্রেণী ছিল। ইহার উপর আবার ঘরে ঘরে শিল্পকার্য্যের আলোচনা দেখা যাইত। ব্রাহ্মণের গৃহিণীরা পর্য্যন্ত পৈতা কাটিত, শিকা বুনিত, বড়ি ভাঙ্গাইত, আরও কত শিল্পকর্ম্ম করিত তাহার কত নাম করিব? ইদানীং সে সব শিল্পের আর বড় চর্চ্চা দেখি না। শিল্পের চর্চ্চা নাই বলিয়াই হীনাবস্থা হইয়াছে। শিল্পকর্ম্মের জন্য যে স্বতন্ত্র শ্রেণী ছিল, তাহারা পর্য্যন্ত এখন শিল্পকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছে। সকলের মধ্যে পাশ করা বিদ্যার বড় একটা তরঙ্গ উঠিয়াছে। কর্ম্মকার জাঁতা টানা ছাড়িয়া এ বি ধরিয়াছে, যে কুম্ভকার আগে ঘট গড়িত সে এখন তাহা রাখিয়া বিএ পাশ করিয়া হাউসে চাকুরি করিতেছে। তাঁতি তাঁত বেচিয়া পুত্রের কলেজের খরচ চালাইতেছে। পুরসুন্দরীরা সে সব ছাড়িয়া নাটক নভেল ধরিয়াছেন। দেশের অবনতির মূল কারণ শিল্পের অবনতি।

আমাদের দেশে শিল্পের যেমন অবনতির দিন পড়িয়াছে, বিলাতে এখন তেমনি ইহার উন্নতির সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজদিগের সেই পশুসাহচর্য্য হইতে এই উন্নত অবস্থা হইল কোথা হইতে? অনেকে বাণিজ্য তাহার কারণ নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু আমরা বাণিজ্য গৌণ কারণ বলি, ইহার মুখ্য কারণ শিল্প। ইংরাজ আজ কাল শিল্পবিদ্যার অত আলোচনা যদি না করিত, তাহা হইলে তাহাদের বাণিজ্যপ্রবাহিণী এত দূর বিস্তৃত হইতে পারিত না, পরের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া জাহাজ ভাড়া দিয়া দেশান্তরে লইয়া গিয়া তাহার বাণিজ্য করিতে হইলে ইংরাজ এত হঠাৎ আপনাদের অবস্থা উন্নত করিতে পারিত না। ইংরাজ কোনও জিনিষ পরের নিকট হইতে কিনিয়া বাণিজ্য করে না। তাহারা আপনাদের জিনিষ দিয়া আপনাদের বাণিজ্য চালায়। সেই জন্য ইংরাজ আজ রাজরাজেশ্বর, লক্ষ্মীর বরপুত্র, জাতির অগ্রগণ্য।

আর ভারত? ভারতের আজ দুরবস্থার শেষ নাই। ভারতবাসী নিরন্ন, নির্জ্জীব, মুষ্টিভিক্ষার জন্য পরের গোলাম। এত হীন অবস্থা কেন? ভারতবাসী বাণিজ্য করিতে জানে না, অনেকেই ইহা তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কথাটা নিতান্ত অন্যায় নহে। কিন্তু মূল কথা হইতেছে কি,

বাণিজ্য করিতে জানে না বটে, কিন্তু বাণিজ্য করিবে কি লইয়া? ভারতের আছে কি? যাহা ছিল তাহা আর নাই। যে সব দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারিত এখন তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। শিল্পের চর্চ্চা ভারতে আর দেখিতে পাই না। একটি সূচের জন্য বিলাতের মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয়, এত যে তাঁতির বাস ছিল তথাপি লজ্জাবস্ত্রের জন্য ম্যানচেষ্টর ভিন্ন তাহার আর গতি নাই। তবে ভারত বাণিজ্য করিবে কি লইয়া? আমরা দেশহিতৈষী সমাজসংস্কারকদিগকে বলি, বাণিজ্যবৃত্তি চালনার পূর্ব্বে তাঁহারা ভারতে শিল্পের বিস্তার করুন? জিনিষ তৈয়ার হইলেই খরিদদার জুটিবে। ব্যবসায়ের সামগ্রী থাকিলে, ব্যবসায় আরম্ভ করিতে কতক্ষণ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিস্ফলা পাখিপড়ান বিদ্যার কথা ছাড়িয়া যাহাতে শিল্পবিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হয় তাহাই বলিবার জন্য আমরা আজ এই কথা পাড়িয়াছি। আপাততঃ লৌহশিল্পের কথা বলিতেছি। ভারতে লৌহশিল্পের চর্চ্চা বহু দিন হইতে ছিল। এমনা কর্ম্মকার নামে আজও এক স্বতন্ত্র শ্রেণী বাস করিতেছে। দেবতাদিগের আমলেও বিশ্বকর্ম্মার গল্প আছে। বিশ্বকর্ম্মা অহোরাত্র আপনার শিল্পাগারে বসিয়া জাঁতা ঘুরাইতেন, মুদ্গরাঘাতে লৌহ পিটিতেন, দেবতাদিগের নিয়োগ অনুসারে আশ্চর্য্য দ্রব্যনিচয়ের সৃষ্টি করিতেন। দুঃখের কথা, যে ভারত লৌহশিল্পের উপকারিতা বুঝিয়া কল্পনাবলে বিশ্বকর্ম্মাকে কর্ম্মকারদিগের দেবতা বলিয়া পূজা করে, সেই ভারত আজ একটী সূচের জন্য পরের মুখ তাকাইয়া থাকে। ভারতে লৌহশিল্পের প্রয়োজন বড় বাড়িয়াছে। প্রয়োজন বাড়িয়াছে কেন বলিতেছি, তাহার আর অধিক কি কারণ দেখাইব? লৌহশিল্প বহিলে মানুষের কোন্ কার্য্য হইয়া থাকে? হাতা, বেড়ি, দা, কুড়ালি হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষের প্রতি কার্য্যে লৌহশিল্পের প্রয়োজন। দৈনিক ব্যবহারের জন্য যা কিছু বস্তুর আবশ্যক তাহার অধিকাংশ লৌহ অস্ত্র ভিন্ন প্রস্তুত হয় না। ঘর বাঁধিতে, পুকুর কাটিতে, লাঙ্গল বাঁধিতে কোন্ কাজটা লোহার জিনিষ না হইলে চলে? তা ছাড়া আবার ছুরি আছে, কাঁচি আছে, সূচ আছে। ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ মূল্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সত্য, কিন্তু ব্যবহারোপযোগিতায় লৌহের তুল্য নহে। লৌহ ইতর ভদ্র, ধনী নির্ধন সক-

দের নিকট আদরের সামগ্রী। মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহের যদি আবশ্যকতা স্বীকার করিতে হয়, তবে লৌহশিল্পের আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ইহার উপর আবার আজ কাল কলের মাহাত্ম্য বাড়িয়াছে। চারিদিকে কল কারখানা আরম্ভ হইয়াছে। কাপড়ের কল, কাগজের কল, চটের কল—কোন্ কল লৌহ ব্যতীত নির্ম্মিত হইতে পারে? অথচ কল যে দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে, বাণিজ্য বিস্তারের যে প্রধান সহায় হইয়াছে, এবং দেশের ধনবৃদ্ধির সুন্দর পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছে, যাহার সহজ জ্ঞান আছে, তাঁহাকে অবশ্যই এ কথা মানিতে হইবে। এ দেশে যাহাতে কল চলে, তাহার জন্য আজ কাল অনেকে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন, অনেকে বিলাতে গিয়া কল চালাইবার প্রণালী অধ্যয়ন করিতেছেন, দেশের পক্ষে অবশ্যই ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু দেশে যদি কোন একটা কল চালাইতেই পারা যায়, তাহা আনিতে হইবে বিলাত হইতে। বিলাতের তৈয়ারি কল আমদানি না করিতে পারিলে আর কল চালাইতে পারা যাইবে না। যদি সেই কল দেশে তৈয়ার করিতে পারা যায়? লৌহশিল্প অধ্যয়ন করিয়া আজ যদি কেহ আমাদের দেশে কাপড়ের কল তৈয়ার করিতে পারেন, আমার বোধ হয়, অবশ্যই সে কলের দাম অনেক সস্তা হইবে, এবং তাহা হইলেই অনেকে তাহা কিনিতে পারিবে। কাপড়ের কলের উপকারিতা বুঝিয়াও অনেকে যে এখন তাহা চালাইতে পারিতেছে না, তাহা হইলে তখন আর সে রূপ থাকিবে না। যে কিছু বেশী টাকার মূলধন লইয়া ব্যবসা চালাইতে সঙ্কল্প করিবে, সে অক্লেশে একটা কল চালাইতে পারিবে। এখন কল চালাইব মনে করিলে চালান যায় না। কোথা হইতে কত দাম দিয়া আনিতে হইবে তাহা ভাবিয়াই বুক শুখাইয়া যায়। কল দেশে তৈয়ার হইলে সে ভাবনা থাকিবে না। কল যে দেশে তৈয়ার করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে, তাহার আর একটু মাত্র অন্যথা নাই। সুতরাং লৌহশিল্পের প্রয়োজন আমাদের বড় বাড়িয়াছে।

প্রয়োজন বাড়িয়াছে, তাহার আরও একটি কারণ আছে। ভারতে পূর্ব্বে

রেলওয়ে ছিল না, এখন ভারতের অধিকাংশ স্থানে রেলওয়ে হইয়াছে। ~ নিত্য নূতন লাইন হইতেছে। অবশ্যই ইহাতে অন্তর্বাণিজ্যের বিশেষ উপকার সাধন হইতেছে, অবশ্যই দেশবাসীদিগের ইহাতে বহুতর মঙ্গল হইতেছে, কিন্তু এ সকলের জন্য আমরা ইংরাজের নিকট ঋণী। ইংরাজ আসিয়া ভারতে রেল চালাইল, তাই রেল চলিল; নহিলে বুঝি চলিত না। এতদিন ইহা আমাদের ক্ষমতায় হয় নাই, এখনও হইতে পারে না। হইতে পারে না এই জন্য যে, আমরা রেল প্রস্তুত করিতে জানি না, এঞ্জিন গড়িতে হয় কি করিয়া তাহার কিছুই শিখি নাই; অথচ রেলের উপকারিতা বুঝি। অমুক স্থানে রেলওয়ে খুলিতেছে, যাতায়াতের বড়ই সুবিধা ঘটিবে ভাবিয়া আহ্লাদে আটখানা হই, খুলিবার দিন পর্য্যন্ত অধীর ভাবে প্রত্যা-শাপন্ন হইয়া থাকি। রেলের যদি উপকারিতা এতদূর স্বীকার করি, তবে আপনারা রেল করিতে শিখি না কেন? তাহা শিখি না বলিয়াই তো দুর্দ্দশা। নিতান্ত দুর্গম পথ দেখিতেছি, এখানে রেলওয়ে হইলে লোকের পক্ষে বড় মঙ্গল হয়, অথচ তাহাতে বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় হয়, এ সমস্ত বুঝিয়াও আমরা, হয় গবর্ণমেণ্টের, নয় কোনও কোম্পানির মুখ তাকাইয়া বসিয়া রহিলাম। তাঁহারা যদি কেহ অনুগ্রহ করিলেন, তবেই হইল, নচেৎ আমাদের অরণ্যে রোদন। তারকেশ্বরে একটি লাইন খুলিবার বিষয় কতই শুনিলাম, কত ধূম-ধাম হইল; প্রথম যখন প্রস্তাব হইল আমরা অনুষ্ঠাতাদিগের নাম বাঙ্গালী দেখিয়া আনন্দে গলিয়া গেলাম; কিন্তু সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে কবে? তারকেশ্বরে যিনি রেল খুলিবেন, তিনি যাত্রীদিগের অগণ্য আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন, তাঁহার অর্থোপার্জ্জন ও যথেষ্ট হইবে, তবে আজও রেল হইতেছে না কেন? হইতেছে না, কেবল বাঙ্গালী বলিয়া। একেবারে বিলাত হইতে খণ্ডগুলা এঞ্জিন ও রেল আনা বড় সামান্য কথা নহে। অনেক পয়সার দরকার। বাঙ্গালী এককালে অত পয়সা দিয়া উঠে এমন শকতি তাহার নাই। কিন্তু এ রেল ও এঞ্জিন যদি দেশে তৈয়ার হইত তাহার দাম অবশ্যই অনেক সস্তা হইত, আনিবার জন্য স্বতন্ত্র খরচ লাগিত না, এবং দেশে ঘরে এককালে দাম নগদ না দিয়া রহিয়া বসিয়া দিলে চলিত; সুতরাং হয় হয় করিয়া হইতে এত বিলম্ব পড়িত না। তারকেশ্বরের রেলও

যে হইতেছে না তাহা কেবল এই জন্য। আমরা রেলের উপকারিতা বুঝি, সেই জন্যই বলিতেছি, রেলের জন্য লৌহশিল্পের আরও প্রয়োজন বাড়িয়াছে।

এখন এই প্রয়োজন যাহাতে নিষ্পন্ন হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। প্রয়োজন সাধন করা যে বড় একটা ভারি কাজ, তাহাও নহে। যদি বিবেচকের চক্ষে দেখা যায়, সহজেই প্রতীত হইবে, বিলাতে যখন লৌহশিল্পের এত উৎকর্ষ হইয়াছে, তখন ভারতে তাহাপেক্ষা অধিক উৎকর্ষ হইবার কথা। বিলাতে পরিশ্রমের বেতন বড় বেশী, ভারতে তত নয়। ভারত অপেক্ষা বিলাতে পরিশ্রমের দর ৩॥০ গুণ বেশী। অর্থাৎ এখানে যে কাজটায় ১ টাকা মজুরি পড়িবে, লণ্ডনে তাহা ৩॥০ টাকায় হইবে। বিলাতে একজন যেমন তেমন কারিগরের মাহিনা সপ্তাহে (৫৬ ঘণ্টা) ৩০ কিম্বা ৩২ সিলিঙের কম নহে। আমাদের দেশে এই বেতনে এক মাস হইতে পারে। এদেশে ভাল কারিগরের মাহিনা জোর ১৫ হইতে ২০ অথবা ২৫ টাকা, তা ছাড়া সামান্য মজুরদিগের বেতন বড় জোর আট টাকা। ইহার বেশী নয়। বিলাতে ইহাদের বেতন সপ্তাহে (৫৬ ঘণ্টা) অন্যূন ১৫ সিলিং। সুতরাং বিলাত অপেক্ষা আমাদের দেশে সুবিধা অনেক। তবে এক কথা, প্রথমেই ভাল কারিগর পাওয়া যাইবে না। সত্য বটে, কিন্তু শিখাইয়া পড়াইয়া লইলে যে অচিরে তাহারাই ভাল হইয়া উঠিতে পারিবে না এমন আশঙ্কা করা অন্যায়। এসম্বন্ধে ভারতবাসীদের উপর অনেকটা ভরসা আছে। তাহারা যাহা দেখে, তাহাই শিখে, এ কাজ যে শিখিতে পারিবে না তাহা কে বলিবে? আমরা সেই জন্যই বলিতেছি, যখন লৌহশিল্পের প্রয়োজন এত বাড়িয়াছে, এবং ইহাতে এতাদৃশী উপকারিতা আছে তখন লৌহশিল্পের চর্চ্চা করা অতিশয় কর্ত্তব্য হইয়াছে। আমরা এই লৌহশিল্প শিক্ষা দিবার জন্য একটু বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে বলি।

এই বন্দোবস্তটা আমাদের মধ্যে আপনাআপনি করিলেই ভাল হয়। আমাদের বড় কুস্বভাব, আমরা সকল কাজের জন্য গভর্ণমেণ্টের মুখ চাহিয়া থাকি, নিজের অভাব যাহাতে আমরা নিজে পুরাইতে পারি, তাহাই করা কর্ত্তব্য।

গবর্ণমেণ্ট কোন স্থানে রেল করিলেন না, কোন স্থানে লৌহসেতু নির্ম্মাণ করিয়া গতায়াতের সুবিধা করিয়া দিলেন না, কোনও সহরে জলের কল লইয়া গেলেন না, ইত্যাদি আক্ষেপ আমরা প্রায়ই করিয়া থাকি। এ অপরাধের জন্য আর্টিকেল লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের উপর কতই ঝাল ঝাড়ি। কিন্তু কখনও কি এসকল কার্য্য নিজে সম্পন্ন করিবার জন্য উদ্যোগ দেখাই? গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া আপনারা হস্তপদ গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে কোন কালেও ভাল হইবে না। ইংলণ্ড এবং আমেরিকা গবর্ণমেণ্টের এত মুখাপেক্ষী নহে। এসব কাজ বেশীর ভাগ আপনারাই করে বলিয়া সে সব স্থান আজ কাল উন্নতির চরম সোপানে উঠিয়াছে। ভারত তবে আর কতকাল পিছনেই থাকিবে?

দেশীয় শিল্পের উন্নতি করিবার দিনকাল এখন পড়িয়াছে। বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা আমাদের শিল্পদ্রব্যাদির প্রতি যেরূপ করুণ দৃষ্টি করিতেছেন, তাহাতে আমাদের অনেক ভরসা হইয়াছে। ভরসা হইয়াছে, বোধ হয়, এই বেলা হইতে আপনারা একটু উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে আমাদের পতিত শিল্প আবার উন্নত হইতে পারিবে। প্রেক্টাপ কর্ম্মকারের তৈয়ারি ছুরি কাঁচি সরকারি আপিসে ব্যবহার করিবার জন্য হুকুম হইয়াছে। তবে, এখন হইতে আমরা যদি উঠিয়া পড়িয়া লাগি, আমাদের তৈয়ারি রেল বা এঞ্জিন সরকারি লাইনে ব্যবহৃত হইবার কি হুকুম হইবে না? কিন্তু এমন দিন কি আসিবে, আমরা লৌহশিল্পের আদর করিতে শিখিব?

প্রতীক্ষা।

(একাবলী ছন্দ।)

মনুষ্য জীবনে কতই সয়।
মনুষ্য হইলে হয় কি হয়॥ ২
শোণিত মাটিতে গঠিত দেহ।
ইহারি ভিতর প্রণয় স্নেহ॥ ৩

ইহারি ভিতর কলহ রাগ।
বিচ্ছেদ মিলনে জীবন ভাগ॥ ৬
মাটীর মানুষ—মাটীর দেহ।
সময়ে পলাবে, না রবে কেহ॥ ৮
ইহারি ভিতর সকলি চাই।
কতবা "প্রতীক্ষা" করিব তাই॥ ১০
চাহিতে চাহিতে সময় গেল।
জীবন সাঁঝের আঁধার এল॥ ১২
অমল কমল ঢাকিল মুখ।
হেরিলে বিষাদে বিদরে বুক। ১৪
দিবস যাইলে দিবস হয়।
জীবন ফুরালে নাহিক রয়॥ ১৬
"প্রতীক্ষা" বলহে কতই সয়।
আর তো "প্রতীক্ষা" উচিত নয়॥ ১৮
ত্যজহ বিষাদ বিবাদ রোষ।
ক্ষমহ সুহৃদ! দাসের দোষ॥ ২০
আসিয়া নিকটে বস হে কাছে।
জগতে আমার আর কে আছে॥? ২২
তোমারি কারণ রয়েছে প্রাণ।
তোমারি মনন তোমারি ধ্যান॥২৪
নিঠুর হৃদয় তোমার হ'লে।
যাইব কোথায়, দেও হে বলে॥ ২৬
নিবিড় গহন কানন যথা।
করিব বসতি একাকী তথা॥ ২৮
হারায়ে আমার জীবনধন।
কিসের জীবন পরাণ মন॥? ৩০
লোহের চুম্বক—আমার তুমি।
সুখের শীতল আবাস ভূমি॥ ৩২

তোমাকে হারালে হারাব সব।
এমন জীবন যেমনছে শব ॥ ৩৪
অযুত মানস বেষ্টিত হয়ে।
অতুল সিন্ধব ভিতরে রয়ে ॥ ৩৬
কাঁদু কাক্ তবু লাগিবে ভাই।
ছাড়িয়া তোমায় কা'রে না চাই ॥ ৩৮
তিলেক তোমায় হইলে হারা।
হৃদয় হয় যে পাগল পারা ॥ ৪০
এই যে ছাড়িয়া রয়েছ তুমি।
হয়েছে জীবন শ্মশানভূমি ॥ ৪২
আবার কখন সেখাটি পাব্যো।
নিরখি নগর দেহ জুড়াবো ॥ ? ৪৪
সহে না সহে না সহে না আর।
অসহ্য হয়েছে দেহের ভার ॥ ৪৬
জীবন জ্বলিছে অনল প্রায়।
হারায়ে এমন সুহৃদ হায় ॥ ৪৮
অভিন্ন হৃদয়, দ্বিতীয় নাই।
কথাটি শুনিলে মরম পাই ॥ ৫০
বারেক হাসিটি হাসিলে পরে।
আকাশের চাঁদ পাইহে করে ॥ ৫২
তেমন প্রণয় আর কি পায়।
মনের বাসনা কারে বা কয় ॥ ? ৫৪
কোথায় যাইলে সজরে পাই।
আর যে প্রাণের স্নেহের ভাই ॥ ৫৬
কোমল পরাণে কঠোর ক'রে।
আর না কথাটি বলিব তোরে ॥ ৫৮
প্রতীক্ষা—প্রতীক্ষা—প্রতীক্ষা আর।
সহে না ;—প্রতীক্ষা বলোরে তার ! ! ৬০

প্রেম প্রতিমা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শয়ন গৃহে।

ধীরেন্দ্র তাঁহার শয়ন গৃহে বসিয়া আছেন, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। সম্মুখে এক খানা কি পুস্তক খোলা রহিয়াছে এবং চারি ধারে আরো অনেক পুস্তক ছড়ান রহিয়াছে। পরীক্ষা নিকট হইলেও এখন তাঁহার পাঠে তত মনোযোগ নাই; কারণ মন স্থির নয়, অনেক চেষ্টা করিয়াও পাঠে মন স্থির হইতেছে না, সে কাহার অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতেছে। ধীরেন্দ্র এক এক খানি করিয়া অনেক পুস্তক খুলিলেন, কিন্তু কোন পুস্তকই তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি এক-বার দরজার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে কাহার প্রত্যাশায় চাহিতে লাগিলেন, আবার বিরক্ত হইয়া পুস্তকে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে বাহিরে কোন রূপ শব্দ শুনিবার জন্য ও কান পাতিয়া থাকিতে লাগিলেন। এই রূপে রাত্রি ১১টা অবধি কাটিল, তাহার পর দরজায় কিসের শব্দ হইল, কে যেন ধীরে ধীরে অতি সাবধানে দরজা খুলিয়া গৃহে আসিল, এই রূপে বোধ হইল। সে শব্দ শুনিয়া ধীরেন্দ্রের হৃদয় যুগপৎ কাঁপিয়া উঠিল, তিনি তখন সে ভাব গোপন করিয়া আগন্তুককে তাঁহার পাঠে মনোভিনিবেশ বশতঃ বাহ্যজ্ঞান-শূন্যতা দেখাইবার জন্য এক-বারে ঘাড় হেট করিয়া বসিলেন। একটি ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা গৃহে প্রবেশ করিল। বালিকা ধীরেন্দ্রের স্ত্রী চপলা।

চপলা গৃহে প্রবেশ করিয়া এই অবসরে একবার সতৃষ্ণ নয়নে স্বামীর মুখ খানি দেখিয়া লইলেন, তাহার পর তাঁহার ইতস্ততঃ ছড়ান পুস্তক গুলি গুছাইয়া যথাস্থানে রাখিলেন। পরে ধীরেন্দ্রের হস্তস্থিত পুস্তকের প্রতি ও টান পড়িল. ধীরেন্দ্র তখন বাধ্য হইয়া ঘাড় তুলিলেন এবং চপ-লার প্রতি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন——

"বিরক্ত কর কেন? আমায় পড়িতে দাও।"

লা উত্তর করিল—"এখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, আর আজ তুমি বাড়ি আসিয়াছ, আজ কি বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত পড়া ভাল দেখায়? তোমার

কথা কতদিন শুনি নাই, তোমার সহিত গল্প করিতে আমি বড় ভাল বাসি।"

"সেই জন্য সকল কাজ ছাড়িয়া এত সকাল সকাল আমার কাছে আসিয়াছ।"

"বুঝিয়াছি। তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ। আমি কি করিব, সকলে না শুইলে কি তোমার কাছে আসিতে পারি; আমার লজ্জা করে যে।

"কেন, বড় বৌ কি মেজ বৌয়ের ও এবিষয়ে কোন লজ্জা করেন, আর তুমি কি তাহাদের অপেক্ষা এতই লজ্জাবতী।"

"বড় দিদি মেজ দিদি যে বড় হইয়াছে আর আমি যে তাহাদের চেয়ে অনেক ছোট।"

"ছোট হইলেই কি স্বামীর কাছে রাত্রি ১১ টার পূর্ব্বে আসিতে লজ্জা করিতে হয়।"

"লজ্জা না করিলে লোকে যে নিন্দা করিবে, এততেও জেঠাইমা আর বড় দিদি কত কথা বলেন।"

"আমি জানি ভালবাসা অধিক থাকিলে ঐরূপ লজ্জা এত অধিক থাকে না; তোমাতে সেরূপ ভালবাসার অভাব আছে।"

"তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না। তুমি আমার উপর রাগ করিও না। তোমার ইহাও বিবেচনা করা উচিত, যে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া তবে আমি শুইতে পাই।"

"সংসারে তুমি যে দাসীর ন্যায় আছ, এবং তোমাকেই যে সকল কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা তোমার দেহ দেখিয়াই আমি জানিতেছি এবং সেই জন্যই যে তুমি এত রাত্রে শুইতে আসিয়াছ, তাহাও আমি জানি। আচ্ছা, চপলা, সংসারে ত অনেকেই আছেন তবে তোমাকেই এত পরিশ্রম করিতে হয় কেন?

"আমি না করিলে আর কে করিবে? বড় দিদির শরীর ভাল নয়, তিনি কোন কাজ করেন না, মেজ দিদি ছেলে মেয়ে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, তবু আমার কষ্ট দেখিয়া অনেক সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না, যাহা পারেন করেন, আর জেঠাই মা বুড়া মানুষ, তাঁহার কথা ছাড়িয়া দাও, তবে আমি করিব না তো কে করিবে?"

"চপলা, স্ত্রীলোক পরিশ্রমী হওয়াই উচিত, তুমি যে পরিশ্রমী তাহাতে আমি সন্তুষ্ট আছি, তোমার এই সকল গুণেই আমি মোহিত হইয়াছি। অন্যে তোমায় সুন্দরী বলিয়া স্বীকার না করিলেও আমার চক্ষে আমি তোমায় বড় সুন্দরী দেখি। তবে আমার কষ্টের কারণ এই যে এখনও তুমি বালিকা, এ অবস্থায় তোমায় সেরূপ যত্ন বা আদর করিবার কেহ নাই। আজ যদি আমার মা থাকিতেন——"

চপলা ধীরেন্দ্রের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন——

"আমি আর কাহারও যত্ন চাই না; তোমার আদর ও যত্ন পাইলেই যথেষ্ট হইবে।"

"তোমার এত গুণই বটে।" এই বলিয়া ধীরেন্দ্র পত্নীর মুখচুম্বন করিলেন। চপলা একেবারে আহ্লাদে অধীর হইল। তাহার পর ধীরেন্দ্রকে ধীরে ধীরে বলিল——

"তুমি নাকি পূজার সময় আসিবে না বলিয়াছিলে।"

"পরীক্ষা নিকট বলিয়া ঐরূপ বলিয়াছিলাম কিন্তু—তুমি ডাকিলে কি না আসিয়া থাকিতে পারি।"

বালিকা আর কিছু বলিল না, একবার অতৃপ্ত লোচনে ধীরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একবিন্দু অশ্রু মুছিয়া ধীরেন্দ্র বালিকাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অন্য এক শয়ন গৃহে।

সেই রাত্রে অন্য এক শয়ন গৃহে দুই দম্পতীর অন্য এক প্রকার অভিনয় হইতেছিল। আমরা তাহার বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

আজ শশিকলার শরীর বড় অসুস্থ, এইরূপ অসুখ মধ্যে মধ্যে প্রায়ই হইয়া থাকে। মহেন্দ্র অনেক চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই রোগের উপশম করিতে পারে নাই, এমনকি, কি রোগ এ পর্য্যন্ত তাহা স্থির হয় নাই। আমরা জানি শশিকলার শরীরে কোন রোগই নাই, এ রোগ তাহার মনে। শশিকলা কাহার ভাল দেখিতে পারিত

না; তাহার হাসিমুখ দেখিলে শশিকলার প্রাণে বড় আঘাত লাগিত; তিনি আপনার হিংসানলে আপনি পুড়িতেন। ইহা ব্যতীত শশিকলা অনেক সময় অনেক প্রকার অত্যাচার করিত; শশিকলার কোপানলে পড়িতে হইবে বলিয়া কেহ তাহাকে কোন কথা বলিতে সাহসী হইত না। মহেন্দ্র স্ত্রীকে বড় ভয় করিত, তাহার স্বভাব মন্দ জানিয়াও ভয়ে কোন কথা বলিতে পারিত না। কোন সময়ে কোন কথা বলিলে শশিকলা রাগে ও অভিমানে একেবারে অধীর হইত এবং তাহার অত্যাচারেরও বৃদ্ধি হইত। আজ শশিকলার শরীর অসুখ, কারণ আজ প্রিয়ম্বদার ও চপলার হাসি মুখ দেখিয়াছে। রোগ বৃদ্ধি হইবার ভয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়াছে। মহেন্দ্র রাত্রি নয়টার সময় শয়ন গৃহে গিয়া দেখিলেন যে আজ রোগের সহিত আরো কিছু মিশ্রিত আছে—সেটুকু অভিমান। তাহার লক্ষণ এই যে এখন কিছুই শীত না থাকিলেও শশিকলা পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত লেপ ঢাকিয়া শুইয়া আছে। শশিকলার অভিমান হইলেই সে আগা গোড়া লেপ ঢাকিয়া শয়ন করিত। মহেন্দ্র মানের লক্ষণ দেখিলেন বটে, কিন্তু কারণ কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া তিনি মান ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু নানা প্রকার সাধ্যসাধনাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। শেষে মহেন্দ্রও বড় বিরক্ত হইয়া গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন, সেই সময় শশি-কলা রাগে কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চকণ্ঠে বলিল——

"তুমি যাবে, চলিয়া যাও; আমায় একগাছা দড়ি দিয়া যাও আমি আজ গলায় দড়ি দিয়া মরিব।"

মহেন্দ্র তখন কিছু আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন——

"কি হইয়াছে, তাই আগে বল না।"

"আমার কি হইয়াছে সে কথা তোমার শুনিয়া আবশ্যক কি? আমার জন্যে ভাবিয়া ভাবিয়াত তোমার ঘুম হয় না।"

"কেন, তুমি যখন যাহা বল, আমি তখনই তাহাই করি; তোমার জন্য আমার কত অন্যায় কর্ম্ম করিতে হইয়াছে। এত করিয়াও তোমার মন পাইলাম না?"

"আমার কথা যদি শুনিতে, তাহাহইলে আর তোমার এমন দশা হইত না। আর তোমার হাতে পড়িয়াইত আমার এত কষ্ট। যখন জন্মিয়াছিলাম, মা যদি আমায় নুন্ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে আর আমার এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না।"

এই বলিয়া শশিকলা অনেক কষ্টে ২।৪ ফোটা চক্ষের জল ফেলিল। শশিকলার চক্ষে জল দেখিয়া মহেন্দ্রের বড় কষ্ট হইল, বিনীত ভাবে বলিলেন—

"শশি, তুমি কাঁদিও না ; আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি এখন হইতে তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব ; কখন তোমার কথার অবাধ্য হইব না। এখন আমার কি করিতে হইবে বল।"

"কেন তোমার কি চক্ষু নাই? চক্ষের সম্মুখে রাত্রি দিন দেখিতেছ সংসারের মধ্যে তোমার খরচ কি আর তোমার ভেয়ের খরচ কি। তাহার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ের খরচ যে কত টাকা হয়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? এই দেখ, ছেলে ও মেয়ের দুধের খরচ, তাহাদের পোষাকের খরচ, আবার সময়ে সময়ে ডাক্তারেরও খরচ আছে। আবার দেখ, ২।১ মাসের মধ্যেই ছেলের ভাত দিতে হইবে তাহাতে কত টাকা খরচ হইবে, তাহার পর মেয়ের বিবাহ আছে, ছেলের পৈতে আছে,—আর আমি কত বলিব। ইহা নিশ্চয় জানিও, যে সকল টাকা খরচ হইবে, তাহার আট আনা তোমার, আর আট আনা তোমার ভেয়ের। আর যদি বল, সে চাকুরি করে ; তেমন তুমি বিষয় রক্ষা করিতেছ ; ইহাও এক টা কাজ। এইরূপে যে তোমারি টাকা নষ্ট হইতে চলিল, তাহার কি উপায় করিয়াছ বল।"

"ইহার আবার উপায় করিব কি? আমারও যদি সন্তান সন্ততি হইত, আমারও তাহা হইলে এই সকল খরচ হইত। আর উহারা কেহ অপর নহে ভাইপো কি ভাইঝিতে আর ছেলে মেয়েতে প্রভেদ কি? তোমার এই সকল বিষয়ে হিংসা করা অন্যায়।"

"কি! আমি তোমার ভালর জন্য মরি, আর তুমি আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিবে! এই তুমি আমার সকল কথা শুন। আমি আর এ সংসারে থাকিব না ; ঘরে আগুণ লাগাইয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইব।"

এই বলিয়া শশিকলা বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল ; রাগে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল মহেন্দ্র তাহাকে ধরিতে গিয়া একরকম প্রহার খাইল। কিন্তু তত্রাচ ছাড়িল না। শশিকলা সেস্থান হইতে যাইতে না পারিয়া রাগে কাঁপিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে কিছু রাগ থামিলে মহেন্দ্র কথা কহিতে সাহস পাইল। কাতর ভাবে বলিল——

"আমার অপরাধ হইয়াছে, আর আমি তোমায় কোন কথা বলিব না। কিন্তু তুমি যে সকল বিষয় বলিলে তাহার কি উপায় করিতে হইবে, তাহাতো আমি কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।"

শশিকলা তখন ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল——

"আমি কি তাহার উপায় না করিয়া তোমায় এত কথা বলিলাম? তুমি কেন আমার গহনা গড়াইয়া দাও না। আমার নামে কোম্পানির কাগজ কিনে রাখ না।"

"বাবা শুনিলে কি বলিবেন?"

"কেন তুমি যে আমার গহনা দিতেছ তাহা বলিব কেন? বলিব যে আমার মা গহনা গড়াইয়া দিয়াছে। আর আমার মা বাপত আর ছোট বউয়ের মা বাপের মত গরিব নয়, যে সে কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। আর আমার নামে কোম্পানির কাগজ কিনিলে তাহা কে জানিতে পারিবে?"

অগত্যা মহেন্দ্র তাহাতে স্বীকার করিলেন। এইরূপে সেদিনকার রজনী মহেন্দ্র নিস্তার পাইলেন। অবশিষ্ট যে রাত্রি টুকু ছিল ; মহেন্দ্রের আর নিদ্রা হইল না, কেবল বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নানা কথা।

অতি প্রত্যুষেই মহেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন ; সমস্ত রাত্রের কষ্টে তাঁহার শরীর বড় অসুস্থ ছিল, কিন্তু বাড়িতে পূজা, আজ ষষ্ঠী, সুতরাং নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না ; আর বিশেষত মহেন্দ্র বাড়িতে থাকিতেন, সুতরাং এসকল বিষয় তাঁহারই উপর নির্ভর ছিল। উপেন্দ্র ও বীরেন্দ্র ও

প্রাতে উঠিয়া আবশ্যকীয় কাজ কর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন। শশিকলা বেলা নয়টা পর্য্যন্ত নিদ্রা দিল, তাহার পর একজন বিশ্বাসী চাকরাণীর দ্বারা বাড়িতে মহেন্দ্রকে বলিয়া পাঠাইল, যে কাল রাত্রে যে কথা হইয়া গিয়াছে, এখন তাহা কার্য্যে পরিণত করা হউক। শশিকলার এক জড়া সোণার চন্দ্রহারের আবশ্যক ছিল, সে চন্দ্রহার অন্ততঃ বিজয়ার দিন পরিয়া যাহাতে প্রতিমা বরণ করিতে পারেন, তাহা করিবার জন্য মহেন্দ্রের উপর ভার হইল। মহেন্দ্র হুকুম পাইয়া তাহা অমান্য করিতে সাহসী হইলনা, সুতরাং তাঁহাকে এই কাজের সময় চন্দ্রহারের চেষ্টায় ছুটিতে হইল।

প্রিয়ম্বদা প্রাতে উঠিয়া যোগেশ্বর ও বাগদিদের বাড়ি গেল এবং তাহাদের এই পূজার সময় যে নূতন কাপড় হইবে, সেই সংবাদ দিয়া আসিল। বাড়িতে ফিরিয়া আসিবার সময় সেই পাড়ায় যে সকল অনাথ স্ত্রীলোক ছিল, সেই দিক্‌ দিয়া আসিল; এবং তাহাদিগকে একবার উপেন্দ্রের সহিত দেখা করিতে বলিল, কোন্‌ সময় তাহার সহিত দেখা করিলে সুবিধা হইবে তাহা বলিয়া দিল। প্রিয়ম্বদা জানিত যে উপেন্দ্রের সহিত দেখা হইলে অবশ্যই তাহারা কিছু পাইবে, তাহাতে তাহাদের বিশেষ উপকার হইবে।

চপলাও প্রাতে উঠিয়া সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইল। চপলা বালিকা হইলেও সাংসারিক সকল কার্য্য জানিত, এবং গৃহিণীর মন রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত। দরিদ্রের কন্যা বলিয়া অতি শৈশবাবস্থাতেই চপলা গৃহকর্ম্ম শিখিয়াছিল। চপলা লেখা পড়া কিছুই জানিত না; এবং শিখিবারও যত্ন ছিল না। ধীরেন্দ্র মধ্যে মধ্যে চপলাকে লেখা পড়া শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু শেষে বিরক্ত হইয়া ছাড়িয়া দিলেন। চপলা সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা না হইলেও চপলার অনেক গুণ ছিল, এত অল্পবয়সে সে সকল গুণ অসাধারণ। চপলা প্রাণ ভরিয়া স্বামীকে ভাল বাসিতে জানিত, সে গুরুজনদের যথাযথ মধ্যে যথাযোগ্য স্থানে ভক্তি, স্নেহ করিত। দুঃখের অবস্থায় কষ্টের শেষ নাই, সুখের অবস্থায় আনন্দের উচ্ছ্বাস নাই, চপলার জীবনস্রোত যেন একটী স্রোতঃস্বতী; জোয়ার কিম্বা ভাঁটা নাই, প্রবল ঝড়ে উত্তাল তরঙ্গ উঠিবার সম্ভাবনা নাই। চপলার জীবনপুস্তকে সন্তোষই একটি প্রধান অধ্যায়। চপলা এই বয়সেই সকল প্রকার রন্ধনকার্য্যে সুনিপুণ।

আমরা সকলের এক প্রকার পরিচয় দিয়াছি, কিন্তু এবাড়ির কর্ত্তা ও গৃহিণীর পরিচয় এখনও দিই নাই। কর্ত্তার দেবদেবীর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি আছে, প্রায়ই গঙ্গাস্নান করা হয়; সন্ধ্যা আহ্নিক নিত্যকর্ম্মের কিছুই ব্যতি-ক্রম হয় না। মধ্যে মধ্যে পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজনও হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি একজন অর্থপিশাচ, অর্থের জন্য সকল প্রকার দুষ্কৃতি করিতে প্রস্তুত। তাঁহার আর একটি অপবাদ আছে, বাড়িতে এক জন অল্পবয়স্কা বিধবা গয়লানী দুধ দিয়া যাইত কর্ত্তাটি তাহাকে নির্জ্জনে পাইলে উভয়ে এক ভাবের মৃদু হাসি হাসিত; আর গোপনে কি পরা-মর্শও হইত। এই বুড়া বয়সে তাঁহার একজন অল্পবয়স্কা বিধবার সহিত এরূপ হাসি অনেকের চক্ষে ভাল লাগিত না, সেই জন্য তাঁহার একটা ক্রমে অপবাদ উঠিয়াছিল; কিন্তু সে সকল কথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারিত না। এই বিধবা গয়লানী তাঁহার সম্পর্কে বিরুদ্ধ ছিল না; কর্ত্তা তাহাকে আদর করিয়া নাতুনি বলিয়া ডাকিতেন।

গৃহিণী দোষে গুণে মিশ্রিত। অর্থসম্বন্ধে যদিও সে রূপ মুক্তহস্তা ছিলেন না, কিন্তু লোককে খাওয়াইতে বড় ভাল বাসিতেন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামীর অনুগমন করিতেন। কিন্তু তিনি বড় কলহপ্রিয় ছিলেন, সামান্য কারণে কলহ করিতে ভাল বাসিতেন, এবং রাগে অধীর হইয়া মুখে যাহা আসিত, তখন তাহাই বলিতেন। স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁহার স্বভাব চরিত্র বড় মন্দ ছিল না। কর্ত্তার আর এক দোষ ছিল—বড় পক্ষপাতী; তিনি আপনার দুই পুত্র ও পুত্রবধূকে সমান স্নেহ করিতেন না; পুত্রদিগের মধ্যে তাঁহার ইতরবিশেষ ছিল; জ্যেষ্ঠপুত্র মহেন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রী শশিকলাকে যে রূপ ভাল বাসিতেন। কনিষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্র এবং তাঁহার স্ত্রী প্রিয়ম্বদাকে সে রূপ ভাল বাসিতেন না।

আমরা আর কিছু না পাইয়া এইরূপ নানা কথায় এই ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ লিখিলাম।

দধীচির অস্থি।

(আরম্ভ)

পশ্চিমে মার্ত্তণ্ড পড়িয়াছে ঢ'লে,
হাসিমাখা মুখ ঋষি বেদীমূলে,
শিষ্যবৃন্দ পাশে বসি কুতূহলে,
শুনিবে ভারতী—হৃদয়ে আশা।
জীবদেহ মাঝে দয়ার সঞ্চার
হইলা কি রূপে, কি গুণ তাহার,
আত্ম হ'তে পর কত শ্রেষ্ঠতর,
কহিছেন ঋষি—মধুর ভাষা।

(শাখা)

ওই ভাঙা বীণা তুলি লয়ে করে,
গা দেখি কল্পনে প্রতি তারে তারে,
কি কহিলা মুনি—কি করিলা পরে,
গা' দেখি কল্পনে মধুর স্বরে।

(কোরস্)

ভারত আজি রে স্বার্থের দাসী,
আতিথ বুঝে না ভারত বাসী,
জানে না ভ্রাতৃত্বে কত যা সুখ।
ভায়েতে দেখে না ভায়ের মুখ,
জাতির সহিত জাতির বাদ,
পিতাকে মারিতে পুত্রের সাধ,
পর কোন্ ছার? পরের তরে
কিসের লাগিয়া মরিবে পরে?
ভারত আজি রে হৃদয়-হীন,

কেন তবে আর সে কথা প্রাচীন?
মরু মাঝে কেন জলের ধারা?
(আরম্ভ)
সৃষ্টির উৎসবে হায়রে যেমতি
দেবী পদ্মাসনা শুনান ভারতী
শুনাইছে মুনি (প্রশান্ত মূরতি)
শুনিছে সকলে তত্ত্বের কথা।
কিরূপে কলহ জীব-দুঃখ-মূল
আইলা অবনী, প্রতাপে অতুল
ভুলাইলা নরে, ভুলি নরকুল
আপনা আপনি পাইল ব্যথা।
(শাখা)
স্বার্থ কি মহান্ বিষময় ফল,
ঈর্ষা দ্বেষ আদি কি কূট গরল,
ভয়ঙ্করী হত্যা ধরিয়া কি বল
নরক আনিল অবনীতল।
(কোরস)
কবে রে বুঝিবে মানব সবে
কি কাজে নিরত তারা এ ভবে,
কবে সে বুঝিতে হইবে পটু
এ ভব সংসারে লোভ কি কটু,
কি কটু স্বার্থের মোহন ভাব
সময়ে আত্মার পশুত্বলাভ,
কবে নরকুল (অবনীরত্ন)
পর উপকারে করিবে যত্ন,
স্বার্থ পরিহরি সেবিবে দয়া,
পরের মঙ্গলে ত্যজিবে কায়া,
ঘুচাবে এহেন ভ্রান্তির ভার

জড়াবে ব্রাহ্মণের বিমল ধার ?
হৃষীকেশ প্রভো ! সুদিন দাও,
আজ নবকুলে বারেক চাও
বারেক তাদিগে রাখগো পায়।

(আরম্ভ)

কাতরে করুণা যাচি তপোধন
মনে মনে স্মরি দেব নারায়ণ,
বসিলা নীরবে, নীরবে নয়ন
তিতিল সলিলে অশ্রু-স্রোতে।
গদগদচিত্ত শিষ্যবৃন্দ পাশে
শুনি সে কাহিনী অশ্রুজলে ভাসে,
এক বিন্দু তার এ জীব আবাসে
পাপীর সম্বল স্বর্গের পথে।

(গাথা)

অমর-ঈশ্বর মুগ্ধ এই ভাবে
অলক্ষ্যে অদৃশ্যে আছিলা নীরবে
পূর্ণজ্যোতিঃ কান্তি প্রকাশিল তবে,
প্রভাতে অরুণ উদিল যবে।

(কোরস)

প্রভাতে অরুণ আকাশ-গায়
কুহেলি ভেদিয়া কিরণ চায়,
যেমতি বিষাদ কালিমা মাখা,
জ্যোতিশ্বর কান্তি মলিন ঢাকা,
নীরদবাহন মোহন বেশ,
হাতে বজ্রধর শোভার শেষ,
জ্বলিছে উজ্জ্বল সহস্র আঁখি
ধীরে ধীরে বজ্র পৃষ্ঠ'পরে রাখি
দধীচি সকাশে দিলেন দেখা।

(আরম্ভ)

সম্ভ্রমে সশিষ্য উঠি তপোধন,
দাঁড়াইলা আগে, সম্ভাষি তখন
যোগাইলা চর্ম্ম—পবিত্র আসন
অতিথিরে তবে জিজ্ঞাসে ভাষা।
"কিহেতু এতই চিন্তায় আতুর
কিহেতু বা সেই ছাড়ি নিজপুর
এহেন মর্ত্তের আশ্রমে সুদূর
অকিঞ্চন পাশে কি লাগি আসা?"

(শাখা)

শুনিয়া ঋষির সুমধুর বাণী,
স্বীয় প্রয়োজন মনে মনে জানি'
হুতাশে আকুল—পুরন্দর রাণী—
কেমনে ফুটিবে? কাঁদে যে প্রাণী।

(কোরস)

কে আছেরে হেন অমরনগরে
আপনা রাখিতে চাহিবে পরে
প্রাণ ভিক্ষাদান—না পেয়ে ব্যথা?
হেন নিদারুণ কে আছে কোথা?
কেবা আছে কার কাঁদে না প্রাণী
বলিতে এহেন নিঠুর বাণী?
কে হেন হৃদয়ে দিয়াছে বলি
অম্লান রহিবে এ কথা বলি?
পশুদেরো আছে দয়ার জ্ঞান,
কাঁদে সে কথায় তাদেরো প্রাণ
তবে আখণ্ডল কেমনে বলে?

(আরম্ভ)

চরিখা উদ্রের নিস্তব্ধ মুরতি,

হেরিয়া তাহার হৃদয়ের গতি,
ভাবিলা ক্ষণেক ঋষি মহামতি,
ভাবিলা তখন বসিয়া ধ্যানে।
অতিথির বাঞ্ছা জানিয়া অন্তরে
প্রেমে পুলকিত, গদগদ স্বরে
কহিলা মহর্ষি ডাকি পুরন্দরে।
আরো তত্ত্ব দেব শুনি তা কাণে।
(গাথা)
শুনিলা—"সার্থক জীবন আমার!
এ ভাগ্য অতীত মম কল্পনার!
সার্থক এ জীর্ণ পঞ্জরাস্থি ছার,
পারিবে সাধিতে অমরোদ্ধার।"
(কোরস)
সকলি এ ভবে ভোজের বাজি
না থাকিবে কাল যা আছে আজি,
এ দেহ কেবল মাটির ভার,
মাটিতে মিশাবে দুদিন পর,
কেন তবে আর দেহের গরিমা?
কেন তবে ভুল দয়ার মহিমা?
মাটির নির্ম্মিত শরীর দানে
পর উপকার সাধ প্রাণ পণে,
মাটীর ভজনে কি সুখ পাবে?
দয়া কর জীবে—সুযশ গাবে
গাবে রে সুযশ জগতময়।
(আবজু)
গায়ত্রী গম্ভীরে উচ্চারি সঘনে,
প্রেমে সিক্ত তনু দয়া প্রস্রবণে,
ধীরে ধীরে ঋষি আইলা অজ্ঞানে,

বসিলা নীরবে বৃক্ষের তলে।"
শব্দ মাত্র নাই, নিস্তব্ধ কানন,
হেরি ঋষি-কৃতি স্তম্ভিত পবন,
নিকটে দাঁড়ায়ে মূকের মতন
শিষ্যেরা ভাসিছে অশ্রুর জলে।

(গাথা)

শিষ্যবৃন্দে তবে সুধীরে সম্ভাষি,
কহিলেন মুনি মৃদু হাসি হাসি,
(তাঁর কাছে কোথা জ্যোছনার রাশি ?)
কহিলেন মুনি তেমতি বসি।

(কোরস)

"হে বৎস মণ্ডলি ! মুছ অশ্রুনীর,
কেন কর খেদ ? তোমরা সুধীর,
সোত ধারা সম দিনের শরীর
কিছুই রবেনা—পাইবে লয়,
পরহিতে তবে নশ্বর দেহ
ত্যজিতে কাতর হ'য়ো না কেহ।
প্রাণী মাঝে—হৌক ছোট কি বড়—
পরহিত নিত্য সাধিতে দড়
তেমতি আবার অহিত নিত্য
সাধিতে সক্ষম নরের চিত্ত,
অহিত সাধনে নরক ফলে
হিত ব্রতে স্বর্গ অবনীতলে।
কবে এ কথা কবে. না জানি,
বুঝিবে ভবের অবোধ প্রাণী !
হে বৎস মণ্ডলি ! ত্যজ বৃথা শোক,
দধীচির ভাগ্যে দুর্লভ এ যোগ
এহেন সময়ে ক্ষোভ না সাজে।"

(আরম্ভ)

শিবা বুকে দিয়ে গাঢ় আলিঙ্গন,
হাসি হাসি চাহি সহস্র-লোচন,
উল্লাস-সরিতে ভরিল নয়ন
  পুলকে রোমাঞ্চ হইল দেহ।
জ্বলিল চৌদিকে অগুরু গুগ্‌গুল,
বিকাশিল মুখে সৌন্দর্য্য অতুল,
কণ্ঠে হরিনাম মৃদুল মৃদুল
  নয়নে ক্ষরিল দয়ার স্নেহ।

(শাখা)

হেরিয়া বাসব রোমাঞ্চিত কায়,
শিবাবৃন্দ শোকে করে হায় হায়,
তবু কবি উচ্চে বেদগান গায়,
  মুদিলা তবে সে নয়নদ্বয়।

(কোরস্)

মুদিল দধীচির নয়নদ্বয়
কাননে কি যেন লাগিল ভয়,
অকস্মাৎ শোকে অচল বায়,
ভানুরশ্মি আর দেখা না যায়,
স্তম্ভিত বিহগ বিটপীশাখে,
সকলপ্রকৃতি আকুল শোকে,
ছুটিল সৌরভ অরণ্য ভরি,
স্নিগ্ধ নভস্থল বিতরে বারি,
কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গের শোভা
ধরায় মুহূর্ত্ত খেলিল আভা
  ধন্যরে পৃথিবী ধন্য সে দিন।

(আরম্ভ)

দেখিতে দেখিতে নয়ন নিশ্চল,

নাসায় নিশ্বাস হইল অচল,
ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি'—বিস্তার উজল—
ব্রহ্মতেজ শূন্যে মিশা'ল ক্ষণে।
দশ দিক্ যুড়ি' বাজিল গম্ভীরে,
পাঞ্চজন্য শঙ্খ ঘোর তান পূরে,
সেদৃশ্য হেরিয়া থাকিয়া অম্বরে
বরষিল পুষ্প অমরগণে।
(শাখা)
বাজিল দুন্দুভি রে দধীচিমরণে
হরিশঙ্খ যারে, তুইলো কল্পনে,
দিয়া দিয়া তারে—অস্থীর অধমে
নারিবি বাজাতে এ ভাঙা বীণে ?
(কোরস.)
কি কাজ আর সে বাজাইয়ে বীণে,
নীরবে নির্ব্বাকে থাক লো কল্পনে!
ভারত আজিরে স্বার্থের দাসী,
জাতিত্ব বুঝেনা ভারতবাসী,
জানেনা ভ্রাতৃত্বে কতবা সুখ,
ভায়েতে দেখে না ভায়ের মুখ।
জাতির সহিত জাতির বাদ,
পিতাকে মারিতে পুত্রের সাধ,
পর কোন ছার ? পরের তরে
কিসের লাগিয়া মরিবে পরে ?
ভারত আজিরে হৃদয়হীন,
কেন তবে আর সে কথা প্রাচীন,
মরু মাঝে কেন জলের ধারা ?
(আরম্ভ)
লো কল্পনে! বটে মরুর সমান,

এ ভারতভূমি হেরি বিদ্যমান ;
মরু বটে, ইথে নাহি কোন আন,
দয়া মায়া স্নেহ মমতা-হীন।
তাই বলে কিরে প্রবাহ ব'বে না,
একটি কুসুম কভু ফুটিবে না,
সে সুগন্ধ কভু আর ছুটিবে না,
মরুই রহিবে চিরটি দিন !
(শাখা)
গা' তবে কন্নলে ! দধীচির গান,
ছুটুক ধরায় দয়ার উজান,
বুঝুক কি শ্রেষ্ঠ পরহিত-জ্ঞান,
তার কাছে কিবা আপন প্রাণ।
(কোরস্)
গো কন্নলে ! তুই বাজা তোর বীণ,
কবে রে আমার আসিবে সে দিন,
কবেরে বুঝিবে মানব সবে
কি কাজে নিরত তারা এ ভবে,
কবে সে বুঝিতে হইবে পটু
এ ভব সংসারে লোভ কি কটু,
কি কটু স্বার্থের মোহন ভাব,
সমরে আত্মার পতন-লাভ,
কবে নরকুল—অবনীরত্ন
পর উপকারে করিবে যত্ন ?
স্বার্থ পরিহরি সেবিবে দয়া
পরের মঙ্গলে ত্যজিবে কায়া,
ঘুচা'বে এহেন ভ্রান্তির ভার
ছড়াবে ভ্রাতৃত্বের বিমল ধার ?
হৃষীকেশ, ওগো ! সুদিন দাও,

ভ্রান্ত নরকুলে বারেক চাও,
বারেক অধমে রাখ গো পায়।

সুরাপান সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

খৃষ্টানদিগের কথা যদি মিথ্যা না হয়, তাহা হইলে বাস্তবিক আমাদের এ জীবন সুখের নয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আদম (Adam) আমাদের জন্য এত দুঃখের ভার রাখিয়া গিয়াছেন যে, হার্কিউলিস (Hercules) ও তাহা বহন করিতে সক্ষম নন। সেই যে সৃষ্টির আদি দিনে দুইটি নরনারী কুক্ষণে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিল, তাহার জন্য আজও জীবরাজ্য দুঃখের তীব্র দহনে অহরহঃ পুড়িতেছে। যে ধরা সৃষ্টির ললামভূত বলিয়া কল্পিত হইয়াছিল, মানুষের কুবুদ্ধির জন্য তাহা দুঃখের ও কষ্টের নিলয়ভূমি হইয়া পড়িল। আদম ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিলে বুঝি এ প্রকার ঘটনা হইত না। বুঝি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে পারিলে এখনও এ দুঃখের স্রোতঃ ফিরান যাইতে পারে, আবার এ নরকময় পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্য করিয়া তুলিতে বড় অধিক বিলম্ব লাগে না। মানুষ তবে কেন আপনা বুঝে না? কেন ঈশ্বরকে বুঝিতে চায় না? না বুঝিয়া না শুনিয়া কেন সুখের রাজ্যে দুঃখ আনিয়া উপস্থিত করে? যে নিয়ম লঙ্ঘনে দুঃখ ভিন্ন অন্য ফল নাই, এবং কি ধনীর প্রাসাদে, কি নির্ধনের পর্ণকুটীরে, কি হিন্দুর মঠে, কি মুসলমানের মস্‌জিদে কোথায়ও যখন সে বিধানের অব্যাপ্তি নাই; তবে কেন মানুষ মোহে ভুলিয়া আপনি মজে, পরকে মজায়, ক্ষণিক সুখের বিনিময়ে চিরদিনের জন্য দুঃখের ভরা মাথায় তুলে? ঈশ্বর আমাদিগকে যে প্রকার প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা যদি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, স্পষ্ট প্রতীত হইবে, যাহাতে আমরা সর্ব্বতোভাবে সুখী হই, তাহাই তাঁহার সমুদয় নিয়মের উদ্দেশ্য। আমরা যাহাতে অসুখে থাকি, অথবা আমাদের যাহাতে অনিষ্ট ঘটে ইহা তাঁহার কোনও নিয়মাংশের উদ্দেশ্য

নহে। তবে আমরা কেন সে নিয়ম পালন না করিব? যে নিয়ম পালনে সুখ, লঙ্ঘনে দুঃখ, ইচ্ছা করিয়া কে সে নিয়ম লঙ্ঘন করিবে? কিন্তু কেমন মোহ, কেমন বুদ্ধির ভ্রম, মানুষ ইহা বুঝিয়াও সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হয়। অন্যান্য নিয়ম লঙ্ঘনের কথা আজ আর বলিতেছি না, সুরাপান সম্বন্ধে আজ কিছু বলিতেছি। সুরাপান করিলে যে অশেষ কুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিদিগকে নিজের অধীন করিয়া ফেলে, এবং মানবমনে মালিন্যের কালিমা ছায়া পাড়িয়া দেয়, অধিক কি মানুষকে পশুর ন্যায় করিয়া ফেলে ইহা বোধ হয় আর বিস্তৃতরূপে জানাইতে হইবে না। সুতরাং সুরাপান ঈশ্বরের নিয়ম-নিষিদ্ধ এবং মনুষ্য মাত্রেরই অবশ্য-বর্জ্জনীয়।

"মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যঞ্চ"—ইহা শাস্ত্রের কথা। আমি বলিতেছি না। যিনি এ কথা বলিয়াছেন, তিনি মদের প্রতিফল বুঝিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন সুরাপান করিলে মানুষের শেষে কি অবস্থা উপস্থিত হয়। তাই মদের সম্বন্ধে এই কঠোর ব্যবস্থা লিখিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, শাস্ত্রের সে শাসন আর নাই। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, মদ পেয়, দেয় এবং গ্রাহ্য। কিন্তু কেন এমন হইল? শাস্ত্রের সে ব্যবস্থা "বৃটিশ শাসিত ভারত ভিতরে" কেমন করিয়া পরিবর্ত্তিত হইল? এ কথা কে বুঝাইয়া দিবে, লোকে মদের কি গুণ দেখিয়া শাস্ত্রের কথা অমান্য করিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া রক্তকমলকান্তি মদের গ্লাস অধরোষ্ঠ মধ্যে স্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইল? বেশী কথা বুঝি না, বেশী কথা বুঝিতেও চাহি না, সহজ কথায় জিজ্ঞাসা করি, সুরাপানের কোন্ খানে সুখ? খাইবার সময়, না খাইয়া নেশা হইলে, অথবা নেশা ছুটিলে? এই তিন অবস্থার মধ্যে সুখের পর্য্যায় কোন্টা? জানি, অনেক লোভী আছে, যাহারা ডাক্তারের ব্যবস্থা না মানিয়া পরিশেষে যে রোগোৎপত্তি হইবে তাহা না শুনিয়াও অস্বাস্থ্যকর অথচ মুখপ্রিয় দ্রব্যাদি ভোজন করে। লোকে পিষ্টক আহার করে, তাহা আহার করিলে যে রোগ হইবার সম্ভাবনা তাহা সে জানে, তথাপিও যে জানিয়া শুনিয়া সে তাহা খায়—কেন? সে কেবল খাইতে ভাল লাগে বলিয়া। মদ কি তবে ভাল লাগে বলিয়া

লোকে খায়? মদে পরিণামে অনেক অনিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা খাইতে কি এতই মিষ্ট? জানি না, কিন্তু তাহাই যদি হইবে, তবে লোকে গলাধঃকরণ করিবার সময় মুখ এত বিকৃত করে কেন? যেন গলা জ্বলিয়া গেল, জিহ্বা খসিয়া পড়িল—এমন ভাব উপস্থিত হয় কেন? মদ খাইতেতো সুখের নহে। তবে কি নেশায় সুখ? তাই বা কেমনে বলিব? নেশার সময় তো জ্ঞান বুদ্ধি কিছুই থাকে না। পুরীষ-সঙ্কুল পয়ঃপ্রণালী মধ্যে পড়িয়া থাকিতে বিকার জন্মে না। মূষিকশিশু আহারীয় মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। এসব কি সুখের অবস্থা? আর ঐ যে হতভাগ্য নেশার বশে টলিতে টলিতে রাস্তার পাথরের উপর পড়িয়া গিয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিয়াছে, কপালে নাসিকায় হস্তে রক্তের ধারা বহিতেছে, আর পাহারাওয়ালারা ঝোলায় চড়াইয়া মারিতে মারিতে লইয়া যাইতেছে, উহাকি সুখের নিশানা? যদি খাইবার সময় সুখের নহে, নেশার অবস্থায় সুখের নহে, তবে কি নেশা ছুটিলে যত সুখ আসিয়া মনের মধ্যে লহরী লীলা খেলাইতে থাকে? নেশার পর সুখ! সেই তো দুঃখের সময়। নেশার সময় যে ক্ষতমুখে জ্বালা বোধ হয় নাই, নেশার অন্তে তাহাতে তীব্র জ্বালা জন্মিতে থাকে, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে, মনের ভিতর আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, আর যাহার হৃদয়ে একটি মাত্রও মানুষিক বৃত্তি আছে, সে লোকলজ্জা ভয়ে, সমাজের কলঙ্কের ভয়ে মুখ দেখাইতে পারে না। তবে সুখ কখন? সুখ যদি ইহার কোনও অবস্থায়ই নাই, তবে মানুষ কেন ইহা কড়ি দিয়া কিনিয়া পান করে? কেন আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারে?

বড় কৌতুকের কথা, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "সুরা সেবন যদি দোষ বলিয়া বর্জ্জব্য হইল, তবে ঈশ্বর সুরার সৃষ্টি করিলেন কেন? তাঁহার সৃষ্ট বস্তু-মধ্যে একটীও অকারণে সৃজিত হয় নাই, সকলই কোন না কোন কার্য্যে প্রয়োজিত হইয়া থাকে, তবে মদ এত দূষ্য কেন?" ইহার প্রত্যুত্তরে একজন জর্ম্মানলেখক বলেন, পরমেশ্বর যে আমাদের জন্য মদের সৃজন করিয়াছেন তাহার প্রমাণ কি? আমরা ত যেখানে সেখানে দেখিতে পাই, তিনি আমাদের পানার্থ নির্ম্মল, পরিষ্কার, স্ফটিক, কাকচক্ষুনিভ জলেরই সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তজ্জন্য যে তিনি সুরার সৃজন করিয়াছেন ইহাত কুত্রাপি

দৃষ্ট হয় না।” পুনরপি ঐ মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ স্বমত বজায় রাখিবার জন্য বলেন, ‘পরমেশ্বর কি ধান্য ও নানাবিধ ফল সৃজন করেন নাই যাহা হইতে সুরা প্রস্তুত হয়? তাহা যদি হয় তবে তাহাতে আর মদে প্রভেদ কি?’ এতদুত্তরে তিনি বলেন—প্রভেদ বিস্তর। ঈশ্বর-প্রদত্ত পদার্থ সমূহের অপ-ব্যবহার করা হয় মাত্র। বাস্তবিক জর্ম্মনলেখক যাহা বলেন তাহা সকলই সত্য। সত্য, পরমেশ্বর কোন বস্তুই নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। তিনি মানবগণের হিতের জন্য কতকগুলি পদার্থ সৃজন করিয়াছেন এবং তাহা-দিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্য সকল আপন আপন বুদ্ধিদ্বারা কোন্ বস্তুর কি গুণ তাহা পরীক্ষা করিয়া আত্মকার্য্যে ব্যবহার করিবে। বুদ্ধির দোষে কখন কখন হিতকর দ্রব্যেও অহিত উৎপাদিত হইয়া থাকে। সেই গাভী, সেই মানুষ, সকলই সেই—গোপগণ গাভীদুগ্ধে ক্ষীর, ছ্যানা, নবনীত প্রভৃতি সুখাদ্য প্রস্তুত করিতেছে, আর নিষ্ঠুর কশাই সে গাভী হত্যা করিয়া তাহার মাংস বিক্রয় করিতেছে। একই সাগর, দেবতাগণ তাহা মন্থন করিয়া অমৃত লাভ করিলেন আর অসুরগণ তাহা হইতে গরল প্রাপ্ত হইল। একই ধান্য, কেহবা তাহা হইতে মানবগণের দেহ-পুষ্টিকর, বলবিধায়ক, আহারীয় তণ্ডুল প্রস্তুত করিতেছে; আর কেহ বা সেই ধান্য হইতে লোকের সর্ব্বনাশ-কারক মদ প্রস্তুত করিতেছে। United Statesএ এক বৎসরে মদ তৈয়ারিতে এত ধান যায়, যে তাহাতে প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোকের সম্বৎসরের খোরাক চলিত। সুরা হইতে যে দেশের কত অনিষ্টোৎপত্তি হইতেছে তাহা ইহা দেখিলেই স্পষ্ট অনুভূত হয়। যাহা আমাদের প্রধান খাদ্য, যাহা আমাদের জীবন ধারণের প্রধান উপায়; ইহার প্রস্তুতীকরণে ত তাহার অধিকাংশই নিঃশেষিত হইতেছে, আবার শুদ্ধ যে ইহাই তাহা নহে। সুরাপানের সে অশেষ মন্দ ফলের কথা কে সকল বর্ণনা করিয়া উঠিবে?

এক সুরা হইতে এক্ষণে আমাদের দেশে কত যে অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা বলিয়া শেষ হয় না। সর্ব্বসংহারিণী সুরা রাক্ষসীর পাপ নিশ্বাসে দিন দিন যে কত কত লোক অকালে শমন সদনে গমন করিতেছে তাহা গণনা করা দুঃসাধ্য। ম্যালেরিয়া বল, আর প্রবল মহামারি বল, কিছুতেই এরূপ

অগণন প্রাণ হানি হয় না। বাস্তবিক, সুরার যে সংহারিণী শক্তি অতিশয় প্রবল, Dawson Burns কৃত সুরাপানের মৃত্যুর তালিকা পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয়। তিনি একস্থানে বলেন, United Kingdom এ প্রকৃত সুরা পানে ২৭০৫০, সুরা সংক্রান্ত রোগাদিতে ২০২৫১ এবং নিয়মিত মদ্য পানে ৬৯৬২ এই সর্ব্ব সমেত ৫৪২৬৩ লোকের সুরা পানে মৃত্যু হইয়াছে। John Milton যথার্থই বলিয়াছেন:——

> Some by violent stroke shall die,
> By fire, by famine ; by Intemperance more.
> Intemperance on the earth shall bring
> Diseases dire, of which a monsterous crew
> Before thee shall appear !

W. E. Channing বলেন, সুরাপান হইতে যত প্রকার অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে জ্ঞান-হীনতাই প্রধান। বারম্বার মদিরা পানে বিবেকশক্তি আত্মসংযম প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণাবলী হীনতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। সুরাশক্ত ব্যক্তি আর পাপ করিতেও ভীত হয় না। যাহার জ্ঞানই নাই, তাহার আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ কি? যে জ্ঞান ও ধর্ম্মের জন্য মানুষ জীব মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য, যদি অসঙ্কুচিত চিত্তে সেই উৎকৃষ্ট গুণদ্বয়কেই জলাঞ্জলি দিতে আরম্ভ করিল, তখন আর তাহার মনুষ্যত্ব কোথায়? শুদ্ধ যে মনোমধ্যেই তাহাদের এরূপ হীনাবস্থা জন্মে তাহা নয়, ক্রমে তাহা শরীরেও প্রকাশ পাইতে থাকে। মুখকান্তি বিবর্ণ হইয়া যায়, চক্ষুর্দ্বয় রক্ত বর্ণ ধারণ করে, দেহ পাণ্ডুরতা প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি নানাবিধ দেহগত বৈলক্ষণ্যও লক্ষিত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, শরীর রোগের আগার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, হয়ত delorium tremencs উপস্থিত হয়, হয়ত শ্বাসনালী পচিয়া যায়, হয়ত বা পাকস্থলী ফাটিয়া চিরদিনের জন্য এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ইহাই কি শেষ? যে মদ খায়, সে যদি মদের প্রতিফল আপনি একাই ভোগ করে, যদি মৃত্যুই সুরাসেবনের পরিণাম হয়, তাহাতে সমাজের কি ক্ষতি বৃদ্ধি? যে মজিবে, সে মরিবে; সে জন্য আমিই কেন বা আজ এই পুরাতন-পঞ্জিকার কথা লিখিতে বসিয়াছি? যে মদ খায় সে যদি কেবল নিজের অনিষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হইত,

তাহা হইলে সমাজসংস্কারক কখনই মদের বিরুদ্ধে এত কথা বলিতেন না। সে মরিলে সমাজেরতো মঙ্গলের কথা, সমাজতো তাহা হইলে জঞ্জাল হইতে নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু তাহা তো নয়।

সুরাবৃক্ষে যে কেবল রোগোৎপত্তি, অর্থনাশ, আত্মগ্লানি, বলক্ষয় ইত্যাদি বিষময় ফল ফলে, তাহা নহে। পানদোষ তাবৎ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজক। সুরাপান করিলে কামাদি সকল রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়, তাহা কর্ত্তৃক কোন দুষ্কৃতই অকৃত থাকে না। যে নরাধম নেশায় মজিয়া সকল প্রকার অসৎ কর্ম্মই সম্পন্ন করিতে পারে তাহাপেক্ষা আর মহাপাতকী কে আছে? দস্যুও তাহার ন্যায় পাপাচারী নয়, হত্যাকারীও তাহার ন্যায় দুরাচার নহে। সে অনায়াসে অকুণ্ঠিত হৃদয়ে সুরার বশবর্ত্তী হইয়া রিপু বিশেষকে চরিতার্থ করিবার জন্য কোন কামিনীর ধর্ম্মরূপ অমূল্য নিধি অপহরণ করে। সে কখন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পরধন হরণেও সঙ্কুচিত হয় না। সুরা পানে মত্ত হইয়া ক্রোধ রিপুর উত্তেজনায় হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। মদ খাইতে খাইতেই Alexander ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণের বন্ধু Clytusকে হত্যা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক, মাতালের দ্বারা কোন অকর্ম্মই অসম্পাদিত থাকে না। মনুষ্যসমাজ কবে এ পাপ জঞ্জাল হইতে নিষ্কৃতি পাইবে? কবে লোকে মদ ছাড়িতে শিখিবে?

কিন্তু কথা হইতেছে কি, লোকে মদ খাইতে শিখে কেন? মদ খায় কেন? বুঝি ইহার কিছু কারণ আছে। সে কারণ কি? যাহা বুঝিয়াছি, নিম্নে তাহার বিষয়ে বলিতেছি। কারণ বুঝি এই গুলি——

প্রথম। অপরের দৃষ্টান্তই প্রধান কারণ। বালকের মন স্বভাবতঃ কোমল; আর্দ্র মৃত্তিকাবৎ, যেরূপ ইচ্ছা গঠিত হইতে পারে। যাহা দেখে তাহারই অনুকরণ করে, ভাব সংসর্গগুণে হৃদয়ে অনুবিদ্ধ হয়। বহুদর্শন কাহাকে বলে জানে না, জ্ঞান ও চিন্তার বিষয় অতি অল্প, পক্ষান্তরে মনও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। বহুবিষয়ের অভাবে এক বিষয় লইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করে, ক্রমে সংসর্গের গুণে তাহা হৃদয়মধ্যে দৃঢ় বদ্ধ হইয়া যায়। শিশুগণ যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখে, সেইরূপ শিক্ষা করে, সেইরূপ কর্ম্ম করে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের চরিত্রও সেইরূপ হইয়া উঠে। বিশেষতঃ গুরুজন-

দিগের যেরূপ আচরণ দেখিতে পায়, তাহাদিগের সেইরূপ প্রবৃত্তি জন্মান অধিক সম্ভব। যাঁহারা পাপপঙ্কে পরিলুণ্ঠিত হইতেছেন, তাঁহারা নিজে আপনাদের সন্তানগণের যত অকল্যাণ উৎপাদন করিতে পারেন, ভূমণ্ডলে অন্য কাহারো কর্ত্তৃক তত দূর সম্ভবে না। এমন প্রায় সচরাচর দেখা যায়, যে বাড়ির কর্ত্তাটি সুরেশ্বরীর উপাসক, সে বাড়ীর ছেলে গুলিও প্রায় সুরার এক এক জন প্রধান ভক্ত হইয়া থাকে। এ দোষ কাহার? বালক যেমন দেখে তেমনি শিক্ষা করে। দোষ সেই কর্ত্তার। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বক্ল (Buckle) বলেন, "আমার কার্য্যের জন্য আমা অপেক্ষা আমি যে সমাজে বাস করি, সেই সমাজ অধিক পরিমাণে দায়ী।" বস্তুতঃ যে জন্য ইংলণ্ডীয়-গণ স্বাধীনতা-প্রিয়, যবনেরা কাফেরবিদ্বেষী, যে জন্য কামরূপবাসী শক্তি-পূজক, য়িহুদীসন্তান বাণিজ্যজীবী, আর বাঙ্গালী বিলাসিনীর অঞ্চলবায়ু-সেবী, যে কারণে জেম্‌স মিলের পুত্র জন্‌ মিল দার্শনিক; সেই কারণেই মদ্যপায়ীর পুত্র সুরাভক্ত হইয়া থাকে। গল্প শুনা গিয়াছে, কোনও বাড়ীর একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশু এক দিন আঙ্গুলে মদ মাখাইয়া চুষিতেছিল, তাহা দেখিয়া এক ব্যক্তি তাহাকে ভৎর্সনা করিলে, সে বলিল—"কেন, ইহাতে দোষ কি? বাবা, দাদা রোজই তো ইহা খাইয়া থাকে, আমিও তাই খাইতে শিখিতেছি।" ইহার পর লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় আর কি হইতে পারে? মানুষ কবে আপনার মনুষ্যত্ব বুঝিতে পারিবে?

দ্বিতীয়। সংসর্গ দোষ ইহার আর একটি কারণ। যেমন দুগ্ধের সহিত অম্ল মিশ্রিত হইলে, সে দুগ্ধও অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দুর্জ্জনের সহিত সহবাস করিলে সাধু ব্যক্তিও অসাধু ভাব প্রাপ্ত হন। এমন অনেক দেখা গিয়াছে যে, যে ব্যক্তি পূর্ব্বে সুরার একজন বৈরী ছিলেন যেব্যক্তি সুরাপাননিবারিণীসভার একজন প্রধান সভ্য ছিল, এক সময়ে যে ব্যক্তি সুরার প্রসঙ্গমাত্র উত্থাপনে অত্যন্ত ঘৃণা ও বিস্ময় প্রকাশ করিতেন, এক দিন সুরার বিপক্ষে যাঁহার চীৎকারে টাউনহল ফাটিয়া যাইত, কালে সেইব্যক্তি সংসর্গের বশীভূত হইয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে অম্লানবদনে সেই ঘৃণাকর কুৎসিত-পাপে প্রবৃত্ত হইতেছে, আর একদিন যে বালকেরা তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সাধুচরিত্রের কত প্রশংসা করিয়াছে, তাহারা আজ অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বিদ্রূপের হাসি

হাসিতে হাসিতে এ উহাকে তাঁহার বকধার্ম্মিকত্বের পরিচয় দিতেছে। বালকেরা হাসে, কিন্তু ইহা হাসির কথা নয়। বড় কষ্টের বিষয়, ইহা দেখিলে হৃদয় দলিয়া যায়, সংসর্গে পড়িয়া মানুষ যে এমন করিয়া নরকের কীট হইয়া যায় ইহা ভাবিয়া অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে।

তৃতীয়। ব্যক্তিবিশেষের এক একটি স্বকপোল-কল্পিত মত ইহার এক একটি কারণ। সে সকল অদ্ভুত মতের কথা বলিতেছি।

১। কেহ কেহ বলেন, আজ কাল সভ্যজগতে মান সম্ভ্রম লাভ করিতে যাইলে মদ খাওয়া আবশ্যক। মদ না খাইলে বড় লোকের সঙ্গে মিশা যায় না। আজ কাল বড় লোক হইবার একটী প্রধান উপায়, শ্বেতপুরুষদিগের অনুগ্রহ প্রাপ্তি। তাঁহাদিগের অনুগ্রহ পাইতে হইলে তাঁহাদিগকে ভোজ দেওয়া চাই, সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গে মিলা মিশা চাই, সুতরাং তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার অনুযায়ী চলা আবশ্যক। ইংরাজ মদ খায় বাঙ্গালী বড লোক হইবার জন্য ইংরাজকে গুরুর অধিক ভক্তি করিবে, তাহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ বলিয়া খাইবে, সুতরাং মদে ঘৃণা করিলে চলিবে কেন? প্রসাদে ঘৃণা করিলে গুরুকে ঘৃণা করা হয়। এ কথা মূর্খ লোকেও জানে। তবে মদে ঘৃণা করিবে কেমন করিয়া? এ সব যুক্তি মন্দ নহে! ছিঃ এমন করিয়া প্রসাদ খাইয়া কি বড় লোক না হইলে চলে না? ইংরাজ গুরু বলিয়া কি আগে তাহার দোষের দৃষ্টান্তটি অনুকরণ করিতে হইবে? আর সাহস, ধৃতি অধ্যবসায়, কার্য্যপটুতা তাহাদিগের যে কত শত গুণ রহিয়াছে, কয়জন বড় লোকে তাহার অনুকরণ করিয়াছে? লেখা পড়া শিখিয়া ইংরাজের অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় তাহাদের সঙ্গে এক টেবেলে বসিয়া মদ খাইয়া যাহার বাহাদুরি করিতে প্রবৃত্তি হয়, সে যদি বিদ্বান তবে মূর্খ কে? দেশের লোকে তাহাকে ঘৃণা করে, ইংরাজেরাও তাহাকে ঘৃণা করে। যদি গুণ থাকে আপনা আপনি বড় লোক হইবে; কিন্তু নিজে দাঁড়কাক, ময়ূরপুচ্ছ পরিয়া ময়ূর সাজিলে কি হইবে? আর তাই যদি নিতান্ত ইচ্ছা হয়, সুরাপান করিতে শিখিবার আগে ইংরাজের গুণ গুলি অভ্যাস করিতে শিক্ষা কর দেখি।

২। কেহ কেহ বলেন সুরায় চিন্তাশক্তির প্রাবল্য জন্মে, সুরা পান করিলে মনোমধ্যে নানা ভাবের উদয় হয়; সুরা পান করিয়া লিখিতে বসিলে

ভাবের দৌড়ের সঙ্গে লেখা আপনি দৌড়িতে থাকে, সুরা মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক কার্য্য করে, মদ খাইয়া যেরূপ লেখা যায়, মদ না খাইয়া সেরূপ লেখা যায় না। এই অদ্ভুত যুক্তির কথা লইয়া অধিক আন্দোলন করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। এই সর্ব্বনেশে ভ্রমে পড়িয়া কত ফুটন্ত জীবনকুসুম যে সুরাকীট কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইয়াছে কে তাহার গণনা করিবে? চক্ষের সমক্ষে যে সকল দৃষ্টান্ত আজও ভয়ঙ্কর বেশে ক্রীড়া করিতেছে, সে সকল কথা লিখিতে গেলে চক্ষে জল আসে, অশ্রুতে বুক ভাসিয়া যায়; আর তাহা লিখিব কি? ভগবন্! কবে এ দুরন্ত ভ্রম হইতে এই দুঃখের দেশকে রক্ষা করিবে?

৩। কেহ কেহ বলেন, অনেক পরিশ্রমের পর এক গেলাস মদ খাইলে সমস্ত শ্রম জল হইয়া যায়, আর শরীরেও একটু বেশ আরাম বোধ হয়। তাঁহাদের এ কিরূপ মত বলিতে পারি না। জিজ্ঞাসা করি, ঐ যে হতভাগ্য বলদ চৈত্ররৌদ্রের খর কিরণে দগ্ধ হইয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভোঁতা হাল টানিয়া কৃষকের ঠেঙা খাইতে খাইতে লৌহকঠিন ভূমি কর্ষণ করিতেছে, আর শ্রমের জন্য সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘর্ম্মের শতধারা ঝরিতেছে—জিজ্ঞাসা করি—ঐ বলদ কি গৃহে গিয়া এক গেলাস মদের জন্য কোনও চিহ্ন প্রকাশ করে? না, শীতল জল ও পুষ্টিকর খাদ্যই তাহার পক্ষে যথেষ্ট? বাস্তবিক, মদে শরীরের পক্ষে কোনও উপকারই হয় না। তবে হইতে পারে, অনেক পরিশ্রমের পর সুরা সেবন করিলে আপাততঃ কিয়ৎ-পরিমাণে দৈহিক গ্লানির অবসান হয়, কিন্তু তার পর যে ক্রমেই শরীর দুর্ব্বল ও রোগার্ত্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সে সকল কথা পরে বলিতেছি।

৪। কেহ বলেন, শীতপ্রধান দেশে মদ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, ইহাতে শরীর গরম থাকে, সহজে শীত অনুভব হয় না। এ মতে আমাদের আস্থা নাই; ইহা বড় ভুল কথা। একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। এক দিন নিউ-বরি পোর্টে (Newbury port) এক খানি জাহাজ ভাঙিয়া যায়। জাহাজের কর্ম্মচারিরা শীতে বড়ই কাতর হইয়া তাহাদের অধ্যক্ষকে আপনাদের কষ্ট জানায়। অধ্যক্ষ তাহাদিগকে সে রাত্রি মদ খাইতে নিষেধ করেন। কেহ

বা সে কথা শুনিল, কেহ বা শুনিল না। শেষে ফল হইল, যাহারা তাঁহার কথা না শুনিয়া মদ খাইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ হাত, কেহ পা, কেহ বা জীবন পর্য্যন্ত হারাইয়াছিল, কিন্তু যাহারা অধ্যক্ষের পরামর্শ অনুযায়ী চলিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহই কোন আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই। ইহা কল্পনার কথা নহে, সত্য ঘটনা। তাই বলিতেছিলাম, এ মতে আমাদের আস্থা নাই, ইহা বড় ভুল কথা।

৫। কেহ বা বলেন, গ্রীষ্ম নিবারণের জন্য সুরাপান আবশ্যক। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, জ্বলন্ত অনলে আহুতি প্রদান করিলে যেমন আগুন না নিবিয়া বরং তাহার তেজ আরও বাড়িয়া উঠে, তেমনি গ্রীষ্ম নিবারণ না হইয়া বরং আরো শরীরের জ্বালা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। Dr. Bell বলেন উষ্ণ প্রধান West Indies প্রদেশেও সুরা হইতে নানা অশুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং গ্রীষ্ম নিবারণের জন্য যে সুরাপান আবশ্যক তাহা নিতান্ত অসঙ্গত কথা।

৬। অনেকেই বলিয়া থাকেন, সুরাপান করিলে শরীরে পুষ্টি সাধন হয়, মনে অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি হয়, দেহের লাবণ্য বাড়িয়া থাকে। কিন্তু আবার অনেক ডাক্তারে বলেন, ইহাতে শরীরের পক্ষে উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়। ইহাতে পরিপাকশক্তি, শোনিত সংস্কার প্রভৃতি হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং শেষ অজীর্ণাদি নানা রোগ উৎপন্ন হইয়া এক কালে শরীর দুর্ব্বল ও ভগ্নাবস্থ করিয়া ফেলে। Ladies' National Temperance Convention নামক সমাজের কর্ত্রী বিবি Elliceকে Sir Henry Thompson এইমত সম্বন্ধে লিখিয়া পাঠান ——

"Don't take your daily wine under any pretext of its doing you good. Take it frankly, as a luxury, one which must be paid for; by some at a high price, but always to be paid for and mostly some loss of health, or of mental power, or of calmness of temper, or of judgment is the price."

অক্ষয় বাবুও যথার্থ লিখিয়াছেন—"যেমন কোন পুষ্প-কলিকা কোন বস্তু-কর্ত্তৃক আহত হইলে প্রস্ফুটিত না হইতেই বিশীর্ণ হইয়া যায়, সেই রূপ দিন দিন যে কত রূপ লাবণ্য-বিশিষ্ট তরুণবয়স্ক যুবকের স্বাস্থ্য ও লাবণ্যরূপ রমণীয়

পুষ্প সুরাপান রূপ বিষম উৎপাতদ্বারা অকালে মলিন ও ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।" বাস্তবিক, আমরাও লিখিয়া শেষ করিতে পারি না, আমাদিগের চক্ষের উপর আমরা এপ্রকার কতশত ঘটনা দেখিয়াছি। তবে কেমন করিয়া এ মতের পোষকতা করিব ?

চতুর্থ। জাতি বিশেষের কুসংস্কার সুরাপানের আর একটি কারণ। অসভ্য সাঁওতালদিগের মনে এই বিশ্বাস, তাহাদের দেবতা "বুড়িপাহাড়" তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে কিরূপে মদ তৈয়ার করিতে হয় ও কিরূপে তাহা পান করিয়া মাতাল হইতে হয় তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সুরা পান করে। আমাদের হিন্দুগণ পূর্ব্বে যেমন ইন্দ্রদেবকে সোমরস দিয়া পূজা করিতেন, ইহারাও সেইরূপ তাহাদের তৈয়ারি মদ দিয়া 'বুড়ী পাহাড়ের' পূজা করিয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে সাঁওতালদিগের দশটি পার্ব্বণ হয়, তাহার সকলেতেই মদের ছড়াছড়ি হইয়া থাকে। এই প্রকার কুসংস্কারে পড়িয়া অনেক জাতি সুরার নেশায় মজিতেছে।

পঞ্চম। শুঁড়ি অথবা শুঁড়িরূপী মদ্যব্যবসায়ীগণ ইহার আর একটি বিশেষ কারণ। ব্যাধ যেমন তণ্ডুলকণা বিস্তার করিয়া পক্ষীদিগকে লোভ দেখাইয়া পাশবদ্ধ করে, তেমনি ইহারা, দিন নাই রাত্রি নাই, মদের দোকান খুলিয়া রাস্তার লোকদিগকে প্রলোভনে ফেলিয়া আপনার অসৎ অভিসন্ধি সিদ্ধ করে। মদের দোকান যে কি ভয়ানক স্থান তাহা লিখিয়া জানাইবার নহে—নরক ও বুঝি ইহার নিকটে হারি মানে। সর্ব্বদাই জটলা হইতেছে, সর্ব্বদাই দাঙ্গাহাঙ্গাম, মারপিট, এ উহাকে গালি দিতেছে, সে তাহাকে মারিতেছে, কেহ চীৎকার ছাড়িতেছে, কেহ পশুবৎ নাচিতেছে, কেহবা আছাড় খাইয়া ভূমে পড়িয়া পূতিগন্ধময় বমন রাশি মধ্যে ভাসিতেছে। সে সব ভয়ঙ্কর দৃশ্যের কথা কে বর্ণনা করিবে ? ঈশ্বর জানেন, কবে এ পৃথিবী হইতে নরকের পাপ দৃশ্য বিলুপ্ত হইবে। আমেরিকার মহিলারা দল বাঁধিয়া এই সকল মদের দোকান উঠাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন; আমাদের দেশে সভা আছে, সমিতি আছে, ব্যাণ্ড অফ্

লোপ আছে—আমাদের দেশের পুরুষেরা কি এজন্য কোনও চেষ্টা করিতে পারেন না ?

ষষ্ঠ। চেষ্টা করিলে কি হইবে ? আমরা যে কয়টি কারণ দেখাইলাম, তাহার উপর আবার গভর্ণমেণ্ট একটি কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। মদের দোকান উঠাইবে কি, আবার গ্রামে২ ভাঁটির সৃষ্টি হইল। তুমি দেশের হিত করিতে একটু চেষ্টা করিবে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট অর্থ লইয়া লালায়িত, গভর্ণমেণ্টের অর্থ-লালসার সহিত তোমার হিতাকাঙ্ক্ষার সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, দুর্ব্বল তোমার চেষ্টা আপনাকে রক্ষা করিবে কেমন করিয়া ? বৎসর বৎসর আবকারি ডিপার্টমেণ্টর রিপোর্ট রিজোলিউশন বাহির হইতেছে, বৎসর বৎসর ইহার আয় ব্যয়ের তালিকা গেজেটের সুদীর্ঘ স্তম্ভ সকল অধিকার করিয়া প্রকাশিত হইতেছে, গভর্ণমেণ্টের ইহাতে বিলক্ষণ দুপয়সা লাভ আছে, কেন তিনি তোমার চীৎকারে কর্ণপাত করিবেন? ইডেন সাহেবকে লোকে গালি দিয়াছিল, টমসন সাহেব ও তো সেই দাদার রায়ে মত দিয়া চলিলেন, তবে আর চেষ্টা করিলে কি হইবে ? সংবাদ পত্রের দল ! তোমরা ও দুঃখের কাহিনী লইয়া কাঁদিয়া ককাইয়া মরিলে কি হইবে ? ইংরাজ টাকার জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ভারতের এ দগ্ধ মরুভূমে আসিয়াছে, ইংরাজ তোমার জন্য সে সকল কথা শুনিবে কেন ? কিন্তু, জগদীশ ! অনন্ত দুঃখের এই ভারত, রাজা হইয়া ইংরাজ আর কত দিন ইহার দগ্ধ মরুভূমে আরও আগুন ঢালিবে ? কবে আবকারি রিপোর্ট অনলের তীব্রশিখায় পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে ?

সপ্তম। ঔষধে সুরা প্রচলিত হইবার প্রথা ইহার বড় সর্ব্বনেশে কারণ। জানি না, কি বুঝিয়া ডাক্তারেরা ঔষধে সুরা ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হন। তবে কি সত্য সত্যই 'ঔষধার্থে সুরাপান'-এ কথা একেবারে দূষণীয় বলিতে হইবে ? ঔষধে কি সুরা ব্যবহার হইতে পারে না ? পারে না, কি পারিবে না এ কথা কে বলিতেছে ? বিষ হইতে যেমন ঔষধ উৎপন্ন হয়, সুরা হইতেও তদ্রূপ হইতে পারে। কিন্তু সে স্থলবিশেষে, তাহা সম্ভবমত।

এ বিষয় লইয়া পারিশে একবার মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। পারিশি-য়ানদিগের মধ্যে অনেকেই বলেন, সুরা ঔষধে ব্যবহার করা অতীব অন্যায়।

ইহাতে শরীর সুস্থ না রাখিয়া বরং ক্রমে ব্যাধিগ্রস্থ করে এবং আরও ইহা দেখা যায়, যিনি ইতিপূর্ব্বে সুরার একজন প্রধান বিপক্ষ ছিলেন, তিনিও ঔষধার্থে সুরা সেবন করিয়া ক্রমে ভয়ঙ্কর মাতাল হইয়া উঠিয়াছেন; অতএব যাহাতে ঔষধে সুরা প্রয়োগের প্রথা উঠিয়া যায় তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। ডাক্তার Todd--যিনিই ঔষধে সুরা ব্যবহারের নিয়ম প্রথম বাহির করেন, তিনি ও তাঁহার সহযোগী ডাক্তার Anstie এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, ইহাতে শরীরের পক্ষে কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই; তবে নিয়মিত পরিমাণ চাই, পরিমাণের ব্যত্যয় হইলেই হিতের স্থানে অহিত হইতে পারে। তাই বলি, যখন একটু মাত্রার কমবেশীতে হিতে বিপরীত হয় তখন আর ঔষধ বলিয়া মদ না ব্যবহার করিলেইত হয়। সকল ডাক্তারই যে সে প্রণালী সুচারু রূপে অবগত আছেন তাই বা কিরূপে সম্ভবে? আর তাঁহাদেরও বলি, তাঁহারা যখন নিজেই প্রথা না জানেন, তখন তাঁহারাই বা পরকে কিরূপে সুরা পানে ব্যবস্থা দেন? আর ঔষধের প্রণালীর কথাই বা কি বলিব? বিলাতের বিখ্যাতনামা ডাক্তর Edward Smith ত বলেন Anstieর সমস্ত কথা সর্ব্বৈব ভাণ, সুরামিশ্রিত ঔষধে উপকার না হইয়া বরং অপকারই হইয়া থাকে। Lancet নামক সংবাদ পত্রে তিনি নিম্ন প্রকটিত মতে তাঁহার মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন;—

"I characterise much of Dr. Anstie's subtle philosophy on the exhibition of of alcohol as nothing better than 'talk, talk'. What are high probabitlies? What is moderation? Take it if you please, but if you do please, you please to diminish *pro tanto* the efficiency of your body and your brain. Who would venture to undertake to collect the products of respiration, perspiration, urination, and defecation for any period, much more forty-eight hours? Such an attempt would be futile, and the most exact painstaking experimenters would decline to make it, yet it must be effected to produce the proof required. That it will remain in the body for thirty hours and upwards and still, substances of piosonous nature do remain in the body unchanged for days and ultimately diminish the health of mind and body."

John Stuart Mill ও এ সম্বন্ধে এই প্রকার অনেক কথা বলিয়াছেন। ফলতঃ যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, ঔষধে সুরা ব্যবহার করায় উপকার না হইয়া অপকারই বেশি হইয়া থাকে, অথবা কেবল অপকারই জন্মে। তাই যদি হয়, তবে আর ছাই এ লোকমজান প্রথা কেন? লোককে অসৎপথে লইয়া যাইলে যে দায়ী হইতে হয়, ডাক্তারেরা কি একবার সে দায়িত্বের বিষয় ভাবিয়া দেখিয়াছেন? ডাক্তার ভায়ারা এ কটু বুঝিয়া সুঝিয়া চলুন, ইহাই আমাদের শেষ কথা।

বড় ইচ্ছা ছিল, গবর্ণমেণ্টকে কিছু বলিব, কিন্তু আর প্রবৃত্তি হয় না। দেশে, শুনিতে পাই, আজকাল অনেক সভা সমিতি হইতেছে, কিন্তু কাহাকে কি বলিব—কেহ শুনিবে কি? তবে তুমি—তুমি শোন আর না শোন—তোমায় বলি, 'হে ধর্ম্মলজ্জা-মানমর্য্যাদা-পরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে, ভেবে দেখ দেখি, তুমি কি ছিলে আর কি হইয়াছ? একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, পশুতে আর তোমাতে কি প্রভেদ? তোমার হৃদয়ক্ষেত্র কি এতই নীরস যে সেখানে একটীমাত্র সৎবৃত্তি অঙ্কুরিত হইবার যো নাই? তোমার যদি স্থির হইয়া চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে একবার ভাব দেখি, তোমার নৃশংস আচরণে কত কুলকামিনী কুলে জলাঞ্জলি দিয়াছে, কত ভদ্রসন্তান তোমার কুসংসর্গে লিপ্ত হইয়া একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে, তোমার চাতুরীবলে কত গৃহস্থের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। একবার তোমার পূর্ব্বাবস্থার সহিত এই অবস্থা তুলনা করিয়া দেখ দেখি; তুমি কলেজ হইতে বাহির হইলে একটী দেবতা, এখন হয়েছ নরপিশাচ। তোমার স্বভাবের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, যে পিতা জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে, শ্রাবণের বর্ষায়; পৌষের শীতে মুমূর্ষু হইয়াও তোমার আহার আহরণ করিয়াছিলেন, সে পিতা কি না আজ তোমায় দেখিলে চক্ষু মুদিত করেন। যে জননী তোমাকে দশমাস দশদিন উদরে ধারণ করিয়া কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন এবং তোমার মুখের আধ আধ মা মা ধ্বনি শুনিয়া অপার আনন্দ সাগরে ভাসিতেন, তিনি কি না আজ তোমায় দেখিলে কপালে করাঘাত করেন। যে স্ত্রী তোমাকে কৃতবিদ্য স্বামী পাইয়া আপনাকে ধন্যা মনে করিতেন, তোমার মুখ খানি দেখিলে সংসারের সকল

জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যা তেন, হায়, সেই স্ত্রী আজ কি না তোমায় দেখিলে নিজের বৈধব্যকামনা করেন। যে পুত্র লোকমুখে তোমার প্রশংসা শুনিলে আনন্দে অধীর হইত, সেই কি না আজ বিরলে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে। যাঁহারা তোমাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিতেন, তোমার সহবাস লাভের জন্যই সদাই ইচ্ছুক হইতেন, আজ-কি না তাঁহারা তোমাকে দেখিয়া ঘৃণা প্রকাশ করেন তোমায় সংসর্গ লাভের ইচ্ছা দূরে থাকুক, তোমায় নিকটে দেখিলে মুখ ফিরাইয়া বসেন, তোমায় এক পথে দেখিলে অন্য পথ দিয়া চলিয়া যান। যে স্বদেশ তোমা হইতে উন্নতি লাভের আশায় এত দিন তোমার মুখাপেক্ষা করিয়া ছিল, আজ কি না তোমা হইতেই তাহার এই দুরাবস্থা হইতেছে! একবার এই সমস্ত বিষয় পূর্ব্বাপর ভাবিয়া দেখ দেখি। আর, ছাই, কত বলির ? ঐ যে নেশায় মজিয়া, শেষ অনুতাপ-শিখার তীব্র দহনে দগ্ধ হইয়া হৃদয়ে শত বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালায় জ্বলিতেং, তোমারি একটী ভাই (সধবার একাদশীর নিমচাঁদ দত্ত) ক্ষোভে দুঃখে মর্ম্মবেদনায় বালকের ন্যায় কাঁদিতেং কি বলিতেছে, উহা একবার শুন দেখি। শুন দেখি, (প্রায়শ্চিত্তের) হতভাগ্য ভগবান দাস তাহার প্রভু নির্ম্মলচন্দ্রের অধঃপতন দেখিয়া সেই পাগলা গারদের মধ্যে, তাহার পাগল প্রভুর সমক্ষে পাগলের ন্যায় কি বলিতেছে—
"জগদীশ! প্রভো! দয়াময়! কেন তোমার মানুষ আপনি বুঝে না, তোমাকে বুঝিতে চায় না, না বুঝিয়া কেন এ গরল পান করে ? সাধ করিয়া কেন এ কালকূট খাইয়া আপনি মজে, পরকে মজায়, তোমার সুখের রাজ্যে দুঃখ আনিয়া উপস্থিত করে ? দীনবন্ধো! কবে এ পুণ্যভূমি হইতে এ বিষবৃক্ষ নির্ম্মূলিত হইবে ?

কুমারী হাইপেশিয়া।

"Nec loqui prius ipsa didicit nec reticere loquenti."

Ovid.

পৃথিবীর রাজনৈতিকক্ষেত্রে পুরাকাল হইতে মুসলমান জাতি যে রূপ

প্রভুত্ব দেখাইয়া আসিয়াছে, বোধ করি, কোন দেশের কোন জাতিই সে রূপ প্রভুত্ব দেখাইতে পারে নাই। খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈণ, হিন্দু, প্রভৃতি জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইয়াছে, তাহাদের কোনটিই রাজনীতির মিশ্রণ প্রাপ্ত হয় নাই; একমাত্র মুসলমান ধর্ম্মই রাজনৈতিক ধর্ম্ম (Political Religion) বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। যবনজাতির ধর্ম্মের সহিত রাজনীতির এরূপ ঘনিষ্ঠতা আছে বলিয়াই মুসলমান জাতি অতদূর উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সমগ্র পৃথিবীর অর্দ্ধ শক্তি এখনও মুসলমানদিগের করতলগত হইয়া রহিয়াছে। আরব্য, পারস্য, তাতার, তুরস্ক, মিশর, আফ্‌গানিস্থান, আবেশিনিয়া প্রভৃতি দেশে মুসলমানশক্তি এখনও অটল অচলভাবে বিরাজ করিতেছে। ফলতঃ যে শক্তি এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ এবং গ্রীশ, স্পেন, পর্টুগাল প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত ইউরোপীয় দেশসমূহকে পদতলে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাকে সামান্য বলিতে পারি না। ভারতে এবং রুসিয়ায় মুসলমান ক্ষমতা এখনও ন্যূন নাই। কোরাণ এবং তরবারির প্রভাব যতদিন জীবিত থাকিবে, এ ক্ষমতাও ততদিন সজীব থাকিবে। পৃথিবীতে যাহারা এতাদৃশ প্রাধান্য দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদের ইতিহাসালোচনা করিলে আদর্শ নর কিম্বা আদর্শ নারীর চরিত্র পাওয়া যাইতে পারে না, ইহা কেমনে বিশ্বাস করিব? দুর্ব্বলদেহ জাতিতে মানব চরিত্রের রমণীয় গুণ সমূহের সমাবেশ হওয়া অসম্ভব। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মুসলমান জাতি কখনই ক্ষীণজীবি নহে, সুতরাং তাঁহাদের ইতিহাস বরণীয় গুণপুঞ্জ বিভূষিত নরনারীর অলৌকিক ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। সেই ইতিবৃত্ত সাগর মন্থন করিয়া আমি অনেক জীবনীরত্ন সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার মধ্য হইতে একটি রমণীরত্নকে অদ্য আমি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন মুসলমান সমাজে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল না, তাহাতেই যুবতী হাইপেশিয়াকে পুরুষ পাঠকের সম্মুখে অনবগুণ্ঠনবতী অবস্থায় আনিতে সাহসী হইয়াছি।

মিসর দেশের অন্তঃপাতী আলেক্‌জেন্দ্রিয়া নগরে সম্রাটবর দ্বিতীয় থিয়োডোসিয়সের শাসনকালে হাইপেশিয়া (ওরফে হিপু) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আলি। আলি একজন প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত,

সম্রাটের সভার তিনি অন্যতম সভাসদ ছিলেন। বিধাতা হাইপেশিয়াকে যেমন বিবিধ রমণীয় গুণ পুঞ্জে বিভূষিতা করিয়া তাঁহাকে নারী জাতির আদর্শ করিয়াছিলেন, তেমনি অসামান্য রূপরাশিতে জ্যোতির্ম্ময়ী করিতে কৃপণতা প্রকাশ করেন নাই। ফলতঃ এমন রূপবতী ও গুণবতী রমণীর বিবরণ মুসলমান ইতিহাসে অতি অল্পই আছে। আলি আরব্য ভাষায় গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। হাইপেশিয়া পিতার নিকট হইতে জ্যোতিষ ও জ্যামিতিক এবং আলেক্‌জান্দ্রিয়ার অপরাপর পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে কাব্য এবং ন্যায়নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। সে সময়ে আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরী বিদ্যালোচনা এবং বিদ্বজ্জনসমাগম জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। আলেক্‌জান্দর বাদসাহ আপন নামানুসারে ঐ নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন, পারস্য ভাষায় উহার নাম সেকেন্দ্রাবাদ। কিয়দ্দিবস মধ্যে পণ্ডিতদিগের সাহায্যে তিনি আরিষ্টটল ও প্লেটো নামক দুই জন জগদ্বিখ্যাত দার্শনিকের গ্রন্থ গ্রীষ ভাষায় পাঠ করিয়া এ রূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলিলেন যে তৎকালে তাঁহার মত মিসরে দার্শনিক পণ্ডিত আর কেহই ছিল না। দর্শনে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ময়্‌বু পণ্ডিতের নিকট তিনি প্রাচীন ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বল্পকাল মধ্যে ডিমস্‌থিনিশের ন্যায় তাঁহার বক্তৃতাশক্তি জন্মিল। যেমনি মনোমোহন রূপ, তেমনি অসীম বরণীয় গুণ। বোধ হয় বিধাতা তাঁহাকে বিরলে বসিয়া সৃজন করিয়াছিলেন। সেই রূপময়ী গুণময়ীর মধুর কণ্ঠ হইতে বক্তৃতার সময়ে যখন সরল উপদেশ সমূহ বহির্গত হইত, তখন তাড়িতের ন্যায় যেন শ্রোতার হৃদয়ে কোন অলক্ষিত শক্তি প্রবেশ করিয়া তাহার হৃদয়কে মাতাইয়া তুলিত। অমন রূপবতীর কলকণ্ঠের স্বৈরবীঝঙ্কার শুনিয়া কে আর স্থির থাকিতে পারিবে? তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য, নানা দেশ হইতে লোক আসিতে লাগিল, কিন্তু বিদ্যা কিম্বা রূপে কেহই তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিল না।

হাইপেশিয়া কেবল রূপবতী ছিলেন না, ধর্ম্মবতী বলিয়াও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। অনেক পণ্ডিত এবং উপপণ্ডিত বিচারে পরাস্ত হইয়া ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতেন বটে কিন্তু তাঁহাদের কেহই হাইপেশিয়ার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে

কখন সন্দিহান হয়েন নাই। হাইপেশিয়া কখন বিবাহ করেন নাই; একবার একজন য়িহুদী বণিক একাদশ লক্ষ টাকা যৌতুক দিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল; হিপু তাহাতে সম্মতা হয়েন নাই। তিনি বলিতেন "বিবাহ না করিলে মনুষ্যের নৈতিক চরিত্র কিম্বা শরীরস্থ মেদ বিকৃত হইয়া যায়, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

জগদীশ্বর হাইপেশিয়ারূপ একাধারে রূপ, গুণ, বিদ্যা, ধন, ধর্ম্ম ও সম্মান সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় খানি কোমল করেন নাই। কোমলতা ও যদি সে হৃদয়ে কিছু ছিল বটে কিন্তু সে হৃদয়ের গভীরতার পরিমাণ করা অতীব দুষ্কর। কালিদাস হইলে বলিতেন "বজ্রাদপি কঠোরাণি,কোমলানি কুসুমাদপি।" মিসর হইতে য়িহুদীদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইল। সেই ব্যাকুল চিত্ত ইঁহার ন্যায় নিয়ত বৈরনির্যাতন-প্রমুখ-সঙ্কল্পের অনুগমন করিত। ফলতঃ তৎকালে মুসলমানদিগের প্রতি য়িহুদীগণ যৎপরনাস্তি অত্যাচার করিত। হাইপেশিয়া স্বচক্ষে সে সকল অত্যাচার ও নৃশংসতা দেখিয়াছিলেন, সুতরাং য়িহুদীর বিনাশ সাধন তাঁহার তপঃ জপঃ হইয়া উঠিল। য়িহুদীদিগের অত্যাচারের কথা এ স্থলে পাঠকদিগকে একটু বলিয়া দিই।

আইরিষ, চীন এবং য়িহুদী এই তিন জাতীয় লোকেরা আদৌই নূতনত্ব প্রিয় নহে, ইহারা সকলেই প্রাচীন প্রথার বিশেষ পোষকতা করিয়া থাকে। সুতরাং এ সকল জাতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া পৃথিবীর অপরাপর জাতি শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এই তিন শ্রেণীর লোকেরা তিন প্রকার বিভিন্ন মত দেখাইয়া জগতের অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। আইরিষেরা বলে, আয়র্লণ্ড দেশের প্রাচীন প্রথা, প্রাচীন বেশভূষা, প্রাচীন নিয়ম, প্রাচীন রাজবিধি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সুতরাং ইংলণ্ডের সহিত আয়র্লণ্ডের মনোবাদ, এই জন্যই Irish Coércion Act আয়র্লণ্ড রাজনিতি-ক্ষেত্রে বিরোধ দেখাইয়াছে, চীনেরা সাহিত্যে ও শিল্পে তাহা দেখায়। ইহারা সমাজ সংস্কারের বিরোধী। সেই যে রাজা নিম্‌রডের আমল হইতে এক-টানা স্রোত বহিতেছে তাহা আর ঘুচিল না। য়িহুদীরা ধর্ম্ম সমাজের বিপ্লবকারী। তাহাদের প্রাচীন ধর্ম্ম অপেক্ষা আর কোন ধর্ম্ম প্রশস্ত ও

পরিমার্জ্জিত হইতে পারে না, এই তাহাদের বিশ্বাস, এই তাহাদের সংস্কার। সুতরাং খৃষ্টানদিগের সহিত য়িহুদীর চির বিবাদ, এই জন্যই অনেক বার খৃষ্টানের শোণিতে য়িহুদীরা স্নাত হইয়া বীরতর্পণ করিয়াছিল; আবার এই জন্যই মহম্মদশিষ্যের সহিত বিবাদ। য়িহুদীরা পথিমধ্যে একাকিনী মুসলমান রমণী পাইলে তাহার সতীত্ব নষ্ট করিত; কোরাণ দেখিলে তাহাতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিত; মসজিদে অগ্নি প্রয়োগ করিত; মুসলমান ফকীরের গলার মালা কাড়িয়া লইত এবং মুসলমান পণ্যাগার লুণ্ঠন করিত। এ সকলাপেক্ষা একটি ব্যপার বড় ভয়ানক, বড় আসুরিক, বড় পৈশাচিক! মহম্মদের মৃত্যু হইলে পর, য়িহুদীরা তাঁহার অপবাদের উদ্দেশে অনেক অশ্লীল পুস্তিকা প্রকাশ করিত এবং মৃত্তিকার মহম্মদ গঠন করিয়া তদুপরি * * প্রদান করিত। তাহাদের একটি ত্রৈমাসিক উৎসব ছিল, উহার নাম 'মোশ্‌লেকাগার'। একটী বিস্তৃত হলের মধ্যে দুই চারি মণ কলাই ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর দিয়া একটী দশম বর্ষীয় বালককে কাষ্ঠ-পাদুকা (খড়ম) পরিয়া যাইতে বলা হইত, বালকটির পা পিছলিয়া যাইত এবং সেই সময়ে তৎস্থানে সমুপস্থিত য়িহুদীগণ আহ্লাদে নৃত্য করিয়া তাহার গাত্রে একেবারে শত শত ছুরিকা বিদ্ধ করিত। বালক চীৎকার করিত, কিন্তু তাহারা আনন্দে গান করিত। ঐ বালকের মাংসযুক্ত কলাই রন্ধন করিয়া পরমাহ্লাদে "মহম্মদের শরীর ভক্ষণ" নামক উৎসবের উপ. সংহার করিত। আর একটি উৎসব ছিল, তাহা বৎসরে একবার হইত, তাহার নাম 'শেরাফ্'। একটি বিস্তৃত ময়দানের মধ্যে বহুশত মণ ময়দা স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইত এবং বহু সংখ্যক মুসলমান বালককে ধরিয়া আনিয়া বধ করা হইত। ঐ ময়দা এবং মুসলমানের রক্ত একত্রে মাখিয়া তাহার রুটি প্রস্তুত হইত, য়িহুদীরা ঐ রুটি পরমানন্দে আহার করিত। হাইপেশিয়া এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। সুতরাং অচিরাৎ জেহাদ্ (ধর্ম্মযুদ্ধ) ঘোষিত হইল।

বিক্রমে য়িহুদীরাও কম নহে, তাহারা দলে দলে আসিয়া হাইপেশিয়ার সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়িল। প্রথম যুদ্ধে হাইপেশিয়াকে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি হটিবার পাত্রী নহেন। এই যুদ্ধ

ব্যাপার প্রায় ৬ বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল। এই ছয় বৎসরের মধ্যে য়িহুদী জাতি পরাজিত, পরিত্যক্ত, শ্রীভ্রষ্ট, নির্ব্বীর্য্য এবং নিরুপায় হইয়া মিসর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ক্রমে হাইপেশিয়ার প্রভাবে মুসলমান ধর্ম্মের আবার জ্যোতি বাড়িল, আবার দেশে শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। হাইপেশিয়া য়িহুদীগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করিলে, য়িহুদীগণ যে রূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, কালে বোধ হয় তাহারা মুসলমানশক্তি বিধ্বংস করিয়া ফেলিত।

৩৭ বৎসর বয়সে হাইপেশিয়ার মৃত্যু হয়। এক দিন সায়াহ্নে তিনি একাকিনী প্রার্থনালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন এমন সময়ে কতিপয় নিষ্ঠুর প্রকৃতি য়িহুদী তাঁহাকে নিরস্ত্রা দেখিতে পাইয়া হত্যা করে। মৃত্যুর সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন "এ রূপ প্রকারের হত্যা ভীরু রমণীর পক্ষে শোভা পায়। তোমরা পুরুষ নহ, কাপুরুষ। নতুবা নিরস্ত্রাকে গোপনে মারিবে কেন?" তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া রাজা বলিয়াছিলেন "আর এক বৎসর পরে হাইপেশিয়াকে আমি রাজ্য ভার দিতাম।"

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

নবীনার জবাব।

দ্বিতীয় বৎসর কল্পনার ১১৯ পৃষ্ঠায়

'প্রবীণার নালিশ' দেখ।

সম্পাদক মহাশয়,

মনে পড়ে কি, অনেক দিন হইল, এক প্রবীণা (বুড় বলিলেও বলা যায়) আপনার নিকট এক নালিশ রুজু করিয়াছিল, আপনি এবং আপনার ন্যায় প্রবীণার দুঃখে ব্যথিতহৃদয় পাঠকগণ সাবধান হউন, আজ আমি খোদ

নবীনা সুন্দরী প্রবীণার নালিশের জবাব দাখিল করিতে হাজির হইলাম। প্রবীণার ন্যায় গলাবাজি ও অনর্থক গালি দিয়া কোন্দল করিতে মজবুত না হইলেও এ অবলা, সরলা, কুলবালা নবীনার জবাব শুনিবেন না কি?

প্রবীণার নালিশের আগাগোড়া কেবল আমাদের উপর হিংসা দেখিতে পাই, আর সেই হিংসার দরুণ গায়ের জ্বালায় আমাদিগকে গালি দেওয়া হইয়াছে; গরিব পুরুষ বেচারীরাও এ গালি হইতে অব্যাহতি পায় নাই। তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহারা প্রবীণা অপেক্ষা নবীনাকে অধিক ভাল বাসে। আচ্ছা, সম্পাদক মহাশয়, আমি জিজ্ঞাসা করি, ভালবাসার উপর কি কাহারও জোর খাটে? না গলাবাজিতে ভাল বাসা বাঁধিয়া রাখা যায়? পৃথিবীতে ভাল জিনিষেরই সকলে আদর করিয়া থাকে, তাহা বলিয়া যে আদর করে, কিম্বা যাহাকে আদর করে তাহাকে গালি দেওয়া কি উচিত?

প্রবীণার প্রবীণত্ব দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে—"যৌবন কিছু চির-কাল থাকে না, জোয়ারের জলের মতন কিছুক্ষণ থাকিয়া চলিয়া যায়"। যৌবন চিরকাল থাকে না বলিয়া কি এ পৃথিবীতে যুবতীর আদর হইবে না? এ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী কে? বিশেষতঃ ভাল জিনিষ হইলেই ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে, তাহা বলিয়া কি সে জিনিষের আদর হইবে না? আমার মতে এখন অপেক্ষা সে জিনিষের আদর দ্বিগুণ হওয়া উচিত।

প্রবীণা গুণকে একেবারে এক্ চেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার বিশ্বাস এই যে, তাহার রূপ নাই বলিয়া নিশ্চয়ই গুণবতী; সেই জন্য বুক ফুলাইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, আপনি রূপের না গুণের পক্ষপাতী? আচ্ছা, রূপ ও গুণ কি এক আধারে থাকিতে পারে না? ইহা যদি অসম্ভব হয়, তবে আজ হইতে কবিদিগের অন্ন উঠিল, কারণ তাঁহাদের সকল নায়িকাই রূপবতী ও গুণবতী; তাঁহাদের অসাধারণ কল্পনারও গুণের একত্র আর আদর হইবে না, কারণ, তাহা রূপ ও গুণ এই উভয় মিশ্রিত। রূপ ও সমাবেশ যদি এ পৃথিবীতে অসম্ভব হইত, তবে এই পৃথিবীতে অনেক ফুলেরই সৃষ্টি হইত না। ঐ গোলাপ ফুলটি দেখিতে যেমন রূপবতী, গন্ধযুক্ত বলিয়া ওটি তেমি গুণবতী। নবীনা যে রূপবতী তাহা প্রবীণা নিজের মুখে স্বীকার করিয়াছে। এখন রূপবতী ও গুণবতী হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ কি?

আবার দেখুন, রূপই প্রধান গুণ বলিতে হইবে; কারণ তাহার পরিচয় দিবার জন্য কিছুই কষ্ট করিতে হয় না; যে একবার দেখে, সেই মোহিত হইয়া যায়। কিন্তু এক জনের গুণের পরিচয় সহজে পাওয়া যায় না, তাহার জন্য সময়, যত্ন, কষ্ট স্বীকার আবশ্যক হয়। প্রবীনার রূপের পরিচয় আমার দিতে হইবে না, নিজেই তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তবে তাহার গুণের পরিচয় দিবার ভার আমার উপর আছে, ক্রমে তাহা প্রকাশ পাইবে।

প্রবীণার প্রথম নালিশ তাহার স্বামীর বিপক্ষে। যদিও এ নালিশের জবাব আমায় দিবার আবশ্যক নাই; কিন্তু পরামর্শচ্ছলে তাহাকে দুই এক কথা বলিব। আমরা তাহাদের মতন হিংসুকে নহি, আমরা আজ কালের নভেল পড়িয়াছি। শত্রুকে পর্য্যন্ত ভাল বাসিতে জানি; আমাদের স্বামীর মুখে আমরা প্রায়ই আত্মবিসর্জ্জনের কথা শুনিতে পাই, সুতরাং আমাদের উন্নত হৃদয়ের অধিক পরিচয় দেওয়া এ স্থলে অনাবশ্যক। প্রবীণা এইরূপ সতী যে স্বামীর নাম মুখে না আনিয়া তাঁহাকে পোড়ারমুখো বলিয়াছে; যিনি আমাদের একমাত্র প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, গায়ের গহনা, তাঁহাকে পোড়ারমুখো বলিতে হয়? যাহাকে নাটক নবেল পড়িয়া পর্য্যন্ত প্রাণেশ্বর, জীবিতেশ্বর, প্রাণনাথ, বলিয়া ডাকিয়াও আশা মেটে না, এ হেন স্বামীরত্নকে কি "পোড়ারমুখ" বলিতে হয়? "সীতার বনবাস" পড়া শেষ করিয়া পর্য্যন্ত যাহাকে আর্য্যপুত্র, অঙ্গনাহৃদয়রঞ্জন বলিয়া আমরা ডাকিয়া থাকি, তাহার প্রতি কি এইরূপ ব্যবহার! তাহার নালিশের কারণ, সে এখন স্বামীর নিকট পূর্ব্বের ন্যায় আদর পায় না; কিন্তু এ নালিশ করিবার অর্থ আমি কিছুইত বুঝিলাম না; এ নালিশে যে ডিক্রি পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই তাহা কি আমায় বলিয়া দিতে হইবে? আদর পাইবার উপযুক্ত হইলেই আদর পাইয়া থাকে। আর এক কথা, যখন যে অবস্থা হয় সকলের তখন সেই অবস্থাতেই সন্তোষ থাকা উচিত—এ কথা আমরা বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া জানিয়াছি। আজ যে ফুলটি যত্নের সহিত লোকে দেবদেবীর মস্তকে রাখিয়া দেয়, কাল বাসি হইলে সে ফুল সে স্থান থেকে আবার আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিয়া থাকে। আমি বলি, যখন আদরের সময় ছিল, তখন আদরও ছিল, এখন আব কেন?

আবার প্রবীণার ১০।১৫ বৎসর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর প্রতি কিরূপ ভালবাসার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা তাহারা মিন্সেকে "নারকেল মুড়ী" ব্যবস্থাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। নাটক পড়িতে শেখা অবধি শিলেক যাহাকে দেখিতে না পাইলে পতন ও মূর্চ্ছা হয়, তাহাকে কি না "নারকেল মুড়ি" মারিতে চায়? গোপনে বিষ খাওয়াইয়া স্বামীকে মারার কথা বরং নাটকে পড়িয়াছি, কিন্তু দশ জনের সম্মুখে প্রবীণার ন্যায় স্বামীকে "নারিকেল মুড়ী" মারাত কোন নাটকেই পড়ি নাই।

প্রবীণার দ্বিতীয় নালিশ আমাদের বিপক্ষে। তাহার কারণ আমরা প্রবীণার বেশভূষা করিতে দেখিলেই হাসি ঠাট্টা আরম্ভ করিয়া থাকি। আচ্ছা, যে লোক জাল করে, তাহার কি শাস্তি হওয়া উচিত? আপনি কল্পনার সম্পাদক, একজন যদি আপনার সংকার আপনার বেশভূষা পরিয়া কল্পনার সম্পাদক বলিয়া সকলকে পরিচয় দেয়, তাহা হইলে আপনি তাহাকে কি করেন? আদর করেন, না তাহাকে দূর করিয়া দেন? সেইরূপ একজন প্রবীণা যদি নবীনার বেশভূষা পরিয়া জাল নবীনা সাজে তবে আমাদের তাহাকে কি করিতে ইচ্ছা করে? বেঙ্গল থিয়েটারের প্রমীলার ন্যায় অঙ্গভঙ্গি করিয়া—"রাবণ শ্বশুর মোর, মেঘনাদ স্বামী আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে" বলিতে পারি না কি? দেখুন আমরা লেখা পড়া শিখিয়া তাহাদের অপেক্ষা সভ্য হইয়াছি, সেই জন্য কোঁন্দল না করিয়া সে বিষয় লইয়া হাসি ঠাট্টা করিয়া কেবল আমোদ করিয়া থাকি। আমাদের অপরাধ এই যে আমরা তাহাদের অপরাধের ক্ষমা করিয়া থাকি!!

তাহার পর কয় খানা গহনার কথা লইয়া প্রবীনা আমাদের অনেক কথা বলিয়াছে। কিন্তু এই গহনার কথা পাড়াতে আমারও এক নালিশের কথা মনে পড়িয়া গেল, সে নালিশ আমার শ্বশুরের বিপক্ষে। শ্বশুর মহাশয় আমার জীবিতেশ্বরকে যে অর্থ ব্যয় করিয়া লেখা পড়া শিখাইয়াছেন, তাহা যদি লেখা পড়া শেখানতে খরচ না করিয়া গহনা গড়াইয়া দিতেন, তাহা হইলে প্রাণেশ্বরকে গহনার দাম দিতে না পারায় স্বর্ণকারের নিকট প্রতিদিন অপমানিত হইতে হইত না।

আমাদের বিপক্ষে প্রবীণার গায়ের জ্বালার কারণ, আমরা তাহাকে

চারিগাছা মল, নোলক কিম্বা চন্দ্রহার পরিতে দেখিলে ঠাট্টা করিয়া থাকি। আমার বোধ হয় কেবল ঠাট্টা না করে, যদি মাথায় ঘোল ঢেলে গ্রামের বাহির করিয়া দিতাম, তাহা হইলেই ভাল হইত। কিন্তু এখন ইংরাজের রাজত্ব, আর আমরা ও এখন লেখা পড়া শিখিয়া সভ্য হইয়াছি, সুতরাং সে সকল জঘন্য কার্য্য করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। আমার এক ওডিকলং (আমরা এখন আতর, গোলাপ পাতান ছাড়িয়া ওডিকলং, পোমেটম, ল্যাভেণ্ডার পাতিয়া থাকি) বলেন ঘোল না ঢালিয়া বরং নাক কান কাটীয়া দিলে ভাল হয়। সম্পাদক মহাশয়, একটা পুরাতন এঁদো বাড়ি, যদি ল্যাজারস্ ও অস্লারের বাড়ি থেকে ভাল ভাল ফর্নিচার আনিয়া কেহ সাজায়, তবে লোকে তাহাকে কি বলে? ঠাট্টা করে, না সে সাজান দেখিয়া সুখ্যাতি করে? তাঁহার আত্মীয়েরা তাহাকে তাহার ভালর জন্যে পাগ্লা গারদে দিতে ব্যবস্থা কারে না কি? এখন বলুন দেখি, প্রবীণার ঐ সকল গহনা পরা আর, পুরাতন এঁদো ঘরে ভাল ফর্নিচার দিয়ে সাজান এই দুই এক নয় কি? আমি বলি, ইহাদিগকেও পাগ্লা গারদে দেওয়া উচিত।

প্রবীণা তাহার পর তাহার লেখা পড়ার পরিচয় দিয়াছে, সে পরিচয়ে জানা গেল, যে প্রবীণা দাতাকর্ণ, কালিবিলাস, রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়াছে। সে এই সকল বই পড়িয়া এত বিদ্বান হইয়াছে, যে সে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী। দাতাকর্ণ, রামায়ণ পড়া কি স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য? প্রবীণা যদি বিদ্যাসুন্দর, গোলেবকায়লী, বঙ্কিম বাবুর ও রমেশ বাবুর নবেল, দীনবন্ধু ও মাইকেলের নাটক পড়িত, তাহা হইলে সে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী কখনই হইত না। সে যদিও কোন কোন নাটক ও নবেলে ঠোকর মারিয়াছে কিন্তু কেবল ঠোকর মারিলে লেখা পড়া শেখা হয় না। আমরা এখনকার নাটক ও নবেল থেকে বাছিয়া বাছিয়া প্রায় অনেক স্থান মুখস্থই করিয়া রাখিয়াছি, আর তাহাতে যে সকল গান আছে, তাহাত আমাদের সমস্ত মুখস্থই আছে। বিশ্বাস না করেন, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন, আজ কাল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগের পুরুষদিগের ন্যায় পরীক্ষা না হইয়া কেবল নাটক ও নবেলের পরীক্ষা হইলে, আমার মতে

ভাল হয়; আমাদের এই সকল পড়ায় এত আটা যে সংসারের কোন কাজ না করিয়া সমস্ত দিন শুইয়া শুইয়া বই দেখিয়া থাকি, পরিশ্রম কত অধিক করিতে হয়, তাহার প্রমাণ আমরা বসিয়া পড়িতে পারি না। লেখা পড়া শেখা অনেক কষ্টে হইয়া থাকে, এ কথা আমরা শিশুবোধ পড়িয়া জানিয়াছি। প্রবীণার ন্যায় কোন্দল করিয়া বেড়াইলে, আর সংসারের কাজ কর্ম্ম করিলে (যেমন কুট্‌নো কোটা, বাট্‌না বাটা ইত্যাদি) লেখা পড়া সেখা হয় না। তাই প্রবীণা বলে "স্ত্রী শিক্ষা যত শীঘ্র উঠিয়া যায় তত মঙ্গল।"

"চন্দ্রশেখরে" আর "মাধবীকঙ্কণে" বালক বালিকার প্রেম দেখিয়া প্রবীণা হাড়ে হাড়ে চটিয়াছে। মাগীর আশপদ্দার কথা শুনিয়া আমি অবাক হইয়াছি; প্রেম বালক বালিকায় হয় না, তবে কি প্রেম হয় কেবল বুড়ো মাগী আর ধেড়ে মিন্সিতে!

এখন প্রবীণার নালিশের আমি জবার দাখিল করিলাম, ভরশা করি আপনি রায় শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ করিবেন। আপনার গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই বিচার করিলে অবিচার হইবে না। মনে থাকে যেন, আমি আপনার বিচারার্থিণী।

নবীনা।

হিন্দু পর্য্যটক।

দেশ পর্য্যটনে যে বিশেষ উপকার হয়, তাহা সকল সভ্য জাতিই স্বীকার করিয়া থাকেন। ভিন্ন দেশে গিয়া ভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে যে জ্ঞান ও নীতি শিক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার সহিত অন্য কোনরূপ শিক্ষার তুলনা হইতে পারে না। হিন্দু এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতির এইরূপ বিশ্বাস যে প্রাচীন হিন্দুরা এই উপকারের বিষয় উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কোন হিন্দু রাজার বিদেশ জয়ের বিষয় কিম্বা কোন হিন্দুপর্য্যটকের বিদেশ ভ্রমণের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। হিন্দুরাজাগণ বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে কেবল আপনার দেশ রক্ষা করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহার প্রতিশোধের জন্য শত্রুদেশ আক্রমণ করেন নাই। হিন্দু দণ্ড-বিধি আইনে

সমুদ্রপারে নির্ব্বাসন দণ্ডের কোন উল্লেখ নাই। হিন্দু সাহিত্যে কি স্থলে কি জলে এমন কোন ভ্রমণ-বিবরণ পুস্তক নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে তত্রাচ একটীও হিন্দুপর্য্যটকের নাম শুনিতে পাওয়া যায় নাই। হিন্দু-দিগের সমুদ্র-যুদ্ধের কথা কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে কলম্বস্ বা ড্রেক্ ছিল না। কোন হিন্দুকাব্যে ভীষণ সমুদ্র মধ্যে উত্তাল তরঙ্গমালার আন্দোলিত অর্ণবপোত-জলমগ্ন-বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং কোন হিন্দু কবি জেসন কিম্বা ইউলিসেসের ন্যায় নায়ক পান নাই।

এখন এই সকল কথা সত্য কি না তাহা জানিবার উপায় কি? এই সকল বিষয়ের সত্যাসত্য জানিতে হইলে ইতিহাস অনুসন্ধান করা উচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই হিন্দুদিগের লিখিত প্রকৃত ইতিহাস একখানিও নাই। এলফিনষ্টোন, মিল প্রভৃতি যে কয় মহাত্মা ভারতের ইতিহাস সাগর মন্থন করিয়াছেন, তাহার ফল কি হইয়াছে এবং তাঁহাদের বর্ণিত কোন্ কোন্ বিষয় কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা ঐতিহাসিক পাঠকের অবিদিত নাই। প্রাচীন হিন্দুদিগের লিখিত ইতিহাস ছিল, ইহা আমাদের যেরূপ বিশ্বাস, প্রাচীন হিন্দুগণ দেশ পর্য্যটন করিতেন এ বিশ্বাসও আমাদের সেইরূপ। ভারতের কোন ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার করিতে হইলে, অনেক পরিশ্রম ও অনুসন্ধান আবশ্যক করে, সেই জন্য এই বিষয়ে সাধারণের সেরূপ উৎসাহ নাই। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি Asiatic Society এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই বিষয়ে অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছেন। আমরা Asiatic Society's Journal, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ফেবরারি মাসের Calcutta Review এবং হিন্দুদিগের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অবলম্বন করিয়া এই প্রস্তাব লিখিলাম, প্রাচীন হিন্দুগণ যে বিদেশ পর্য্যটনপ্রিয় ছিল না, সাধারণের এইরূপ কুসংস্কার আছে, তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ দেখাইয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে আমরা এই প্রস্তাবে চেষ্টা করিব।

প্রাচীন হিন্দুদিগের বিষয় কোন কথা জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বেদ অনুসন্ধান করা উচিত। বেদের মধ্যে ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থ পৃথিবীর কোন দেশে পাওয়া যায় না। এই ঋগ্বেদে সেই সময়ের প্রাচীন হিন্দুদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্তের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহারই এক স্থানে সমুদ্রের বর্ণনা

আছে, এবং বণিকগণ লাভের আশায় ভীষণ সমুদ্রে আপনাপন অর্ণবপোত ভাসাইতেছেন। * অন্য এক স্থলে এইরূপ বর্ণিত আছে। † তুগ্র নামে কোন নৃপতি তাঁহার দ্বীপবাসী শত্রুদিগের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাদিগের বিপক্ষে বহু সংখ্যক সৈন্য সহিত আপন পুত্র ভুজ্যকে এক অর্ণবপোতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অধিক দূর যাইতে না যাইতে রাজকুমারের রণতরী ভীষণ ঝটিকায় জলমগ্ন হয়। তিনি দৈবানুগ্রহে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই অর্ণবপোতের এক শত দাঁড় ছিল। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, বৈদিক সময়ে হিন্দুগণ কেবল সমুদ্র ভ্রমণ করিতে পারিত এরূপ নহে, তাঁহারা সুন্দর অর্ণবপোত নির্ম্মাণেও সক্ষম ছিলেন।

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, যে খৃষ্ট জন্মাইবার দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে বেদ লিখিত হইয়াছে। এখন ফিনিসিয়েন্সেরা প্রথমে জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া, তাহারা আজও জগতের নিকট সেই জন্য গৌরবান্বিত হইতেছে। কিন্তু যখন বেদের সময় ও হিন্দুরা জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে জানিত, তখন কেন যে সেই গৌরবলাভ হিন্দুগণের অদৃষ্টে ঘটে নাই, তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না। যদিও এখন রাজপুত্র ভুজ্যের কোথায় জাহাজমগ্ন হইয়াছিল, এবং কোন্ দ্বীপের বিপক্ষে তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই, তত্রাচ ইহা যে আরবসাগরের কোন অংশে হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদের পর মনুসংহিতা। মনুসংহিতায় জলপথে ও স্থলপথে বহির্বাণিজ্যার্থে অর্থ কর্জ্জ দিলে শুদের নিয়ম লিখিত আছে। এই শুদের নিয়ম যাহারা নির্দ্ধারিত করিতেন, তাঁহারা সমুদ্রেও বিদেশ ভ্রমণে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন সুতরাং মনুর সময় সমুদ্রে ও বিদেশে যে বহির্বাণিজ্য চলিত, তাহার আর সন্দেহ নাই। ‡ পণ্ডিতগণের মতে মনুর সময় খৃষ্ট জন্মাইবার নয় শত

---

* ঋগ্বেদ। ১ম অষ্টক, ১০ম্ অনুভক, ২১ বর্গ, ৮ শুক্ত দেখ।

† ঋগ্বেদ। ১ম অষ্টক, ৭ অনুভক, ৮ বর্গ ১ শুক্ত দেখ।

‡ As the word used in the original for *sea* is not applicable to any inland waters, the fact may be considered as established that the Hindoos navigated the ocean as early as the age of the code.

ELPHINSTONE'S HISTORY OF INDIA.

বৎসর পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। হিন্দুগণ ঋগ্বেদের সময় হইতে মনুর সময় পর্য্যন্ত যে সমুদ্র পথে ভিন্ন দেশে যাতায়ত করিত, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

রামায়ণেও যে লঙ্কাদ্বীপ আক্রমণের বিষয় বর্ণিত আছে, ভাবিতে গেলে তাহাও সামান্য ঘটনা নয়। কোথায় অযোধ্যা আর কোথায় লঙ্কা! জের্নোফন্ Xenophon দশ সহস্র সৈন্য লইয়া যে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া গ্রীস্ ইতিহাসে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, ইহা তাহার সহিত তুলনায়ও ন্যূন নহে। মহাভারতেও যে সমুদ্র মন্থনের কথা লেখা আছে, তাহাতেও ঐ সময়ের হিন্দুগণের সমুদ্র যে বিশেষ পরিচিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আবার রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, গান্ধারী গন্ধর রাজার দুহিতা; গন্ধর বর্ত্তমান কান্দাহার। যখন হস্তিনাপুরের (বর্ত্তমান দিল্লী) রাজা কান্দাহারের রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন যে মহাভারতের সময় হিন্দুগণ দূরদেশে যাতায়াত করিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কাম্বোজার (বর্ত্তমান হিন্দুকুশ) রাজা আসিয়াও তাঁহাকে সম্মান করিয়াছিলেন। পুরাণেও ঋষিগণ উত্তরকুরু ও উপমেরুতে তীর্থযাত্রায় যাইতেন এইরূপ উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ দুই স্থানের বর্ত্তমান নাম পামর Pamer এবং মার্ভ (Merv); এই স্থল হইতেই আর্য্যগণ ভারতে আসিয়াছিলেন এইরূপে অনুমান হয়; আরো ভান্স কেনিডি সাহেব বলেন মার্কণ্ড মুনি হইতে বর্ত্তমান সমারকাণ্ড Samarcand নাম হইয়াছে। *

এখন বেদ, মনু, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি সকলেই হিন্দুদিগের সমুদ্র ও বিদেশ ভ্রমণের সাক্ষ্য দিতেছে, তবে এই অমূলক দোষারোগ কোথা হইতে আসিল? হিন্দুদিগের তবে এই কলঙ্ক কেন? তাহাদের সকল প্রচীন গ্রন্থে এই বিষয়ে যথেষ্ঠ প্রমাণ থাকিলে ও এখনকার হিন্দুগণ কেন স্বীকার করেন, যে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কখন জাহাজে উঠেন নাই, কিম্বা ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া কোন ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন নাই? আবার আমাদের দেশের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বলেন যে জাহাজে উঠিলে কিম্বা

* Vide Asiatic Society's Journal.)

ভিন্ন দেশে যাইলে জাতি যায়। হিন্দুর জাতি যদি এতই অপদার্থ হয়, তবে সে জাতি যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাউক। এই সকল কথা ভাবিতে আমাদের বড় লজ্জা বোধ হয়। এখন অন্যান্য দেশের ইতিহাসে এই বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেছে কি না দেখা যাউক।

হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থ ছাড়িয়া পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্য জাতির ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে হইলে মিশর ব্যাবিলন্ গ্রিস্ এবং রোমের ইতিহাস অনুসন্ধান করা উচিত। মিশর দেশের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া আমরা জানিতে পারি, যে তাহারা প্রায় সমস্ত বিষয়েই হিন্দুদিগের নিকট ঋণী। মিশরবাসীর বর্ণভেদ, আচার ব্যবহার, প্রায় সমস্তই হিন্দুদিগের বর্ণভেদ আচার, ব্যবহারের সহিত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরবাসীরাও হিন্দুদিগের ন্যায় চারিবর্ণে বিভক্ত। সেখানেও মেষপালকেরা ভারতের শুদ্র জাতির ন্যায় উচ্চ বর্ণের জাতির নিকট নানা প্রকার অত্যাচার সহ্য করিত। এক জন ব্যাবিলনবাসী পণ্ডিতও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, যে পারস্য উপসাগর পার হইয়া আসিয়া এক জাতি তাহাদিগকে বর্ণমালা ও নানাপ্রকার শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা দান করিয়াছিল। এখন এই জাতি হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি হইতে পারে না, কারণ সে সময় অন্য কোন জাতি ঐ সকল বিষয়ে পারদর্শী ছিল না, এমন কি কি আরববাসীর নামও কেহ তখন জানিতে পারে নাই।

ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্যাবিলনবাসীরা প্রথমে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে এবং রং করিতে শিক্ষা করে। আমাদের দেশের ঢাকা নগরের ন্যায় বহুকাল পর্য্যন্ত তাহাদের ইউফ্রেটিস্ তীরবর্ত্তী এরিচ্ নগর ইহার জন্য বিখ্যাত ছিল। এই নগর হইতে বস্ত্র যাইয়া রোম নগরে বহু মূল্যে বিক্রীত হইত। এক দিন রাজা প্লিনি ইহা দেখিয়াই সেমিরামিসবাসীদিগকে ইহার আবিষ্কার কর্ত্তা আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা সকলেই জানেন যে টাইগ্রিস্ কিম্বা ইউফ্রেটিস নদীর উপকূলের কোন দেশে এখনকার ন্যায় পূর্ব্বেও তুলা জন্মায় না; তবে এই তুলা ইহারা কোথায় পাইত? এই সকল তুলা যে ভারত ভূমিজাত তাহার আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না; কারণ বহুকাল পূর্ব্ব হইতে কেবল ভারতেই

তুলার চাস হইয়া আসিতেছে। হিন্দুবণিকেরা এই তুলা লইয়া গিয়া তথায় বিক্রয় করিয়া আসিত, এবং ইহাও অসম্ভব নহে যে এই সকল বণিকদিগের নিকট হইতেই ইহারা বস্ত্র প্রস্তুত ও রং করা শিক্ষা করিয়াছে।

তাহার পর গ্রীক-ইতিহাসে এই সমন্ধে কিরূপ লেখা আছে দেখা যাউক। বিদ্যালয়ের বালকেরা পর্য্যন্ত জানে, যে মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারত জয় করিতে আসিয়া যখন ফিরিয়া যান, তাঁহার সঙ্গে ক্যালানস্ নামক এক জন ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষ হইতে গিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ পথি মধ্যে পীড়িত হইলে বিজাতীয় ঔষধ সেবন না করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে আপনার জীবন আহুতি দান করিয়াছিলেন। গ্রীকগণ ধর্ম্মের জন্য এইরূপ আত্মবিসর্জ্জন কখন চক্ষে দেখে নাই; সুতরাং এই দৃশ্য তাহাদের চক্ষে বড় আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। আলেকজান্দার যতদূর সম্ভব এই ব্রাহ্মণের সম্মান করিয়াছিলেন।*

গ্রীক ইতিহাসবেত্তারা হিন্দুদিগের মধ্যে নাবিক এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দুসমাজ তখন ইহাদের আবশ্যকতা বিশেষ-রূপ বুঝিত, সেই জন্য হিন্দু সমাজে তাহাদের সম্মানও ছিল। ইহা ব্যতিত চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব সময় গ্রীকদূত ম্যাগাস্থিনিসের আগমনের কথা উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক দূত বিদায় হইবার পর চন্দ্রগুপ্তও সেলুকসের সম্মানের জন্য এক জন দূত এবং তাঁহার সহিত অনেক বহু মূল্য উপহার পাঠাইয়া দিয়া ছিলেন।

খ্রীষ্ট জন্মাইবার সাত শত বৎসর পূর্ব্বে রোম নগরে ও হিন্দু ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। † রোমানদিগের অনেক সুবর্ণ মুদ্রা দক্ষিণভারতে পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল মুদ্রা মাটিতে পোতা ছিল, ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাহা

---

* হিন্দু ব্রাহ্মণের ক্যালানস্ Calanus নাম কোথা হইতে হইল আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। অন্যান্য নামের ন্যায় গ্রীক ইতিহাসবেত্তারা এই নামেরও গোল করিয়াছেন। কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন, এই ব্রাহ্মণ গ্রীকদিগকে "কল্যাণীয়" বলিয়া ডাকিতেন, সেই জন্য গ্রীকেরা তাঁহার এইরূপ নাম রাখিয়াছিলেন।

† According to Isaiah there were diviners soothsayers in Syria and Palestine, from byond the East that is to say, from byond Per-

ক্যানানোর নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে পাওয়া গিয়াছিল। ঐ সকল মুদ্রার অধিকাংশ অগষ্টাস্ এবং টাইবিরিয়স্ সম্রাটের সময়ের, এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। ভারতের সহিত রোমনগরের যদি কোন সম্পর্ক না থাকিত, তাহা হইলে এই সকল মুদ্রা কখনই ভারতে আসিত না। *

খৃষ্ট জন্মাইবার পর নিরোর রাজত্বকালে রোমে অনেক হিন্দুজ্যোতিসবিদ বাস করিতেন, এক সময়ে সম্রাট বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে রাজধানী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক রোমবাসী ও ভারতে জ্যোতিষ বিদ্যা শিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। লঙ্কা দ্বীপ হইতেও এক জন দূত রোমে ক্লডিয়াস সম্রাটে নিকট গিয়াছিলেন।

আরব্য দেশের অনেক স্থানের পুরাতন নাম সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন। ইহাতে এক প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে যে তথায় হিন্দুগণ প্রাচীন কালে বাস করিতেন, কারণ তাহা না হইলে সংস্কৃত নাম তাহারা কোথা হইতে পাইল?

খৃষ্ট জন্মাইবার ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে এক সময়ে কলিঙ্গ হইতে বহু সংখ্যক হিন্দু জাহাজে করিয়া বঙ্গসাগরে যাইতেছিল, তাহারা কোথায় কি উদ্দেশে যাইতেছিল তাহা জানা যায় নাই। ঘটনাক্রমে তাহাদের জাহাজ ভারত-সমুদ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহারা জম্বু দ্বীপে (Java) উঠিয়াছিলেন। ঐ দ্বীপ সম্পূর্ণ বাসোপযোগী দেখিয়া তাহারা স্বদেশের মায়া ত্যাগ করিয়া সেই খানেই বসতি করেন। তাহাদের সহবাসে ঐ দ্বীপবাসীরা ক্রমে সভ্য হয়। জম্বু দ্বীপ যে হিন্দুদিগের একটি উপনিবেশ, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ঐ দ্বীপে অনেক খোদিত প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভাষা সংস্কৃতমূলক। চীন পর্য্যটক ফা হিয়ান যখন এই দ্বীপ পর্য্যটন করেন, তখন সমস্ত হিন্দুজাতির বসতি দেখিয়াছিলেন। এক জন জম্বু কবি মহাভারতের ঘটনা অবলম্বন করিয়া মহাভারতে উক্ত দেশ ও নগরের এমন কি নাম পর্য্যন্ত অবিকল রাখিয়া এক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ঐ দ্বীপে যে সকল মহাদেব, সূর্য্য এবং

---

sia, and of course from India, 700 years before Christ; and these long after found their way to Rome.————Colonel Wilford

* Vide "remarks on lately discovered Roman Gold coins near Cannanore." Asiatic Society's Journal Vol. XXI. 1881.

অন্যান্য দেব দেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল, সে সকল এখনও কলিকাতা মিউসিয়মে রহিয়াছে। চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ঐ দ্বীপ মুসলমানেরা অধিকার করে, এবং দ্বীপবাসীদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে ইহা যে হিন্দুদিগের একটি উপনিবেশ ছিল তাহা নিশ্চয় কথা। জম্বুদ্বীপের ন্যায় আরও অনেক স্থলে প্রাচীন হিন্দুদিগের অনেক কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল বিষয়ে হিন্দুপর্য্যটকদিগের সম্বন্ধে অনেক জানিবার কথা আছে। সে সব কথা পরে বলিতেছি।

(ক্রমশঃ)

বিশ্বাস ও নীতি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া আচার্য্য এক দিন বলিয়াছিলেন—"শরীর সম্বন্ধে চক্ষু যেমন আত্মা সম্বন্ধে বিশ্বাস সেইরূপ*।" এই বিশাল বিশ্বশোভা, এই ভূলোকে গিরিনদীনির্ঝরিণীর অসীম সৌন্দর্য্য রাশি, দ্যুলোকে অনন্ত আকাশের অনন্ত নীলিমা এ সকল কিছুরই অস্তিত্ব উপলব্ধি হইত না যদি মানুষের চক্ষু না থাকিত, তেমনি জড়জগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগতে মানুষ যদি বিশ্বাসের চক্ষু মেলিয়া দেখিতে না পারে তাহার নিকট কোন সত্য, কোন শাসনশৃঙ্খলা, জীবনের কোন উদ্দেশ্যই পরিলক্ষিত হয় না। মনুষ্য-জীবন অন্ধকারে পরিণত হইত, যদি তাহার হৃদয়ে বিশ্বাস আসিয়া স্থান না পাইত। এ কার্য্যক্ষেত্রের সকল আড়ম্বর আর পরিদৃষ্ট হইত না, ধনোপার্জ্জন ও দান ধ্যানের সকল ব্যাপার বিলুপ্ত হইত, জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া পড়িত, উৎসাহ, ও উদ্যম ও সকল চেষ্টা নির্ব্বাণ হইয়া যাইত, এ জীবজগৎ জড়জগতে পরিণত হইত, মানুষ যদি বিশ্বাসের চক্ষু চাহিয়া একবার আপনার পানে তাকাইয়া দেখিতে না পারিত। 'আছি'

---

* আচার্য্যের উপদেশ ১৭ পৃষ্ঠা দেখ।

এই একটু বিশ্বাস আছে বলিয়াই তুমি আমি আছি, এই বিশ্বাসের জন্যই শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, আহার নাই নিদ্রা নাই, সংসারক্ষেত্রে অহোরাত্র ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছি। চুরি করি, ডাকাইতি করি, সকলি এই বিশ্বাসটুকুর জন্য। যেখানে এই বিশ্বাসের শেষ, সেখানেই অস্তিত্বের পূর্ণবিরাম। ধর্ম্মভাব বল, আর সামাজিক ভাব বল, বিশ্বাস সকলের মূলভিত্তি।* যে কারণে ইংরাজ মেরিপুত্রের নাম গাহিয়া বেড়ান, যে কারণে ব্রাহ্ম উপাসনাগৃহে বসিয়া নিমীলিতনয়নে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' উচ্চারণ করেন, যে কারণে মুসলমান কোরাণধর্ম্মের মূলমন্ত্র পড়াইবার জন্য তরবারির সাহায্য গ্রহণ করে, সেই কারণেই হিন্দু মৃৎপিণ্ড ও শিলাখণ্ডের নিকট বলি দিয়া আনন্দ উল্লাসে আপনার ইষ্টদেবতার পূজা করে। যে অবস্থায় পড়িয়া যে সম্প্রদায় যে রূপ কার্য্য করে তাহা সকলি বিশ্বাসের জন্য।

যাহার যে রূপ বিশ্বাস, সে সেই রূপই কার্য্য করিয়া থাকে, সেই রূপ নীতির অনুবর্ত্তন করে। বিশ্বাস নীতির প্রবর্ত্তক। যে সমাজে যেরূপ বিশ্বাসের প্রাদুর্ভাব, সে সমাজে সেইরূপ নীতির প্রচলন। সেই জন্যই আমরা যখন কোনও সমাজে কোনও প্রকার বিশ্বাস বা সেই বিশ্বাস-প্রসূত নীতির প্রবর্ত্তনা দেখি, তখন বুঝি, ঐ বিশ্বাস ও ঐ নীতি সে সমাজের অবশ্য উপযোগী। উপযোগী না হইলে তাহা কখনই প্রচলিত হইত না। অগস্তকোমৎ এই মতের অনুমোদন করেন।† ঐ মতকে অগ্রাহ্য করিবার কারণ বা যুক্তি আমরা দেখিতে পাই না। সমাজে যখন যে রূপ বিশ্বাস প্রবেশ করিয়াছে তখন সেইরূপ নীতিরই প্রবর্ত্তনা হইয়াছে। বিশ্বাস না হইলে সে নীতির প্রচার হইত না। প্রথম যখন সমাজের আদিম অবস্থায় মানুষ একা একা থাকিত তখন ইহার নীতি এক প্রকার ছিল, তার পর যখন

* Religion is to each individual according to the inward light with which he is endowed.

Buckle

† Adhering to our relative, in opposition to the absolute view, we must conclude the social state regarded as a whole, to have been as perfect, in each period as the co-existing condition of humanity and of its environment would allow.

Auguste Comte

সমাজের সহিত সকলের স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন অন্য প্রকার নীতির সূত্রপাত আরম্ভ হইল। পরের দ্রব্য অপহরণ করিলে যে দোষ জন্মে ইহা সৃষ্টির আদিম অবস্থায় কেহ জানিত না, ঋগ্বেদের সঙ্গে সঙ্গে লোক ইহা জানিল। ঋকবেদ ইহাকে দোষ বলিয়া দিল, আর কোন ব্যবস্থা করিল না। তার পর মনু আসিয়া ব্যবহারশাস্ত্রে ইহার শাসনের কথা বলিয়া দিলেন। ক্রমে নীতির বাঁধন বাড়িতে লাগিল। কিন্তু এই নীতির পূর্ব্বে মানুষের মনে যদি ইহার উপযোগী বিশ্বাসের সঞ্চার না হইত তাহা হইলে কখনই আমরা ইহাকে মান্য করিতাম না। বিশ্বাস আমাদিগকে বলিয়া দেয় তাহাই আমরা ইহাকে নীতি বলিয়া মান্য করি। বিশ্বাস নীতির প্রবর্ত্তক।

সুতরাং সমাজে যদি নীতির উপযোগিতা দেখি, তাহা হইলে অবশ্যই বিশ্বাসের ও উপযোগিতা স্বীকার করিব। বিশ্বাস উপযোগী না হইলে তাহা হইতে কখনই সে প্রকার নীতির সৃষ্টি হইতে পারিত না। কেহ কখন জানিয়া শুনিয়া মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না। এ জন্য আমরা অগষ্ট কোমতের মতের কথা উল্লেখ করিয়াছি, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হর্বার্ট স্পেন্সর ও ইহার সম্পূর্ণ পোষকতা করেন।* যে সমাজে যখন যে রূপ নৈতিক উন্নতি বা অবনতি হইয়াছে তাহা তাহার বিশ্বাসের উন্নতি বা অবনতির জন্য। কিন্তু নীতির উন্নতি সময়েও যেমন উন্নতির উপযোগী বিশ্বাস ছিল, নীতির অবনতির সময়েও সেই অবনতির উপযোগী বিশ্বাস ছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বিশ্বাস ছাড়া নীতির প্রসরণ নাই। ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীরা বাল্যকাল অবধি যেরূপ শিক্ষা ও সংসর্গ লাভ করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের পক্ষে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা বা পুরোহিতকে অর্থ দান করিলে কি মন্ত্র তন্ত্র পাঠ করিলে অথবা লোকবিশেষের শরণ লইলে মুক্তির উপায় হইতে পারে এই রূপ বিশ্বাস যেমন তাহাদের সম্প্রদায়ে এক রূপ নীতির অবতারণা করিয়াছে, সেই রূপ আবার প্রোটেষ্টান্ট মতাবলম্বীরা যীশুমাত্র ভজনা ব্যতিরেকে মুক্তির

---

* Speaking generally, the religiou current in each age and among each people has been as near an approximation to the truth as it was then and there possible for men to receive."

Herbert Spencer's First Principles P. 116.

অন্য উপায় নাই এই বিশ্বাস অন্য প্রকার নীতির সূত্র বিস্তার করিয়াছে। একই খ্রীষ্টধর্ম, কিন্তু বিশ্বাসভেদে নীতির কত ভিন্নতা! আবার যখন এই খ্রীষ্টধর্মে ড্রুইড্‌দিগের প্রভুত্ব ছিল তখন যা ইহাতে কি ভিন্ন প্রকার নীতির ক্রীড়া দেখা দিয়াছিল! মানুষ যেমন শৈশব অবস্থায় যে বিশ্বাস অনুসরণ করে তাহা শৈশবাবস্থার উপযোগী, আবার প্রৌঢ়াবস্থায় যে বিশ্বাসের অনুবর্ত্তন করে তাহা প্রৌঢ়াবস্থার উপযোগী, সেইরূপ, সমাজের অসভ্য, অর্দ্ধ সভ্য বা পূর্ণ সভ্যাবস্থায় সচরাচর যে যে বিশ্বাসের ও বিশ্বাস-প্রসূত নীতির বিকাশ দেখা যায় তাহা সেই সেই অবস্থার উপযোগী ইহা সকলেই স্বীকার করেন। এ মত সম্বন্ধে আমরা পণ্ডিতদিগের যুক্তির কথা বলিয়াছি। স্পেন্সর আরও বলেন, যে অবস্থায় যে বিশ্বাস বিকাশ পায় সে অবস্থায় তাহা সে সমাজের অবশ্য উপযোগী ইহা তো নিশ্চয় কথা, কারণ, যে যখন যাহা বিশ্বাস করে, তখন তাহা সত্যমূলক বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া থাকে। আবার যত লোকে যে পরিমাণে সেই বিশ্বাস হইতে শান্তি লাভ করে, সেই পরিমাণে ঐ বিশ্বাস তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। *

এখন কথা হইতেছে কি, লোকের মনে যখন যে প্রকার বিশ্বাসের উদয় হইবে, তখনই কি তাহা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানিতে হইবে? তাহা মানিতে কে বলিতেছে? এ সংসারে আসিয়া কয়জনে একেবারে কোনও বিষয়ে অভ্রান্ত সত্য জ্ঞাত হইতে পারিয়াছে? যেমন যুগের পর যুগের পরিবর্ত্তন হইতেছে, তেমনি বিশ্বাসের পর বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন হইতেছে। কবি (Pope) সহস্র উপহাস করিয়া বলুন—

> We think our fathers fools so wise we growr
> Our wise sons will as well think us so.

কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। এখনকার লোকেরা যাহা বিশ্বাস

* The presumption that any current opinon is not wholly false, gains in strength according to the number of its adherents. * * * We must admit that the convictions entertained by many minds in common are the most likely to have some foundation.

Herbert Spencer.

করে, পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা হয়তঃ তাহা বিশ্বাস করিত না. আবার পরবর্ত্তী লোকের বিশ্বাস হয়তঃ স্বতন্ত্র প্রকার হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ইহা কিছু বিস্ময়ের কথা নহে। এই জন্যই প্রসিদ্ধ দার্শনিক বকল্ (Buckle) যে বলেন, নীতির উন্নতি অবনতি নাই, যাহা নীতি তাহা চিরদিনই একই প্রকার নীতি থাকিবে, এ মতে আমরা আস্থা দেখাইতে পারি না। মহর্ষি শ্বেত-কেতুর পূর্ব্বে সতীত্বের গৌরব ছিল না, যে সে ইচ্ছা করিলে অপরের স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হইতে পারিত, ইহার বিরুদ্ধে তখন কাহারও কিছু বিশ্বাস ছিল না। পরস্ত্রীহরণ যে মহাপাপ তখন সে নীতির প্রচার ছিল না, কিন্তু শ্বেতকেতুর হৃদয়ে যখন ইহার জন্য বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন ঘটিল, তখন এ সম্বন্ধে নীতির পরিবর্ত্তন হইল। অরণ্য মধ্যে পাণ্ডবজননী কুন্তী তাঁহার পুত্রদিগকে বলিলেন "আজ তোমরা ভিক্ষায় যাহা পাইয়াছ তাহা পাঁচ জনে বাঁটিয়া লও" অমনি পাঁচ ভাই মিলিয়া একটি কন্যাকে এককালে বিবাহ করিল, ইহার প্রতিকূলে তাহাদের হৃদয়ে কোনও বিশ্বাস স্থান পাইল না, এক মাতৃ-আদেশ পালন উহারা দেবোচিত কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিল। কিন্তু আজ কাল এ প্রকার বিশ্বাস স্থান পায় না। এখনকার বিশ্বাস অনুযায়ী নীতি-জ্ঞান অন্য প্রকার দাঁড়াইয়াছে। এখনকার নীতির মতে পুত্রের বিবাহাদি বিষয়ে পিতামাতার হস্তক্ষেপ করিয়া অনধিকার চর্চ্চা করিবার কোনও অধিকার নাই। এক সময়ে বিশ্বাস মতে রামচন্দ্র প্রজারঞ্জন রাজার পরমধর্ম্ম বিবেচনায় নিরপরাধিনী জানকীরে বনে দিয়াছিলেন, আজিকার বিশ্বাস এ জন্য রামচন্দ্রকে এক জন মহামূর্খ বলিয়া প্রতিপন্ন করে। বিশ্বাস যে একেবারে অভ্রান্ত সত্যমূলক হইয়া বিকাশ পাইবে তাহা নহে, তবে যখন উদয় হয় তখন সেই অবস্থার উপযোগী।

মানুষের বিশ্বাস যেমন মানুষের অবস্থার উপযোগী বলিয়া স্বীকার করিলাম, তেমনি উপযুক্ত বিশ্বাসে উপযুক্ত নীতির প্রাদুর্ভাব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিব। সুতরাং নীতির পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। বিশ্বাসের সংস্কারই নীতির সংস্কার। যেখানে এ নিয়মের ব্যত্যয় হইয়াছে সেখানেই অনর্থ ঘটিয়াছে। অসাময়িক সংস্কারচেষ্টার জন্যই ফ্রান্স ও জর্ম্মাণিতে সংস্কারকগণ স্বাধীনতা প্রচার করিতে গিয়া পরাধীনতাকে অধিক-

তর বদ্ধমূল করিয়াছেন, উপধর্ম্মকে লোপ করিতে গিয়া তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়মূল করিয়া ফেলিয়াছিলেন।* স্পেনের ইতিহাসের দিকে চাহিয়া দেখ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বুর্বন জাতিরা স্পেন রাজ্যে যে অন্ধকারের পর আলোক আনিয়াছিল, বুর্বনজাতির সঙ্গে সঙ্গে সে আলোকের নির্ব্বাণ হইলে উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারকগণ অশেষ চেষ্টা করিয়াও আর তাহা একবারও জ্বালাইতে পারিল না, যতবার ফুৎকার দিল, ততবারই তাহা ধুমাইয়া ধুমাইয়া নিবিয়া গেল। স্পেনের যে দুরবস্থা সেই দুরবস্থাই রহিয়া গিয়াছে। ইহা কেন ঘটিল? আর নেপোলিয়ন বা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসিস্ রাজ্যে অত অল্পে কেমন করিয়া একনায়কত্ব স্থাপন করিলেন? ফ্রান্স তাহাকে বাধা দিতে পারিল না কেন? পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ চানিং এ প্রশ্নের বেশ উত্তর দিয়াছেন।† বাস্তবিক, যতক্ষণ না লোকের হৃদয়ের বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হয়, ততক্ষণ নীতির সংস্কার হয় না। সংস্কারকের সহস্র চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। কিন্তু পক্ষান্তরে, লোকের হৃদয়ের বিশ্বাস যদি কালক্রমে আপনা আপনি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা হইলে বুঝি, সংস্কারের জন্য সংস্কারকেরও আবশ্যক হয় না। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের বিশ্বাসেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। পরিবর্ত্তনের স্রোতঃ কখনই অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না। তবে কোনও একটা সংস্কারের জন্য সংস্কারকের বিশেষ আবশ্যকতা কেন স্বীকার করিব? আজ একজনে যাহা করিল, আর না হয় দু দিন পরে আর একজন যে তাহা করিতে পারিত না, এ কথার অর্থ নাই। লুথারের অভ্যুদয় না হইলে ইউরোপে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের প্রচার হইত না, এ কথা যিনি বলেন, তাঁহার সহিত আমাদের মতের ঐক্য নাই। লুথার না জন্মিলেও বুঝি কালে ক্যাথলিক ধর্ম্ম আরও ভাল করিয়া পরিশুদ্ধ

---

* Thus for instance, in France and Germany, it is the friends of freedom who have strengthened tyranny, it is the enemies of superstition who have made superstition more permanent.

Vide, Buckle's History of Civilization.

† France failed through the want of that moral preparation for liberty without which the blessing cannot be secured. She was not ripe for the good she sought.

Channing

ও খাঁটি হইয়া দাঁড়াইত, এবং সত্য সকল আরও সুচারু রূপে লোকের অন্ধ হৃদয় মধ্যে জ্যোতিঃ বিস্তার করিত। মহামনস্বী বিজ্ঞান-গুরু ব্যক্তিরা নিঃশঙ্কচিত্তে এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।*

তাই বলিতেছি, যদি সংস্কারের ইচ্ছা থাকে, সর্ব্বাগ্রে নীতির উপর হস্তক্ষেপ করিও না, তাহা হইলে বিফল হইতে হইবে, অগ্রে নীতির মূল বিশ্বাসকে পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা পাইও। একটীবার মাত্র বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন ঘটিলে যাহা ঘটিবে, তুমি সহস্র চেষ্টা পাইলেও তাহা হইবে না। যাহার যেমন জ্ঞান, যে যেমন ধারণা করিতে পারে, তাহাকে সেই রূপ শিক্ষা দিলে ফল ফলিতে পারে, নচেৎ যে ব্যক্তি অঙ্ক গণনা করিতে জানে না, তাহাকে জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বিশ্বাসের পরিবর্ত্তনই যে সকল নৈতিক উন্নতির মূল, এ কথা আজ আমি একা বলিতেছি না, মহা মহা পণ্ডিতদিগের মতের কথা বলিয়াছি, আবার মিল ও ইহার অনুমোদন করিয়াছেন।†
বাস্তবিক, বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন ভিন্ন নীতির পরিবর্ত্তন নাই।

---

* Learned Protestants of Germany have even believed, that the overthrow of Popish error and establishment of purer truth would have been brought about more equally and profoundly, if Luther had never lived, and the passions of the vulgar had never been stimulated against the externals of Romanism.

Newman's Phases of Faith.

† Every considerable change historically known to us in the condition of any portion of mankind, when not brought about by external force, has been preceded by a change of proportional extent in the state of their knowledge or in their prevelant beliefs. * * The order of human progression in all respect will mainly depend on the order of progression in the intellectual convictions of mankind, that is, on the law of the successive transformations of human opinions.

Mill's Logic.

গমের চাস।

লোকে কথায় বলিয়া থাকে, বাঙ্গালার মাটিতে সোণা ফলে। কথাটিতে বেশ সার আছে, যে ইহা বলিয়াছে সে বাঙ্গালার মাটির গুণ জানে। জানে, বাঙ্গালার মাটি কত উর্ব্বরাশক্তি ধারণ করে। বাঙ্গালচাষীরা অন্যান্যস্থলের চাষীদিগের অপেক্ষা এজন্য অনেক সৌভাগ্যবান। ফসল করিবার জন্য অন্যান্য চাষীদিগের অপেক্ষা ইহাদিগকে অতি অল্পই খাটিতে হয়। ইয়ুরোপ আমেরিকাপ্রভৃতি উন্নতস্থলের চাষ করিবার যন্ত্রসকল দেখ, আর তাহাদের সহিত বাঙ্গালার চাষীদিগের যন্ত্র সকল তুলনা কর, প্রভেদ অনেকটা বুঝা যাইবে। বাঙ্গালার যন্ত্র সকল অতি সামান্যভাবে নির্ম্মিত, কিন্তু সেই সামান্য যন্ত্রেরই পরশে ভারতের ভূমি আপনার অকঠিন হৃদয় খুলিয়া অনন্ত স্বর্ণভাণ্ডার বিলাইয়া থাকে। ফসল উৎপন্ন করিবার জন্য অন্যান্য স্থলের চাষীদিগের ন্যায় বাঙ্গালার চাষীদিগকে তত আয়াস পাইতে হয় না। কেহ বলিবেন, তবে বাঙ্গালার কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থা এত মন্দ কেন? মন্দ হইবার অন্য কারণ আছে। অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, মূষিক শলভের দৌরাত্ম্য আছে, জমিদার মহাজনদিগের পাপদৃষ্টি আছে। বাঙ্গালার কৃষকদিগের যে হাড়ে দূর্ব্বা গজায়, ইহাই তাহার কারণ। বাঙ্গালায় জমির কোনও দোষ নাই। ইহাতে তত পাট করিতে হয় না, অথচ যাহা বুনিবে তাহাই ফলিবে। ইংরাজরা বাঙ্গালার মাটির এই সব গুণ দেখিয়াই তো লোভ সামলাইতে পারিল না, অমনি কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া চা ও নীলের চাষ আরম্ভ করিল। কেমন মাটির গুণ! নিতান্ত বিদেশীয় জিনিস হইলেও তাহাই বিনা ওজরে ফলিতেছে। তবে লোকে কেন না বলিবে, বাঙ্গালার মাটিতে সোণা ফলে? বঙ্গমাতাকে রত্নপ্রসবিনী বলিলে বাঙ্গালির সুখ্যাতি করা হয় না, তাহাতে বাঙ্গালার মাটির সুখ্যাতি করা হয়। বৎসর বৎসর বিদেশের আমদানী দ্রব্যে কত টাকা এ দেশ হইতে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। তবে, আজও বাঙ্গালী যে পেটে খাইতে পায়, সে কেবল বাঙ্গালার মাটির গুণে।

ইংরাজদের কথা যদি পড়িয়াছে, তবে আরও কিছু বলিতে হইল। তাঁহারা আজ কাল লোলদৃষ্টে কেবল বাঙ্গালার মাটির পানে চাহিতেছেন। কেবল খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, কোথায় কি ফসল ভাল জন্মায়, কোথায় চাস আবাদ অতি সহজে হইতে পারে। ইংরাজদের দেশ তেমন উর্ব্বর নয়, সেখানে কোনও জিনিষের চাস করিতে গেলে অনেক কষ্ট পাইতে হয়, অথচ ফসল তত ভাল হয় না, তাই ইংরাজেরা দেশ বিদেশ ঘুঁটিয়া চাসের উপযুক্ত মাটি দেখিয়া বেড়াইতেছে। ইংরাজ যেখানে মাটির একটু উর্ব্বরতা বুঝিতেছে সেখানেই আপনাদের চাস আবাদ করিতেছে। দার্জ্জিলিঙের পাহাড়ের উপরও ইংরাজ চা বুনিতে ছাড়ে নাই। যে স্থলের মাটি আঁচ্‌ড়াইয়া গোটাকতক দানা ছড়াইলেই ফসল হয়, ইংরাজ সে স্থলে চাস করিতে ছাড়িবে কেন? তবে এক কথা, ইংরাজেরা চা ও নীলের চাস আরম্ভ করিয়াছে, বুঝি, ধেনো জমির উপর আর কিছু করিবে না। কিন্তু তাই বা কেমন করিয়া বুঝিব? ইংরাজ বাঙ্গালার মাটি ও তাহার উপযুক্ত ফসলের গুণ বুঝিয়াছে। ইহারই মধ্যে আখের চাসের উপর তাহার নজর পড়িয়াছে, সরকারি কাগজে পর্য্যন্ত রিপোর্ট রিজোলিউসন বাহির হইতেছে। তা ছাড়া, অনেক ইংরাজ পোস্তা ঢেঁড়ির চাস ধরিয়াছে। ইংরাজ যে আর আমাদিগকে কিছু করিয়া খাইতে দেয়, তাহার উপায় দেখি না।

উপায় হয়, যদি গভর্ণমেণ্ট একটু মনোযোগ করেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট স্বজাতির পক্ষপাতী, তাঁহারা আমাদের দুঃখের কান্না শুনেন না। স্বজাতির জন্য—স্বার্থের জন্য অস্থিমাত্রাবশিষ্ট ভারতের শোণিত পর্য্যন্ত শুষিতে তাঁহারা কৃতসংকল্প। কিন্তু তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না, যে গাছের ডালে বসিয়া সুখে কালযাপন করিতেছেন, সেই গাছেরই গুঁড়ি ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ভারতের আছে কি? বাজারের সকল জিনিষই তো ইংরাজেরা একচেটিয়া করিয়া বসিয়াছেন, ভারতের আছে কি? ভারত গভর্ণমেণ্ট আয় ব্যয়ের তালিকা বাহির করেন, তাহাতে ব্যয়ের অঙ্ক দেখিয়া মাঝে মাঝে শীহরিয়া উঠেন, মাঝে মাঝে ব্যয় কমাইতে সংকল্প করেন। ব্যয় কমান হয় কি প্রকারে? কতকগুলি ক্ষুদ্রপ্রাণ কেরাণী মারিয়া। গভর্ণমেণ্ট যে পেট-মোটা জাতিভায়াদের প্রতি দেখিয়াও দেখেন না আমরা সে জন্য

কিছু বলিতেছি না, কিন্তু এই কথা বলি, কতকগুলি গরিব কেরাণীর হাতের গ্রাস কাড়িয়া না লইয়া ব্যয়ের উপযুক্ত আয় যাহাতে হইতে পারে তাহার উপায় চেষ্টা করিলে কি হয় না? তাঁহাদের জাতিভায়ারা আপনাদের দেশের জিনিষ আনিয়া এ দেশের সকল টাকাটা দুই হাতে লুটিয়া লইয়া যাইতেছেন আবার কি এ দেশের জমির উপর ও হস্তক্ষেপ করিতে ছাড়িবেন না? গভর্ণমেণ্ট ভারতের জন্য ব্যয় দেখিয়া শীহরিয়া উঠেন, কিন্তু যে উপায়ে এ ব্যয়ের উপযুক্ত আয় হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয় গভর্ণমেণ্ট এ কথা বুঝিয়া ও বুঝেন না।

গভর্ণমেণ্ট বুঝেন না, ইংরাজেরা বুঝিতে চায় না, কিন্তু সকল ইংরাজ সমান নহে। অনেক দিন হইতে বিখ্যাত সম্পাদকশ্রেষ্ঠ রবার্ট নাইট এ বিষয়ে বুঝিয়া অনেক কথা বলিতেছেন। তিনি জানেন—কেনা জানে?—ভারতের মাটির কাছে কোনও দেশের মাটি উর্ব্বরতায় সমান নহে, ভারত যদি কখনও পশ্চাত্য জাতির সহিত যুঝিতে পারে, তাহা তাহার মাটির জোরে। তাই রবার্ট নাইট ভাবিয়া চিন্তিয়া কি করিয়াছেন, ভারতে যদি গমের চাস হয়, আর সেই সমস্ত উৎপন্ন গম যদি বিলাতে পাঠান হয়, তাহা হইলে ভারত অনেকটা আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইতে পারে। এক দিকে ইংলণ্ড যেমন নানা শিল্পদ্রব্য পাঠাইয়া ভারতের টাকা লইয়া যাইতেছে, তেমনি অন্য দিকে ভারত তাহার গম পাঠাইয়া ইংলণ্ডের নিকট হইতে টাকা আনিতে পারিবে। এরূপ হিসাবে তাহার শূন্য ভাণ্ডার অনেকাংশে পুরণ হইতে পারে। বিলাতে গমের খরচ বেশী, প্রত্যহ রুটীর জন্য স্তুপাকারে গমের আবশ্যক। কিন্তু যেমন আবশ্যক, বিলাতে তেমন পরিমাণে গম জন্মে না। ভারতের মাটীতে গম বেশ জন্মাইতে পারে, একটু চাস দিলেই বৎসর বৎসর রাশি রাশি গম বিলাতে পাঠান যায়। বিলাতে ইহার বড় দরকার, সেখানকার বাজারে ইহা দরে বিক্রিত হইতে পারে। সুতরাং ভারত আমদানিবাণিজ্যে যেমন হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে তেমনি আবার রপ্তানিবাণিজ্যে আপনার অবস্থা অনেকটা ভাল করিয়া লইতে পারে। নাইট সাহেব যে কথা বলিয়াছেন তাহা আমাদের অনেক উপকারের বটে।

ঠিক্ এই রবার্ট নাইটের কথার মত সম্প্রতি একখানি সুন্দর পুস্তকে * এই সকল বিষয় বিশেষ চিন্তার সহিত লিখিত হইয়াছে। সে পুস্তক খানি ভারতবাসীমাত্রেরই পাঠ করা উচিত। আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, গভর্ণমেণ্ট যদি একবার ইহার মতানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, নিশ্চয়, ভারতের যে সকল দেশে অন্ন বিনা হাহাকার উঠিতেছে, আর দশ বৎসর পরে সে সব দেশের অবস্থা বদলাইয়া যাইবে। ভারতের সহিত বৃটনের সেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে শীঘ্রই এই গমের বাণিজ্যে ভারত আপনাকে অনেক লাভবান্ করিতে পারিবে। আরও বিশেষ, ভারতের আবার অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালার মাটির যেমন চমৎকার গুণ বাঙ্গালা বোধ হয় অতি অল্পেই আপনার দুঃখের দশা অনেকটা শোধরাইয়া লইতে পারিবে। কথাটা নিতান্ত কল্পনার বিষয় নহে।

যে পুস্তক খানির কথা বলিলাম, তাহাতে লিখিত আছে, খৃষ্টীয় ১৮৮১ শকে ইংলণ্ডে সর্ব্বসমেত ৫৭০৪২৬৬৯ হান্দর গম ৩১৪৬৮৮০৪০ টাকায় আমদানী হইয়াছিল, ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে মাত্র ৩৮২৬৮৫১০ টাকার গম গিয়াছিল। হিসাব করিলে অতি যৎসামান্য মাত্র, আট ভাগের একভাগ। কিন্তু ভারত ইহা অপেক্ষা আরও কি কিছু বেশী পরিমাণে পাঠাইতে পারিত না? পারিবে না কেন? উঠিয়া পড়িয়া চাস করিলেই পারিত। বড় সুখের কথা, ভারত পূর্ব্বাপেক্ষা এখন এই চাসের উপকারিতা বুঝিয়াছে, পূর্ব্বাপেক্ষা আজকাল ইহাতে গমের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে	২১৯৫৭৫০ হান্দর জন্মিয়াছিল	
১৮৮১ ,,	৭৪৪৪৪৪৯ ,,	,,
১৮৮২ ,,	১৯৮৬৩৭২০ ,,	,,

—এই তিন বৎসর মধ্যে ভারত এই চাসে যে উন্নতি দেখাইয়াছে তাহা আশাপ্রদ। বৎসরে ইংলণ্ডে সর্ব্বসমেত ৬৬০০০০০০ হান্দর গম আমদানী হইয়া থাকে, ভারত সেই আমদানির মধ্যে অর্দ্ধেকের ও বেশি পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারিয়াছে। ইহা কিছু কম উন্নতির কথা নহে।

---

*The influence on English trade and American protection by the development of India.

সেই জন্যই বলিতেছিলাম, গবর্ণমেণ্ট যদি একটু মনোযোগ করেন, যদি গরিব প্রজাদের জন্য এই চাসের একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন, তাহা হইলে বোধ হয় অতি অল্প দিনের মধ্যেই ভারত ইংলণ্ডে গমের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া ফেলিতে পারিবে। অল্প দিনের মধ্যেই বোধ হয় ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সকে গমের বস্তা সকল লইয়া ইংলণ্ডের বাজার হইতে আটলাণ্টিক পার হইয়া পথ চিন্তিতে হইবে। ইউনাইটেড ষ্টেটস যে ভারতের কাছে পরাস্ত হইবে ইহা নিশ্চয় কথা। ইংলণ্ডের বাজারে ভারতের গমের আদর বেশী। ডাক্তার ওয়াটসন বলেন, ভারতের গম আমেরিকা কি অষ্ট্রেলিয়া সকল স্থানাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহা যেমন কোমল ও পরিষ্কার তেমনি শুভ্র এবং সুস্বাদু। British Trade Journal বলেন, ভারতের ময়দায় অনেক পরিমাণে জল খায়, ইহার রুটি বেশ ফুলিয়া উঠে, এবং ইংরাজেরা এই কারণে ইহা বড় পছন্দ করেন। বিলাতের অনেক কলওয়ালা মহাজন শতকরা ৫০ মণ ভারতের গম, ৪০ মণ আমেরিকার গম এবং ১০ মণ ড্যানজিকের গম ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফল কথা, বিলাতের বাজারে ভারতবর্ষীয় গমের আদর যে বড় বেশী ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তবে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স হারিবে না কেন?

হারিবার আরও কারণ আছে। ইউনাইটেড ষ্টেটসে গম চাস করিবার খরচা অনেক বেশী, ভারতে অনেক কম। ইউনাইটেড ষ্টেটসে যত জায়গা চাস করিতে ৬ টাকা ৬৷৷০ টাকা পড়িবে, ভারতে তাহা ৩ টাকা ৩৷৷০ টাকায় হইবে। এরূপ কম খরচা পড়িবার কারণ আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্যান্য সকল স্থান অপেক্ষা এখানকার মাটি বড় উর্ব্বর, এখানকার মাটি আঁচড়াইয়া যাহা বুনিবে তাহাই চাস হইবে। কিন্তু আমেরিকা প্রভৃতি স্থলের মাটি তেমন নয়, ভারতের এককুড়া ভূমি চষিতে যে পরিশ্রম লাগিবে আমেরিকার সে এককুড়া ভূমিতে তাহার চতুর্গুণ পরিশ্রম আবশ্যক করে। আরও বিশেষ, এখানকার পরিশ্রমের বেতন অপেক্ষা অন্যস্থলের পরিশ্রমের বেতন অনেক গুণে বেশি। এখানে এক টাকায় যে পরিশ্রম পাওয়া যায়, অন্যত্র তাহার জন্য তিন টাকা না দিলে চলে না। ভারতবর্ষের মজুরদিগের বেতন অতি যৎসামান্য মাত্র। সুতরাং মাটি এবং মজুরি যদি কম খরচায় হয়

তাহা হইলে ফসলও অবশ্যই কম খরচায় হইবে। তবে ইউনাইটেড ষ্টেট্স হারিবে না কেন?

হারিবার আরও কারণ আছে। দুই দেশের খুজরা বিক্রয়ের দর ধর। কানপুর লুধিয়ানা এবং জব্বলপুরে যাহা ৭৷৹ টাকা কি ১১ টাকার বেশি হয় না, আমেরিকায় তাহার দর ১৬ টাকা। আমেরিকার বাজার অপেক্ষা ভারতবর্ষের বাজার অনেক গুণে সস্তা। সস্তা যে হইবে ইহা নিশ্চয় কথা। যেখানে যে জিনিষ অল্পে জন্মায়, সেখানে সে জিনিষের যে দর, যেখানে যে জিনিষ অনেক পরিশ্রমে উৎপন্ন হয় সেখানে সে জিনিষের দর পূর্ব্বস্থান অপেক্ষা যে বেশি হইবে তাহা কে না স্বীকার করিবে? তবে আমেরিকায় যদি গমের দর ভারতবর্ষ অপেক্ষা এত বেশি হয়, মহাজনেরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া কেন আমেরিকায় যাইবে? ভারতবর্ষের গমের দাম কম, অথচ তাহা থাইতে ভাল। অনেকে বলিবেন, ভারতের গম সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, এই জন্যই বিলাতের বাজারে অন্যান্য স্থলের গমের অপেক্ষা ভারতের গমের দর কম। কথাটা মিথ্যা নয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের বাজারে দর এইরূপ গিয়াছে—

গম——প্রতিকোয়াটারে

অষ্ট্রেলিয়ান————৫০ পাউণ্ড

আমেরিকান————৪৮ ঐ

কলিকাতা (ক্লব নং ১)—৪৩ ঐ

স্বীকার করি, কলিকাতার গমের দর সর্ব্বাপেক্ষা কম গিয়াছে, কিন্তু কলিকাতার গম যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহা স্বীকার করি না। কলিকাতার গমের দোষ এই যে, তাহাতে বড় ধুলা, বালি ও অন্যান্য ধান্য মিশ্রিত থাকে। এরূপ মিশ্রিত হইবারও কারণ আছে। এখনকার এক ক্ষেতে গম ও ধান দুই জন্মায়, চাষী তাহার এক ক্ষেতের অর্দ্ধেক গম বুনে; অন্য অর্দ্ধেক ধান বুনে, কাজেই শেষ গম ও ধানে মিশাইয়া যায়। এখানে গমের না কি তেমন চাস নাই তাই এরূপ হইয়া পড়ে। গমের যদি স্বতন্ত্র চাস হয়, ধানের যেমন স্বতন্ত্র ক্ষেত থাকে তেমনি যদি গমের স্বতন্ত্র ক্ষেত থাকে তাহা হইলে এমন মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এখানকার গমের দরও বাজারে বেশ দাঁড়াইতে পারে।

গমের দর কম গিয়াছে বলিয়া গম মন্দ নয়। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে ডাক্তার ওয়াটস্‌নের মতের কথা বলিয়াছি। তাই বলিতেছিলাম, ভারতবর্ষের গমের দর কম, অথচ তাহা খাইতে ভাল, এমন সুবিধা ছাড়িয়া মহাজনেরা বেশি দর দিয়া আমেরিকা হইতে তাহাপেক্ষা নিকৃষ্ট গম লইতে যাইবে কেন? তবে যে মহাজনেরা আমেরিকার গম লইতে যায় তাহারা কারণ, তাহাদের আবশ্যকমত সকল সময় ভারত হইতে তাহারা গম পায় না, ভারতে তত গম জন্মে না, কাজেই আমেরিকার গম লইতে বাধ্য হয়। তাহা না হইলে ভারত থাকিতে বোধ হয় আমেরিকার গম কাটিত না।

তবে এক কথা আছে—জাহাজ ভাড়া। আমেরিকা হইতে মাত্র আটলাণ্টিক পার হইলেই বিলাতে আসিয়া পড়া যায়। কিন্তু ভারত হইতে তেমন সুবিধা নাই। কোথায় আরব সাগর, ভূমধ্যসাগর, কত নদ নদী, সাগর মহাসাগর ভাসিয়া ভাসিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া তবে ইংলিষ চ্যানালে আসিয়া পৌছিতে হইবে। ওদিকে প্রশান্ত মহাসাগর দিয়া আসিতে হইলে সেও বড় কম ঘুর নয়। অনেক পথ, অনেক খরচ। এ হিসাবে আমেরিকার সুবিধা আছে। নিউ ইয়র্ক হইতে লণ্ডনে লইয়া যাইতে হইলে যাহার ভাড়া ২ টাকা কি ২॥০ টাকা পড়িবে, ভারতবর্ষ হইতে সে জিনিষ লইয়া যাইতে হইলে ৪ টাকার কমে কোনও মতে হইবে না। কাজেই ভারতকে ভাড়া সম্বন্ধে আমেরিকার নিকটে অনেকটা খর্ব্বতা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হউক; ভাড়া বেশি পড়ে বলিয়া পীছরিয়া উঠা কর্ত্তব্য নয়। যদি সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া চলা যায়, ভারতে আমেরিকা অপেক্ষা খরচা অনেক কম পড়িবে। কেন পড়িবে তাহাও বলিতেছি।

মোট হিসাব ধর। প্রথমে বলিয়াছি, আমেরিকায় যাহার দর ৬ টাকা ৬॥০ টাকা, এখানে তাহা ৩ টাকা ৩॥০ মাত্র; তার পর বলিয়াছি, আমেরিকায় যাহার ভাড়া ২ টাকা ২॥০ টাকা, এখানে তাহার ভাড়া ৪ টাকা। এখন মোট হিসাবে কি দাঁড়াইল, খতাইয়া দেখ। আমেরিকায় যে গম ভাড়া সমেত ৮ টাকা কি ৯ টাকা পড়িবে, ভারতে তাহা ভাড়া সমেত ৭ টাকা কি ৭॥০ টাকা পড়িবে। তবু ১ টাকা ১॥০ টাকার সাশ্রয়। তবে কেন

ভাড়ার হিসাব দেখিয়াই আতঙ্কে শীহরিয়া উঠিব? ব্যবসা করিতে গেলে সকল দিক্ খতাইয়া দেখা কর্ত্তব্য; কিন্তু খতাইয়া দেখা যাইতেছে, ভারতে আমেরিকা অপেক্ষা অনেক সুবিধা।

সুবিধা আরও হয়, যদি রপ্তানিবাণিজ্যের শুল্ক উঠিয়া যায়। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ভারতে অবাধ বাণিজ্যের সূত্র বিস্তার করিতেছেন, কত লোকে কত প্রশংসার কথা কহিতেছে; কিন্তু আমাদের বোধ হয় ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট প্রশংসার কাজ করেন নাই। ইংরাজ আজ ভারতক্ষেত্রে যে অবাধ বাণিজ্যের ক্রীড়া দেখাইতেছেন তাহাকে আমরা অবাধবাণিজ্য বলিতে কুণ্ঠিত হই। সে তো স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতিতার অন্যতর অভিনয়। ল্যাঙ্কাসায়ারের স্বার্থের জন্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট আমদানী শুল্ক উঠাইয়া দিলেন, কিন্তু রপ্তানি শুল্কের উপর হাতও পড়িল না। বাহিরের লোকেরা যাহাতে ভারতের কাণা কড়িটা পর্য্যন্ত লুটিয়া লইয়া যাইতে পারে তাহার পথ প্রশস্ত হইল, কিন্তু ভারত যাহাতে বাহির হইতে দু পয়সা আনিয়া খাইতে পারিবে তাহার পথ সেই সমান বন্ধ রহিল। ইহাকে আমরা অবাধবাণিজ্য বলি না। তবে শুনিতে পাই, ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে সমুদয়ে ধান চাল লইয়া যাইবার মাশুল কতকটা কমাইবার জন্য ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট একটু যত্নপর হইয়াছেন। সংবাদ যদি সত্য হয়, অনেকটা মন্দের ভাল বটে। কিন্তু রপ্তানিশুল্ক যত দিন না উঠিয়া যাইতেছে, তত দিন আমরা অবাধ বাণিজ্যের প্রশস্ত নীতি বুঝিতে পারিতেছি না। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি করিলে আমরা যে সুবিধার কথা বলিতেছিলাম তাহা সহজেই সিদ্ধ হইবে।

এখন শেষ কথা এই, যাহাতে এখানে গমের চাস আরম্ভ হয় তাহা করা কর্ত্তব্য। রাজস্বসচিব মেজর বেয়ারিং এ সম্বন্ধে বজেটে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলের মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। অযোধ্যা মধ্যভারত, বোম্বাই, বেরার, বেহার এবং বাঙ্গালা সকল প্রদেশেই গম জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু যাহা জন্মায় তাহা অতি সামান্য মাত্র। এই সকল প্রদেশে যাহাতে কৃষীরা গমের চাসে প্রবৃত্ত হয় এই বেলা হইতে তাহার উপায় দেখা উচিত। সকল স্থান অপেক্ষা অমরা বাঙ্গলার সম্বন্ধে আগে বলিতেছি। বাঙ্গালার জমির গুণের বিষয় বলিয়াছি—তাহা ছেলে বুড়ো

কে না জানে?—বাঙ্গালায় ইহার চাস করিলে বেশ ফসল হইবার সম্ভাবনা, তাহা যে হইবে ইহা নিশ্চয় কথা। গম জন্মাইলেই টাকা আসিবে, তাহা কাটাইবার জন্য ভাবিতে হইবে না, বিলাতের দোকানদারেরা তাহা লুফিয়া লইবে। দেখাইয়াছি, এখানকার গম ভাল, অথচ দর সস্তা পড়িবে, সুতরাং অবশ্যই অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকা ছাড়িয়া খরিদ্দার আগে এই দিকে ঝুঁকিবে। তবে আর দেরি করা উচিত নয়, বাঙ্গালা এবার পাটের চাসে অনেক লোক-সান দিয়াছে—বোধ হয় অনেক চাষী এ বৎসর তাহা আর করিবে না, অনেকে কিসে হাত দিবে তাহা ভাবিয়া আকুল হইবে, আমরা আগাগোড়া লাভ লোকসানের সকল কথা খুলিয়া লিখিলাম, এই বেলা সকলে গমের চাসে প্রবৃত্ত হউন। লোকসানের কোন ভয় নাই। লাভ নিশ্চিত কথা।

আজকাল ভারতে যে গম জন্মিতেছে তাহা অতি যৎসামান্য মাত্র। মেজর বেয়ারিং অনুমান করেন ২১০০০০০০ একার ভূমি গমের চাস হয়। কিন্তু ইহা অনুমান, ঠিক সত্য নহে। অথবা সত্য হইলেও ইহা হইতে যে বেশি আর হয় না তাহা নহে। পাঞ্জাব, ব্রহ্মদেশ, ও আসাম প্রভৃতি স্থানে অনেক জমি পতিত রহিয়াছে, তাহা পাট করিলে বেশ গমের ফসল হয়। বাঙ্গালায় অনেক জমি পড়িয়া থাকে, তাহাতে কেবল বাঁশ বাবলা জন্মে, কোন কোন জমি কেবল ঘাসে পূর্ণ থাকে, সে সব জমিতে চাস করিলে, প্রথম বৎসরে তত ভাল না হউক, দ্বিতীয় বৎসর হইতে বেশ সুজন্মা হইবে। তা ছাড়া লোকে যে সব জমিতে পাট বুনিত, এবার হইতে বোধ হয় সে সব জমি পড়িয়া থাকিবে, অথবা তাহাতে ধান বুনিবে। পাটের দর যে রূপ নরম গিয়াছে তাহাতে আর কেহ সে চাস করিতে সাহস করিবে না, সে সব জমিতে গমের চাস বেশ ভাল রূপ হইতে পারে। বাঙ্গালার জমির সম্বন্ধে আবার অনুমান কি? ইহার যেখানে যাহা বুনিবে সেখানে তাহাই ফসল হইবে। গমের চাসে বেশ দু পয়সা আয় আছে, তবে লোকে ইহার চাস করিবে না কিসের জন্য?

প্রেম প্রতিমা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উৎসবে।

আজ সপ্তমী-পূজা। রামগোপাল বাবুর বাড়ি আজ আনন্দ ও উৎসবে পরিপূর্ণ। অতি প্রত্যুষেই গ্রামের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা আজ এই খানে উপস্থিত, সকলেই এক একটি কার্য্যে ব্যস্ত। পূজা বাড়ি যেরূপ কোলাহল হওয়ার সম্ভব, এখানে তাহার কোন ত্রুটিই হইতেছিল না। বালক-বালিকাগণের কলহ ও রোদন, পাড়ার অকর্ম্মণ্য কর্ত্তৃপক্ষীয় লোকের গলাবাজি, যুবকদিগের উচ্চহাসি, রমণীগণের কোমল কণ্ঠবিনিঃসৃত কর্কশ বাক্-বিতণ্ডা এই সকল একেবারে সপ্তমে উঠিতেছিল, মধ্যে মধ্যে ঢাকের বাদ্য ইহাদের সাহায্য করিতেছিল। ইহা ব্যতিত আরো অনেক প্রকার কোলাহল উঠিতেছিল, কিন্তু তাহার বিস্তারিত বিবরণ এ স্থলে আবশ্যক বোধ হইতেছে না। দেখিতে দেখিতে পূজা আরম্ভ হইল, ধূপ ধূনার গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইল, তখন কর্ত্তৃপক্ষীয় পুরুষ ও অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের ভক্তির উদয় হইল, সকলে করযোড়ে প্রতিমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, গণেশজননীর চাঁদমুখ দেখিয়া অনেকে ভক্তিরসে গলিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইল, নিমন্ত্রিত লোকে বাড়ি পরিপূর্ণ হইল। এখন এই পরিবারের মধ্যে কে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইল দেখা যাউক।

কিরূপে নিয়মিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট পূজা শেষ হয়, তাহার জন্য কর্ত্তা ব্যক্তি ব্যস্ত। মধ্যে মধ্যে করযোড়ে গললগ্নকৃতবাস হইয়া "মা জগদম্বে" রবে গগন ফাটাইতেছেন। পূজার পর তাঁহার লক্ষ্য কেবল ব্রাহ্মণ-ভোজনের প্রতি। কিসে এখন ভোজন সুচারুরূপে শেষ হয়, তাহার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার মন উদ্বিগ্ন। পূজা আর ব্রাহ্মণভোজন ব্যতিত অন্য কোন বিষয়ে কর্ত্তার বড় মনোযোগ নাই।

জ্যেষ্ঠপুত্র মহেন্দ্র নাথ পিতার সন্তোষের জন্য তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু তাহার সে কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ ছিল না, কারণ রাত্রে যে এক সকের অপেরা হইবে, তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন। অপেরার আবতারদিগকে সন্তুষ্ট করা সাধারণ ব্যাপার নহে; কিসে তাহাতে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহার জন্য তিনি বিশেষ ভাবিত। তবে পূজা ও ব্রাহ্মণ-ভোজনের প্রতি অমনোযোগ করিলে পাছে কর্ত্তা অসন্তোষ হন, সেই জন্য এক একবার আসিয়া পিতার সম্মুখে ঐ সকল কার্য্য ও দর্শন করিতেছেন।

কনিষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্র নাথ নিমন্ত্রিত ও সমাগত সকল লোকের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। যে যেরূপ ব্যক্তি তাহার সেইরূপ সম্মান করিতেছেন। দরিদ্র লোকেও যাহাতে কোন রূপে অসন্তোষ না হয় তাহার প্রতিও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। উপেন্দ্রের একান্ত ইচ্ছা তিনি নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের দরিদ্র লোকদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত আহার করান। তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা এই যাহাতে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক না হইয়া কাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক হয়, এবং যাহাতে কাঙ্গালীর ভোজন ভাল রূপ হয়, সেই জন্য তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন।

ভ্রাতুষ্পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ প্রাণপণে উপেন্দ্রের সাহায্য করিতেছেন। বাস্তবিক সকল কার্য্যেই ধীরেন্দ্র উপেন্দ্রের ডান হাত স্বরূপ। উপেন্দ্র ইহা ব্যতিত আর একটি কার্য্যে ধীরেনকে নিযুক্ত করিয়াছেন। সে কার্য্য, যাহাতে কোন দ্রব্য নষ্ট বা অপব্যয় না হয় তাহার তদারক করা। ধীরেন্দ্রেরও একান্ত ইচ্ছা এই যাহাতে দুঃখী গরিব লোকের প্রতি কোন রূপ অসদ্ব্যবহার না হয়। অনেক পূজা বাড়িতে কেবল নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের প্রতি যত্ন করা হয়, কিন্তু দুঃখী গরিব লোকের প্রতি কেহই কোন রূপ যত্ন করেন না, বরং সময়ে সময়ে তাহাদের প্রতি বিশেষ অসদ্ব্যবহার করা হয়। উপেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র এরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না; যাহাতে সমাগত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সকলের প্রতি সমান যত্ন করা হয় তাহার প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

গৃহিনী ঠাকুরাণী কেবল ভাণ্ডার লইয়াই ব্যস্ত। অন্য কোন দিকে

মনোযোগ করিবার তাঁহার অবসর ছিল না। কিসে সমস্ত দ্রব্য প্রতুল হয় কিসে কেহ কোন দ্রব্য চুরি করিয়া না লইয়া যায় গৃহিনী এই সকল বিষয় লইয়াই একেবারে ব্যতিব্যস্ত। ইহা ব্যতিত চাকর চাকরাণীদিগকেও তাঁহাকে শাসন করিতে হইতেছে।

বড় বধূ আপনার শরীর অসুস্থ বলিয়া কোন কার্য্য করিতেছিল না, মধ্যে একবার পান সাজিতে বসিয়াছিল, কিন্তু সে গুরুতর পরিশ্রম কোন ক্রমেই তাঁহার সহ্য হইল না, সুতরাং তিনি আপনার আবশ্যক মত পানগুলি সাজিয়া লইয়া শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। শয়ন গৃহে অনেকক্ষণ বসিয়া বিরক্ত বোধ হওয়ায় তাহার একবার তাস খেলাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সঙ্গী মিলিল না বলিয়া তাহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। অমলা, বিমলা, সরলা, প্রভৃতি প্রতিবাসিনীদিগের মধ্যে তাহার যে সকল সঙ্গী ছিল, তাহারা সকলেই যদিও এই বাড়িতেই ছিল, কিন্তু আজ তাহাদের অবকাশ ছিল না, সকলেই কাজে ব্যস্ত। সুতরাং শশীকলার আজ ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।

প্রিয়ম্বদার আজ আর আনন্দের সীমা নাই; আজ প্রিয়ম্বদা যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, অন্দরমহলে স্বহস্তে দরিদ্র স্ত্রীলোকদিগকে যত্নের সহিত অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেছে। প্রাণসম পুত্র কন্যার কথা পর্য্যন্ত আজ তাহার মনে স্থান পায় নাই, গুরুতর পরিশ্রমেও আজ আর তাহার ক্লেশবোধ হইতেছে না। আজ আর প্রিয়ম্বদার ক্ষুধা তৃষ্ণা পর্য্যন্ত নাই। প্রিয়ম্বদার আজ আনন্দ কেন? প্রিয়ম্বদার আনন্দের কারণ, আজ সে মনের সাধ মিটাইয়া দুঃখীলোককে পরিতোষ করিয়া আহার করাইতেছে।

আর চপলা? সুখে যাহার সুখ বোধ নাই, দুঃখে যাহার কষ্ট বোধ নাই সেই সুখ দুঃখে স্থিরহৃদয়া অথচ গৃহ কার্য্যে ক্ষিপ্রহস্তা চপলা আজ কি করিতেছে? চপলা আজ যথার্থই চপলা, এক মুহূর্ত্তের জন্য এক স্থানে স্থির নাই, কখন রন্ধন কার্য্যের সহায়তা করিতেছে কখন বা রন্ধনের আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল আনিয়া দিতেছে, কখন বা প্রিয়ম্বদাকে সাহায্য করিতেছে; আবার কখন গৃহিনীর নিকট বিনা বা সামান্য দোষে তিরস্কার খাইতেছে; কিন্তু কিছুতেই তাহার মনে কোন রূপ কষ্ট হইতেছে না।

এই রূপে পূজার তিন দিবস কাটিল। তাহার পর বিজয়া। বিজয়া

বাঙ্গালীর ক্রন্দনের দিন। তিন দিন ধরিয়া পূজা করিয়া এই দিনে দেবী প্রতিমা তাহাদের বিসর্জ্জন দিতে হয়। দুর্ব্বল সন্তানদিগকে কাঁদাইয়া জগন্মাতা এই দিনে শ্বশুরালয়ে চলিয়া যান। কিন্তু এই দিবস এই পরিবারের মধ্যে ইহা অপেক্ষা এক গুরুতর শোচনীয় ঘটনা আছে, সে কথা পরে বলিতেছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিসর্জ্জনে।

নবমীর শেষ রাত্রে উপেন্দ্রনাথের ২।৩ বার ভেদ ও বমি হইল, প্রিয়ম্বদা ভীত হইয়া ঠাকরুণকে সংবাদ দিল। উপেন্দ্রের মাতা দৌড়িয়া পুত্রের গৃহে আসিলেন, উপেন্দ্রর শরীর তখন বড় অসুস্থ, শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন। জননীকে দেখিয়া উপেন্দ্র বলিলেন—"মা, বাবাকে ডাক, আমার প্রাণের ভিতর কেমন করিতেছে।"

কর্ত্তাকে ডাকিতে যাইতে হইল না, গৃহিণী চলিয়া আসিবার সময় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, প্রিয়ম্বদার ডাকিবার কারণ জানিতে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময় উপেন্দ্র পুনরায় বমি করিল; কর্ত্তাকে আর কোন কথা বলিতে হইল না; তিনি তখনি ডাক্তার ডাকিতে একজন লোক পাঠাইয়া দিয়া পুত্রের নিকট আসিয়া বসিলেন। উপেন্দ্র তখন অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল—"বাবা, আমার বুঝি দিন ফুরাইল।"

"ভয় কি বাবা, ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিলেই তোমার অসুখ আরাম হইবে।"

কর্ত্তা যদিও অনেক কষ্টে কথা কহিলেন বটে, কিন্তু উপেন্দ্রের জননীর হৃদয়ে উপেনের কথা বড় আঘাত করিল, আর যে রমণী অবনতমস্তকে বসিয়া তখন পদসেবা করিতেছিল, তাহার প্রাণ একেবারে উড়িয়া গেল।

ক্রমে ক্রমে উপেন্দ্রের পীড়ার সংবাদ পরিবারস্থ সকলে জানিল, সকলে শয্যাত্যাগ করিয়া তাহার নিকট আসিল, কেবল শশিকলার

শরীর অসুস্থপ্রযুক্ত আসিতে পারিল না। ধীরেন্দ্র আসিয়া উপেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া আর তথায় স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না, উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আসিল। ডাক্তার পীড়ার অবস্থার কথা শুনিয়া ঔষধ প্রস্তত করিয়া আনিয়াছিলেন, আসিয়াই সেই ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বিষণ্ণ মনে গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। মহেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, পীড়ার অবস্থা কি রূপ দেখিলেন?

ডাক্তার উত্তর করিলেন—"রোগ সম্পূর্ণ বটে, কিন্তু এখনও আশা আছে।" ডাক্তার আর কোন কথা বলিলেন না, শীঘ্র গিয়া আরো ২।৩ রকম ঔষধ আনিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন।

ক্রমে প্রভাত হইল, সূর্য্যদেব উদয় হইবার পূর্ব্বেই উপেন্দ্রের পীড়ার সংবাদ গ্রামস্থ সকলে জানিল; সকলেই সে সংবাদে ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিল, বাড়ি গ্রামস্থ লোকে পরিপূর্ণ হইল। সে দিন গ্রামে কাহারও বাড়িতে হাঁড়ি চড়িল না।

ক্রমে বেলা যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, রোগেরও ততই বৃদ্ধি দেখা গেল। সকলেই উদ্বিগ্ন হইল, সকলেরই মুখ বিষণ্ণ হইল, কাহার মুখে আর কথা বাহির হয় না। গ্রামে আজ আর লোক নাই; সমস্ত গ্রাম একেবারে নীরব ও নিস্তব্ধ। সকলেই নীরবে জগদীশ্বরের নিকট উপেন্দ্রের আরোগ্য প্রার্থনা করিতেছে।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় উপেন্দ্রের পীড়ার যন্ত্রণা বড় বৃদ্ধি হইল, তিনি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন—"একবার সকলকে ডাক, আমি জন্মের মত বিদায় লইব।

নিকটে তখন মহেন্দ্র আর গ্রামস্থ কয়েক জন ভদ্র লোক ছিলেন। গৃহিণী তখন ঠাকুর দালানে দশভূজার নিকট মাথা খুঁড়িতেছিলেন, প্রিয়ম্বদা অনিচ্ছাসত্বেও গৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া বাহিরে আসিয়া মাটিতে পড়িয়া আছাড় পাছাড় খাইতেছিল, আর মনে মনে জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া বলিতেছিল—প্রভু, সহায় হও, এ বিপদে যেন কূল পাই, এই বয়সেই যেন আমার সকল সাধ আহ্লাদ না ফুরায়।' চপলা নিকটে বসিয়া অশ্রু-জলে প্রিয়ম্বদার অঙ্গ সিক্ত করিতে ছিল। ধীরেন্দ্র তখন ডাক্তারের নিকট

ঔষধ আনিতে গিয়াছিল। কর্ত্তা ঠাকুর ঘরে বসিয়া ইষ্টনাম জপ করিতেছিল। মহেন্দ্র ও অন্যান্য সকলে উপেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া দেখিল যে দুই চক্ষু তাহার অশ্রু জলে পরিপুর্ণ।

পরে একে একে কর্ত্তা ও ধীরেন ও অন্যান্য আত্মীয় সকলে আসিল, সকলেরই অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিতেছিল, সকলেই আজ দারুণ মনোকষ্টে অস্থির উপেন্দ্র সকলকে স্থির হইতে বলিয়া বলিলেন——

আমার জীবন ত ফুরাইল, তবু যতক্ষণ থাকি আপনাদিগের চরণ দেখিতে ইচ্ছা করি তাই এখন ডাকিলাম। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করুণ, আর আমার সদগতির জন্য ঈশ্বরের নিকট সকলে প্রার্থনা করুণ।

সে নিদারুণ কথা শুনিয়া কাহারও মুখে বাক্য নিঃসরণ হইল না, সকলেই নীরবে রোদন করিল। ধীরেন্দ্রের কি বলিবার ইচ্ছা ছিল, একবার সে কথা বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হইল, স্বর বাহির হইল না। ধীরেন্দ্র চারি দিক অন্ধকার দেখিল।

ধীরে ধীরে উপেন্দ্র মহেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিলেন, মহেন্দ্র নিকটে আসিয়া বসিল, তখন উপেন্দ্র ডান হস্তে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কি বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পারিল না, তখন চক্ষের জলে উপেন্দ্রের বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল। সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য সকলের হৃদয় শোকে অভিভূত করিল, কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। রাম গোপাল জ্ঞান শূন্য হইয়া একেবারে আছড়ি খাইয়া পড়িলেন। উপেন্দ্র সকলকে স্থির হইতে ইঙ্গিৎ করিয়া অতি কষ্টে মহেন্দ্রকে বলিতে লাগিল— "দাদা, ইহারই মধ্যে আমার তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লইতে হইল, আমার এ জন্ম বৃথা হইল; বড় সাধ ছিল, বৃদ্ধ পিতা মাতার এবং অন্যান্য গুরুজনের সেবা করিব, আত্মীয় স্বজনের উপকার করিব; পরোপকার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিব; কিন্তু ভাই, আমার মনের কোন সাধই মিটিল না, অসময়ে আমার যাইতে হইল। আমার জীবনের এই সকল গুরুতর ব্রত আজ তোমার উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া চলিলাম। আর আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আর ধীরেন রহিল ইহাদিগকে দেখিও।"

এ সকল কথা মহেন্দ্রের হৃদয়ে বড় আঘাত করিল, আজ তাহার ভ্রাতৃ-স্নেহ উথলিয়া উঠিল। তখন উপেন্দ্র পুনরায় ইঙ্গিৎ করিয়া ধীরেন্দ্রকে ডাকিল। ধীরেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে নিকটে আসিয়া বসিল উপেন্দ্র বলিল—"ভাই ধীরেন, তুমি কাঁদিও না, বাবা রহিলেন, দাদা রহিলেন, তোমার কোন কষ্ট হইবে না।" তাহার পর অতি অনুচ্চ স্বরে বলিল—"এই সময় আমায় একবার শেষ দেখা দেখাইবে না?"

ধীরেন্দ্র সে শেষ দেখার অর্থ বুঝিল। সকলকে কিছু অন্তরে যাইতে বলিয়া রোরুদ্যমানা শোকাতুরা প্রিয়ম্বদা শেষ দেখা দেখাইতে সেই ঘরে আসিল। তাঁহাকে সে ঘরে রাখিয়া ধীরেন্দ্র অন্য ঘরে যাইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রিয়ম্বদাও স্বামীর সেই অবস্থা দেখিয়া অস্থির হইয়া আরো কাঁদিতে লাগিল, উপেন্দ্র স্থির নয়নে সেই অশ্রুপূর্ণ মুখখানি দেখিল, অমনি কোথা হইতে অশ্রু আসিয়া তাহার দৃষ্টিপথ রোধ করিল। অনেক কষ্টে উপেন্দ্র বলিল—

"প্রিয়ম্বদা, এখন কাঁদিবার সময় নয়, কাঁদিবার সময় আর অনেক পাইবে কিন্তু এরূপ সময় আর তোমার জীবনে মিলিবে না। এখন চলিলাম, কাঁদিবার জন্যই তোমার জন্ম, যতকাল বাঁচিবে তুমি কাঁদিবে; কিন্তু এ শেষ বিদায়ের সময় তোমাকে কাঁদিতে দেখিয়া যাইলে স্বর্গেও আমি সুখী হইতে পারিব না। তুমি আমার নিকটে বস; আমি তোমাকে এই বেলা একবার প্রাণ ভরিয়া শেষ দেখিয়া লই, তোমাকে দেখিবার সাধ আজও আমার মেটে নাই।"

কিন্তু উপেন্দ্রের কথায় প্রিয়ম্বদার কান্না থামিল না, বরং বৃদ্ধি হইল। প্রিয়ম্বদা স্বামীর সে আজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু সে ক্ষুদ্র হৃদয়ে কত সহ্য করিতে পারে? শোকে অধীরা হইয়া প্রিয়ম্বদা ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া স্বামীর চরণ ধরিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া বলিল—"আমায় ফেলিয়া যাইও না, যেখানে যাও, আমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইও। আর তাহা না হইলে আমি আত্মঘাতী হইব।"

উপেন্দ্র পুনরায় বলিল—"প্রিয়ম্বদা, আমার শোকে যে তুমি আত্মঘাতী হইতে পার, তাহা আমি জানি; কিন্তু আমার অবর্তমানে তোমার আমার

প্রতি যদি ভালবাসা থাকে তবে আমার এই শেষ আজ্ঞা রক্ষা করিও, আত্মঘাতী না হইয়া আমার পুত্র কন্যা লালন পালন করিও; বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করিও, ধীরেনকে তোমার পুত্রের ন্যায় দেখিও, আর জীবনের যে সকল উদ্দেশ্য ছিল, তাহাত তোমার অজ্ঞাত নাই, যত দূর পার সেই সকল উদ্দেশ্য পালন করিতে চেষ্টা করিও। নিজের শরীর ও মন পবিত্র রাখিয়া পরকালের কার্য্য করিও! এই সকল করিলে আবার আমাদের পুনরায় মিলন হইবে, সে মিলনের পর আর বিচ্ছেদ হইবে না।"

ধীরে ধীরে উপেন্দ্র এই কথা গুলি বলিলেন, ধীরে ধীরে প্রিয়ম্বদার কর্ণে গিয়া কথা গুলি প্রবেশ করিল, বালিকা সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। দেহের মধ্যে তখন তাহার প্রাণ বুঝি ছিল না। একবার নীরবে উদাস দৃষ্টে স্বামীর মুখের পানে চাহিল। অতৃপ্তলোচনে উপেন্দ্র সেই মুখ খানি শেষ দেখা দেখিতেছিলেন, বালিকার হতাশার দৃষ্টি দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, নিঃশব্দে নয়নের অপাঙ্গদ্বয় প্লাবিত করিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিল। উন্মত্তের ন্যায় উপেন্দ্রের গলা জড়াইয়া প্রিয়ম্বদা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কতক্ষণ পরে উপেন্দ্র বলিল—'আমার শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর কাঁদিও না, একবার স্থির হইয়া ব'স, আমি দেখি।' চক্ষু মুছিতে মুছিতে বালিকা উঠিয়া বসিল। বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠে উপেন্দ্র বলিল, কৈ—তোমার হাত?

কাঁদিতে কাঁদিতে প্রিয়ম্বদা আপনার হাতখানি বাড়াইয়া দিল, ধীরে ধীরে উপেন্দ্র দুই হাতে সে হাতখানি ধরিয়া আপনার ওষ্ঠের উপর স্থাপন করিল, দুই বিন্দু উষ্ণ জল হাতের উপর গড়াইয়া পড়িল। সাদরে উপেন্দ্র সে হাত চুম্বন করিল। মর্ম্মের ভিতর হইতে উচ্চারণ করিয়া উপেন্দ্র বলিল—'আঃ।'

আর কথা সরিল না, চক্ষু কপালে উঠিল, নিশ্বাস অচল হইয়া গেল, তখনও হাতখানি সেই ওষ্ঠের উপর রহিল। বালিকা চীৎকার ছাড়িয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে অকস্মাৎ দেবী-প্রতিমার মুখে কাল ছায়া দৃষ্ট হইল। ত্রস্তভাবে সকলে গৃহের দিকে দৌড়াইয়া গেল। দেখিল, বিজয়ার দিন ফুরাইতে না ফুরাইতে প্রতিমার বিসর্জ্জন হইয়াছে।*

রেলের রাস্তা।

রেলের রাস্তা আগে এ দেশে বুঝি ছিল, বুঝি বা ছিল না। কিন্তু সে সব অনেক কথা, সে সব কথায় কাজ নাই। থাকুক ভাল, আর না থাকুক ভাল, কোন্ যুগে কি ছিল তাহা লইয়া আস্ফালন করা মূঢ়ের কর্ম্ম। যাহা এখন নাই—যাহার অভাবে এখন কষ্ট পাইতে হইতেছে, কবে কার আমলে তাহা ছিল বলিয়া পুরাণের দুই একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলে কোন ফল হয় না। অতীতের কাহিনীতে বর্ত্তমানের অভাব ঘুচে না। কোন্ দিন পেট ভরিয়া খাইয়াছিলাম বলিয়া আজিকার ক্ষুধা মেটে না। তাই বলিতেছিলাম, ছিল কি না ছিল সে সব কথায় কাজ নাই।

প্রথম যখন সাহেবেরা আসিয়া এ দেশে রেলের রাস্তা খুলিল, ছেলে বুড়ো, মাগী ছাগী, চাষা ভূষো যে তাহা দেখিল সকলেই অবাক্ হইয়া গেল, যে তাহা দেখিতে না পাইল সেও প্রতিবেশীর মুখে তাহার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। দিন কতক যেন একটা যুগান্তর উপস্থিত হইল, বাঙ্গালার ঘরে ঘরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সকলেই ইংরাজদিগকে মনে মনে কলির দেবতা ভাবিতে লাগিল। ধীরাজ উচ্চে গান ধরিল ——

"বিশ্বকর্ম্মা হার মেনেছে ধন্য সাহেব কোম্পানি।"

ধীরাজের ন্যায় কেহ কবিতা লিখিল, কেহ গান বাঁধিল, কেহ বা ছড়া রচনা করিল। ভিখারী বৈষ্ণব রাস্তায় রাস্তায় রেলের গান গাহিয়া পেট চালাইতে লাগিল। দুঃখের বিষয়, আজকালের ন্যায় তখন এত নাটককার জন্মে নাই, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকে রেলের নাটক লিখিয়া বেশ দু পয়সা করিতে পারিত।

এখন আর সে দিন নাই। কলের গাড়ী কি এক অদ্ভুত পদার্থ লোকে আর তাহা ভাবিয়া চমকিয়া উঠে না। গাড়ীর হুস্ হুস্ শব্দ শুনিয়া এখন আর তেমন করিয়া বালকেরা খেলা ছাড়িয়া, যুবতীরা কোলের ছেলে কোলে করিয়া, বৃদ্ধারা লাঠি ধরিয়া দৌড়াইয়া রাস্তার নিকটে দাঁড়ায় না। আগে

পাড়ার স্ত্রীমহলে বৈকালে কেহ জলে নামিয়া, কেহ বা ঘাটে বসিয়া গা ধুইতে ধুইতে, কখন বা প্রতিবেশিনীর চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে, খাইতে শুইতে, উঠিতে বসিতে যেমন কলের গাড়ির গল্প করিত, সে গল্প করিবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ক্ষীণ-মধুর-অনুচ্চকণ্ঠে ধীরাজের গান গাহিত, এখন আর সে সব নাই। এখন সকলেই গাড়ি চড়িতেছে, সকলেই রেলের মর্ম্ম বুঝিয়াছে। বাঙ্গালায় যে যুগ আসিয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন যেখানে সেখানে রেল খুলিয়াছে। এখন এ সম্বন্ধে দুই মত দাঁড়াইয়াছে। কেহ রেল ভাল বলিতেছে, রেলে দেশে বাণিজ্য ব্যবসায়ের বড় সুবিধা হয়। কেহ রেল মন্দ বলিতেছে, রেলে দেশের লোককে পেটে মারিয়া দেশের জিনিষ বিদেশে লইয়া যায়। এখন সে ধীরাজের বিস্ময়-ভক্তি-মিশ্রিত গান নাই, এখনকার কবি ইহার উল্লেখ করিয়া গায়িতেছেন——

'নিজ রত্ন সুখে পর হাতে দিয়ে,

পর লৌহবিনির্ম্মিত ক্ষুর বুকে।'

যিনি যাহাই বলুন, রেলে উপকার কি অপকার তাহা আজকাল সকলেই বুঝিয়াছে। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' এ কথা যদি মানিতে হয় তবে রেলের উপকারিতা অবশ্যই মানিতে হইবে। রেলে বাণিজ্যের সহায়তা করে, বাণিজ্য বিস্তারের পথ খুলিয়া দেয়। গ্রাম হইতে কলাটা মূলাটা চলিয়া গেল বলিয়া তোমার কি আমার আহারের পক্ষে কিছু ব্যাঘাত ঘটিল বলিয়া রেল সাধারণের অপকার করিল না। তুমি আমি দাসত্বজীবী বাণিজ্যের নামে শীহরিয়া উঠি, তুমি আমি ইহার মর্ম্ম বুঝি না, অথবা বুঝিতে পারিলেও বুঝিতে চেষ্টা করি না। কিন্তু তুমি আমি কে? তোমায় আমায় লইয়া দেশ নহে। দেশ যাহাদিগকে লইয়া রেলে তাহাদিগের উপকার সাধন করিতেছে। ইহা ছাড়া রেল দেশ বিদেশের লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ইচ্ছা করিলে লোকে দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া যাইতেছে, তথাকার লোকের সহিত মিশিতেছে, পরস্পর পরস্পরের অবস্থা জ্ঞাত হইতেছে, সুতরাং এক জাতির সহিত অন্য জাতির সৌহার্দ্দ্য জন্মিতেছে। ইহার ন্যায় মহৎ উপকার বুঝি আর নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট এ সকল কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

দুঃখের বিষয়, রেল যে এত উপকারের জিনিষ ভারতে আজও ইহার রীতিমত বিস্তার হয় নাই। যে সব দেশে চাস আবাদ হয় সেই সব দেশ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রের উপকূলে লইয়া যাইবার জন্য ভারতে একটিও রেলওয়ে নাই। আমরা গতবারে গমের চাসে আমেরিকার সহিত ভারতের যে প্রতিযোগিতার কথা বলিয়াছি, তাহা আরও অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে, যদি ভারতে এই প্রকার রেলের রাস্তা আরম্ভ হয়। আমেরিকায় রেলের রাস্তার সংখ্যা নাই, তাহার সহিত তুলনা করিলে বোধ হয় ভারত আজও আমেরিকা হইতে শত বৎসর পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, এরূপ হইবার কারণ অনেকটা বুঝা যায়। আমেরিকার যে সাধারণ-তন্ত্রপ্রণালী সুশৃঙ্খল রূপে রাজত্ব করিতেছে তাহার প্রসাদাৎ সিবিল বিভাগ কি সৈন্যবিভাগে আমেরিকাকে ভারতের ন্যায় রাশি রাশি টাকা গণিয়া দিতে হয় না। কিন্তু ভারতে এই দুই বিভাগ ইহার অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত শোষণ করিতেছে। পেশোয়ার হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত রাহুর ন্যায় এই দুই বিভাগ করাল গ্রাসে ভারতের যথাসর্ব্বস্ব বিধ্বস্ত করিতেছে। এই জন্যই ভারত রেলের জন্য স্বতন্ত্র পয়সা যোগাইতে পারে না। সুতরাং ভারতের দুঃখের নিশার ও শেষ নাই। উচিত, গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে একটু বিশেষ লক্ষ্য করেন। ইংরাজেরা কিছু ভারতে লুট করিতে আসেন নাই যে, ভারতের দশা যাহাই হউক তাঁহারা পকেট পুরিয়া টাকা লইয়া চলিয়া যাইবেন। লুট করায় আর রাজত্ব করায় অনেক প্রভেদ। রাজত্ব করিতে হইলে অগ্রে রাজ্যের শুভাশুভ দেখিতে হয়, রাজ্যের ভাবী-মঙ্গলামঙ্গলের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া চলিলে রাজত্ব সুখের হয় না। কেহ কেহ বলেন, টাকার জন্য ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের ভারতের সহিত সম্বন্ধ। সে তো বেশ কথা। কিন্তু তাহা ত কেবল এক দিনের জন্য নয়; যাহাতে চির-দিনের জন্য এ সম্বন্ধ বজায় থাকে, তাহার পথ করা আবশ্যক। আমরা প্রতি বৎসরই দেখিতে পাই, বজেটে যখন রাজস্বের বিষয় আন্দোলন উপ-স্থিত হয়, তখন তো হুলস্থুল পড়িয়া যায়; কিন্তু রাজস্ব যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহার উপায় করা আগে কর্ত্তব্য। কিসে দেশের ধনাগমের পথ প্রশস্ত হয় তাহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে শিখাইতে হইবে না। ইংরাজ বাণিজ্যজীবী

বলিয়া জগদ্বিখ্যাত। সুতরাং দেশে ধনবৃদ্ধির জন্য বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে হইলে রেলওয়ে বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। আমেরিকায় দিন দিন যেরূপ রেলওয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে তাহার সহিত ভারতের রেলের সংখ্যা তুলনা করিলে সে নগণ্য মাত্র।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রথম রেলের রাস্তা আরম্ভ হয়। এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইহাতে যে রূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা বলিতেছি,—

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে	২৩ মাইল রেল খুলে,	
১৮৪০ ,,	২৮১৮ ,,	ঐ
১৮৫০ ,,	৯০২১ ,,	ঐ
১৮৬০ ,,	৩০৬৩৫ ,,	ঐ
১৮৭০ ,,	৫৩৩৯৯ ,,	ঐ
১৮৮০ ,,	৯৩৬৭১ ,,	ঐ

আজকাল অম্যূন ১০৫০০০ মাইল পর্য্যন্ত রেলওয়ে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, আবার সে দিন ৯০ কোটি টাকায় ১৮০০০ মাইল একটা নূতন লাইন খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, আমেরিকার ৩০ বৎসর পরে আরম্ভ করিয়া ভারতে আজ পর্য্যন্ত যে রেল খুলিয়াছে তাহার সংখ্যা এই—

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে	৮৩৬ মাইল খুলে,	
১৮৭০ ,,	৪৮৩৩ ,,	ঐ
১৮৮০ ,,	৯৮৭৫ ,,	ঐ

ইহা দেখিয়াই লেখক বলিয়াছেন:—The Indian railways can be scarcely taken as a patch on the vast system of lines that traverse the United States in every direction, bringing the products of each district into easy communication with the coast. *

বাস্তবিক, ভারতে আজও প্রকৃত প্রস্তাবে রেলওয়ে বিস্তার হয় নাই। রেলওয়ের বিস্তার হয় নাই বলিয়াই ইহার দুঃখের নিশাও পোহাইতেছে না। দুর্ভিক্ষের বিভীষিকার কথা মনে হইলে এখনও প্রাণটা কাঁপিয়া উঠে। অল্প

* *Vide*:—The influence on English trade and American protection by the development of India.

বিনা দেশে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে, লোকে পেটের জ্বালায় গাছের পাতা চিবাইয়া খাইতেছে, হিন্দু যবনের হাতের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে, মাতা পুত্রকে ফেলিয়া পলাইতেছে, খাইতে না পাইয়া ঘরে ঘরে রাশি রাশি লোক মরিতেছে, গৃহের দ্বারে দ্বারে শকুনি উড়িতেছে, যাহারা ধনকুবের তাহারাও টাকার রাশি মাথায় দিয়া ঘরের ভিতর মরিয়া পচিয়া রহিতেছে। কে দেখে? কে সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য ফিরাইতে চেষ্টা করে? দেশে আহারীয় কিছুই নাই। টাকায় পেট ভরে না, দূরস্থ দেশের জিনিষ পাওয়া যায়, টাকা হইলেও তাহা সহজে আনা যায় না। আনিতে হয়তঃ একমাস লাগিবে, সে একমাসে দেশ শ্মশানভূমে পরিণত হইবে। ইহার অপেক্ষা আপশোষের কথা আর নাই। লর্ড লিটনের গভর্ণমেণ্ট এই সব দেখিয়াই রেলওয়ে বিস্তার দুর্ভিক্ষ নিবারণের একটী প্রধান উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। আমাদের যেন স্মরণ হয়, এই কথা উল্লেখ করিয়াই সে সময়ে লাইসেন্স ট্যাক্স স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সব এখন অতীতের কাহিনী হইয়া গিয়াছে। সার জন ষ্ট্রাচি ও লর্ড লিটন আপনাদের ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গরিব প্রজার সেই বুকের রক্তশোষা টাকার কি ব্যবহার করিয়াছিলেন সে সব কথা উল্লেখ করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। লর্ড রিপণকে আমরা একবার সেই সকল কথা আলোচনা করিতে বলি। বাস্তবিক, ভারতে অজন্মার বৎসরের কথা মনে হইলে আজও সর্ব্ব শরীর আতঙ্কে শীহরিয়া উঠে।

কিন্তু অজন্মার কথা তো বলিলাম, এখন একবার সুজন্মার কথা বলি। দেশে ফসল অপর্য্যাপ্ত হইলে অবশ্যই বড় সুখের কথা, কিন্তু ভারতে অনেক সময়ে সে সুখ দুঃখে পরিণত হইয়া পড়ে। তুমি আমি খেয়ো খরিদ্দার ফসল বেশি হইলে মনে মনে জানি অবশ্যই তাহার দর সস্তা হইবে, সুতরাং তোমার আমার আহ্লাদ হইতে পারে বটে। কিন্তু তোমাকে আমাকে যাহারা আহার যোগাইবে, তাহারা যে রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, খালি মাথায় খালি পেটে এক কোমর কাদায় পড়িয়া দিনরাত্র বলদ ঠেঙাইতে ঠেঙাইতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিবে, তাহাদের সে পরিশ্রমের জন্য তাহারা কি পাইবে? চাষার অজন্মার যেমন ভয়, সুজন্মারও প্রায় তেমনি ভয়। সে তাহার ফসল লইয়া কি করিবে? হাটে বেচিতে যাইবে, লোকে কিনিবে না। সে যে দর

বলিবে, লোকে তাহার অর্দ্ধেকও দিতে চাহিবে না। শেষ দুঃখের নিশ্বাস ফেলিয়া হয় তাহাকে ভাঙা হাটে টাকার মাল আট আনায় বেচিতে হইবে, না হয়, আবার মাথায় মোট করিয়া সে জিনিষ ঘরে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। কিন্তু চাষা ঘরে ফসল জমা করিয়া পচাইয়া কি করিবে? সে না হয় দু দিন উপবাস করিয়া কাটাইতে পারিবে, কিন্তু তাহার টাকা না হইলে চলে কৈ? গোমস্তার পাইক পেয়াদারা আসিয়া নিত্য দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতেছে, সে খাজানা দিবে কি করিয়া? টাকার বড় দরকার, অথচ মাটির দরে খামের সামগ্রী ছাড়িতে মমতা করে। চাষা মহাজনের দ্বারে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল। মহাজন খত লিখাইয়া লইয়া টাকা দিয়া নিঃশব্দে তাহার কলিজার উপর ছুরি চালাইলেন। হতভাগ্যের অজন্মার বৎসরও যে কষ্টে গিয়াছিল, সুজন্মার বৎসরও সেই দুঃখের দশা উপস্থিত হইল। কিন্তু কথা হইতেছে কি, ভারতবর্ষের চাষাদের বা এ রূপ অবস্থা হয় কেন, আর আমেরিকার চাষাদেরই বা এ অবস্থা হয় না কেন? ইহার কারণ আছে। আমেরিকায় যখন যে জিনিষ উৎপন্ন হইতেছে তৎক্ষণাৎ তাহা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, উৎপন্ন দ্রব্য কাটাইবার জন্য আমেরিকাকে মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে হয় না। আমেরিকার রেল-আমেরিকার জিনিষ দেশ বিদেশের বাজারে লইয়া ফেলিতেছে, সেখানে তাহা দরে বিক্রীত হইতেছে, সুতরাং আমেরিকা টাকায় ফাঁপিয়া উঠিতেছে। আর ভারতে তেমন রেলের সুবিধা নাই, যে জিনিষ যেখানে জন্মাইল তাহা যদি সেখানে না কাটিল তবে সেখানে পড়িয়া পচিতে লাগিল, বিদেশের খরিদ্দারেরা তাহা চক্ষে দেখিতে পাইল না, সুতরাং ভারত সামগ্রীর রাশি লইয়াও টাকার জন্য কাঁদিতে লাগিল। রেল ভিন্ন ভারতের এ দুঃখ মোচনের অন্য উপায় নাই।

(ক্রমশঃ)

ব্যারণ হল্‌বার্জ।

"কলম্‌ গোয়েদ্‌ কে ময়্‌ সাহে জাঁহানম্‌
কলম্‌ কস্‌রা বে দৌলৎ মে রসানম্‌ ॥
অগর্‌ বদ্‌ বকৎ বাসদ্‌ মুন্‌চ দানম।
আলেক্‌ বার দৌলৎ মে রসানম্‌ ॥"*

(পান্দেনামা)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সাহিত্যক্ষেত্রে যে সকল অনন্য-সাধারণ গুণ-বিশিষ্ট মহানুভব লেখকগণ আবির্ভূত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই রূপে গুণে ব্যারণ হাল্‌বার্জের তুল্য প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যে দিনেমারেরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়া মালবার উপকূলে প্রায় ত্রয়োবিংশতি বর্ষকাল উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, হালবার্জ তাঁহাদের জাতীয় চরিত্রের প্রথম ও চরম আদর্শ। আমাদের দেশের যে সকল নব্য যুবক ইংরাজী ভাষায় ডেনমার্কের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়াছেন, ব্যারণ হাল্‌বার্জের প্রাতঃস্মরণীয় নাম তাঁহাদের নিকট বোধ করি অপরিচিত নাই। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, যে অসধারণ শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় এবং অমিত প্রতিভা বলে পণ্ডিতবর হলবার্জ ডেনমার্কের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, অস্মদ্দেশীয় 'শিক্ষিত'-আখ্যাধারী নব্য যুবকবৃন্দের মধ্যে তাহার শতাংশের একাংশও লক্ষিত হয় না। হালবার্জের জননী গর্ভবতী হইয়া নরোয়ে নগরে অব-

* অস্যার্থঃ॥ লেখনী বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছে "প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমি তৃণ হইতেও ক্ষুদ্র, কিন্তু আমার শক্তি অসীম। যে আমাকে চালায় আমি তাহাকে চালাই। যে আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, আমি তাহাকে ঐশ্বর্য্যশালী করি। সে যদি নিতান্ত হতভাগ্য হয়, তাহা হইলেও তাহাকে একবার আমি ধন দৌলৎ প্রদান করি"।

স্থিতি করিয়াছিলেন, সুতরাং নরোয়ে নগরে হলবার্জের জন্ম হইয়াছিল। ডেনমার্ক মধ্যে হালবার্জ যেমন পুরুষোত্তম ছিলেন, তদীয় জননী ও শারীরিক সৌন্দর্য্যে তৎকালে তদ্দেশ মধ্যে প্রধানা নারী বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছিলেন। যাঁহারা ইউরোপের সমগ্র ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই জানা আছে যে, হলণ্ড এবং ডেনমার্কবাসী লোকদিগের মত অসাধারণ পরিশ্রমশীল জাতি ইউরোপে আর নাই। বিদেশীয়দিগের আক্রমণ, বন্য জন্তুদিগের উপদ্রব এবং প্রকৃতির অত্যাচার (যথা,—সমুদ্র তরঙ্গ, বৃষ্টিপাত, ঝঞ্জাবাৎ, বন্যা, প্রভৃতি) হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্য পুরাকাল হইতে দিনেমারদিগকে অসাধারণ শ্রমশীলতা স্বীকার করিয়া আসিতে হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে কখন সুচারুরূপে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের দেশের প্রকৃতি তাঁহাদিগকে কর্ম্মঠ ও শ্রমপরায়ণ হইতে শিক্ষা দিয়াছে কিন্তু পণ্ডিত হইতে শিক্ষা দেয় নাই, সুতরাং ডেনমার্কের সাহিত্যে হলবার্জ ভিন্ন আর একটিও কুসুম বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। উদ্যানের উৎকৃষ্ট কুসুমের সংখ্যা একটি বটে, কিন্তু আমাদের দেশের শত শত গ্রন্থকারের সমষ্টি ঐ একটিরও তুল্য নহে। কেবল পুস্তক লিখিলেই যদি গ্রন্থকার হওয়া যায়, তাহা হইলে ডেনমার্ক প্রদেশস্থ লোকেরা ফটিক চাঁদ, নিধিরাম, রামকান্ত, শ্যামধন, কানাই রাম, বামির মা, প্রভৃতি অনেক গ্রন্থকর্ত্তা ও গ্রন্থকর্ত্রীর নামোল্লেখ করিতে পারে; কিন্তু তাঁহারা সেরূপ গ্রন্থকার চাহেন না। তাঁহারা বলেন "সাহিত্য জাতীয় চরিত্রের বিকাশ; সাহিত্য জাতীয় জীবনের আদর্শ।" ব্যারণ হলবার্জের সাহিত্যে সেই জাতীয় চরিত্র বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাতেই বলিতেছি, ব্যারণ হলবার্জ দিনেমার সাহিত্যের প্রথম ও চরম আদর্শ।

হলবার্জ দরিদ্রের সন্তান, তাঁহার পিতা মাসিক ৪ পৌণ্ড (৪০ টাকা) বেতনে রাজবাটীর অন্যতম শান্তিরক্ষক ছিলেন। জীবনী-লেখকেরা বলেন, হলবার্জ ৩ ঘণ্টা কাল মধ্যে সমগ্র বর্ণপরিচয় শিক্ষা করেন এবং যে দিনে তাঁহার বর্ণমালার পরিচয় শিক্ষা হয় তাহার পর দিবস হইতে তিনি কোন গুরুর সাহায্য না লইয়া এক সপ্তাহ কাল মধ্যে কঠিন কঠিন শব্দ পরিপূর্ণ বৃহদাকার

গ্রন্থ শিক্ষিত লোকের ন্যায় পড়িয়া যাইতে পারিতেন। পুত্রের হাতে খড়ি হইবার এক মাস পরেই পিতার মৃত্যু হইল। পুত্র দুঃখের সাগরে ঝাঁপ দিল। সেই অকুল সাগরের চারিদিক ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ, কোথাও তরণী নাই, নাবিক নাই, কূল নাই, কিনারা নাই। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তাহার উপর তরঙ্গ ঘূর্ণিত হইয়া জলকে আলোড়িত করিতেছে. আর চতুর্দ্দিকে কেবল নিরাশার প্রবল প্রতিকূল বায়ু বহিয়া বহিয়া তরঙ্গের তেজ বাড়াইতেছে। যেই একটি তরঙ্গ উঠে, পুত্র অমনি মনে করে. বুঝি এবারে আমাকে গ্রাস করিবে। সেই নিরুপায় অবস্থায় ঘূর্ণিততরঙ্গবক্ষে দাঁড়াইয়া হলবার্জ অশ্রুপূর্ণ লোচনে দয়াময় ভগবানকে ডাকিল, কিন্তু তরঙ্গ থামিল না। সে যে কি অবস্থা, ধনীর সন্তানেরা তাহা অনুমান করিতেও অসমর্থ। হলবার্জ পতিতপাবন ঈশ্বরের পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া আবার কাঁদিল, আবার মঙ্গলময় পিতাকে ডাকিল; কিন্তু তরঙ্গের সেই আসুরিক তেজ থামিল না। তখন প্রভূত সাহসে ভর করিয়া চন্দ্রদণ্ডের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "কাপুরুষের পক্ষেই দৈববলের আবশ্যক, বীরের পক্ষে হৃদয়ের বলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।" তাঁহার মুখ হইতে যেই এই কয়টি কথা নিঃসৃত হইল, অমনি সম্মুখে আশাপবন বহিল, পশ্চাতে গগন প্রান্তে বাসন্তির মধুরিমা জাগিয়া উঠিল, নিরুপায় দরিদ্র হলবার্জ বজ্রাদপি কঠোরাবস্থায় এক খানি জীর্ণ কাষ্ঠ খণ্ড অবলম্বন করিয়া সেই অনন্ত অপার তরঙ্গসমাকুল সাগর বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে চলিল। তুমি আমি বাঙ্গালী সন্তান——কাষ্ঠ খণ্ডের সাহায্যে সমুদ্র পারের কথা তোমার আমার নিকট অলীক স্বপ্ন বলিয়াই বোধ হয়।

সেই অপার দুঃখ সাগরের অগণ্য তরঙ্গ-ঠেলিতে ঠেলিতে, শ্রীভ্রষ্ট ভাগ্যের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে করিতে, হলবার্জ কোপেন্‌হেগন্ নগরে উপনীত হইলেন। তথায় ভিক্ষা করিয়া উদরপূরণ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের মনোরঞ্জন করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই রূপে নয় বর্ষকাল কোপেন্‌হেগেন্ নগরে অতিবাহিত হইল। ভিক্ষা করিয়া নয়বর্ষকাল উদরপূরণ! কথাটি বড় সহজ নহে। নিরতিশয় পরিশ্রম এবং অসাধারণ সহিষ্ণুতাবলম্বন করিয়া হলবার্জ ষোলবর্ষকালে যাহা শিখিলেন,

আমাদের গ্রামের অনেক ঠাকুরদাদা অশীতিবৎসর বয়ঃক্রমে তাহা শিখেন নাই। ইউরোপের পাঁচ প্রকার ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার ব্যুৎপত্তি জন্মিল; এবং গণিত, নৌবিদ্যা, শিল্প ও সংগীতে তিনি পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। ঠিক এক বর্ষকাল পরে তিনি সপ্তদশবর্ষে উপনীত হইলেন, ডেন্‌মার্কের যুবকেরা ঠিক এই বয়সে সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করে। হলবার্জ রাজধানী মধ্যে একটী পাঠশালা স্থাপন করিয়া ফরাসী ভাষা এবং সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহাতে কিছু কিছু অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রশস্তমনা হলবার্জ একটী সঙ্কীর্ণ স্থানে থাকিয়া, একটী সঙ্কীর্ণ কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিবার পাত্র নহেন; সমগ্র ইউরোপ তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি পাঠশালা ছাড়িয়া দিয়া সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করিবার সংকল্পে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। ইউরোপের কোন্ কোন দেশে জ্ঞানালোচনার কি প্রকার উপায় নির্দ্ধারিত আছে, কোন্ দেশের সাহিত্য অধিকতর বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, কোথায় বা প্রজাপুঞ্জ অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন প্রায় হইয়া রহিয়াছে, ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই সময়ে রাজবাটী হইতে একটি বড় পদের নিয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার আহ্বানপত্র আসিল, তিনি তাহার উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন "অপরকে না খাওয়াইয়া আমি খাইতে পারি না।' রাজবাটীর চাকুরী স্বীকার করিলে কেবলমাত্র রাজার উপকার করা যায়, কিন্তু হলবার্জ সে উপকারে সম্মত নহেন। তিনি সমগ্র দেশের উপকার করিতে চাহেন; যাহাতে সমগ্র দেশবাসীর সেবা হয় এমত চাকুরীতে তিনি আপনেচ্ছায় নিযুক্ত হইলেন। ইউরোপ ভ্রমণে তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সহায়হীন, সম্পত্তিহীন, বন্ধুহীন, নিরুপায় দরিদ্র হলবার্জ পদব্রজে ইউরোপ ভ্রমণে চলিলেন। পায়ে হাঁটিয়া যে ব্যক্তি এত বড় মহাদেশ পরিভ্রমণ করিতে পারে, তাহার নিকট দেশের সংস্কার যে সহজ কথা, এ কথা বোধ করি কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সম্পত্তির মধ্যে হস্তে এক বীণা। সেই বীণা বাজাইতে বাজাইতে বসন্ত প্রারম্ভে হলবার্জ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই জ্যোতির্ম্ময় রূপবান পুরুষোত্তমের সুমধুর বীণাধ্বনির ঝঙ্কার একবার যাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল, সেই সঙ্গীতবিশারদ কলকণ্ঠ গায়কবরের গগনস্পর্শী পঞ্চম রাগ যাঁহার শ্রুতিগোচর হইল, তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী

অমনি বাজিয়া উঠিল। একে বসন্তকাল, তাহে বীণাধ্বনি; একে মদনবিনিন্দিত রূপ, তাহে সুমধুর ঝঙ্কার;——গৃহে নরনারীর মন আর স্থির রহিল না। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার মধুরালাপসুখের প্রয়াসী হইতে লাগিল। এইরূপে কখন বক্তৃতা করেন, কখন বীণার ঝঙ্কার দেন। দিবসের অধিকাংশ বক্তৃতায় যাপিত হয়; রাত্রিতে চন্দ্রালোকে কৃষকদিগের দ্বারে দ্বারে বীণা বাজাইয়া তাহাদিগকে প্রীত করেন। কখন ভিক্ষা করিয়া উদরপূরণ করেন, কখন বা নিমন্ত্রিত হইয়া কোন পণ্ডিতের গৃহে কালযাপন করেন। এই রূপে ফ্রান্স, জার্ম্মণী, হলণ্ড অতিক্রম করিয়া, ইংলণ্ডে উপনীত হইলেন। তথাকার অক্‌স্‌ফোর্ডস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাকে পরমসমাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের নিতান্ত অনুরোধে পড়িয়া তাঁহাকে দুই বৎসরের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়। ইংলণ্ডে থাকিয়া তিনি তাঁহার জগদ্বিখ্যাত 'বিশ্বজনীন ইতিহাস' Universal History (প্রণয়ন) ও প্রকাশ করেন। তদনন্তর ইটালী, স্পেন, সুইজর্লণ্ড, প্রসীয়া, পর্টুগাল, রসিয়া প্রভৃতি ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশসমূহ পরিভ্রমণ করতঃ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। স্বদেশে আসিয়া "ইউরোপীয় সাহিত্য" নামে এক বৃহদাকার গ্রন্থ প্রকাশ করেন; উহাতে সমগ্র ইউরোপের সাহিত্য সম্বন্ধে অত্যুৎকৃষ্ট প্রস্তাব সমূহ লিখিত হইয়াছে। উহা অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ। তাহার পর ক্রমান্বয়ে অষ্টাদশ খানি মিলনান্ত নাটক (Comedy) প্রণয়ন করেন এবং ফরাসী ভাষা হইতে দুই খানি দর্শন শাস্ত্র অনুবাদ করেন। চল্লিশবর্ষ বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইউরোপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে, ডেনমার্কের রাজা তাঁহাকে "ব্যারণেট্" উপাধি প্রদান করিয়া প্রায় ত্রয়োদশ লক্ষ টাকা যৌতুক প্রদান করেন এবং বার্ষিক তিন সহস্র টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। এই রূপে যে জীবনাঙ্কুর আবর্জ্জনাপরিপূর্ণ কণ্টকসমাবৃত অনুর্ব্বর ভূমিতে জন্মিয়াছিল, তাহা ধন, মান, জ্ঞান এবং পুণ্যময় আদর্শ জীবনে পরিণত হইল। ডেনমার্কগগন হইতে যে উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে তাহা আর পূরণ হয় নাই।

দরিদ্র হলবার্জ 'ব্যারণ' হলবার্জ হইয়া মরিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার গুণের

কথা সকল খুলিয়া বলা হইল না। অন্ততঃ দুইটি কথা না বলিলে আমাদের প্রস্তাব অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে এবং তাঁহার জীবনীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হইবে। তাঁহার দুইটি প্রধান গুণ এই ছিল যে, তিনি যাহা লিখিতেন কার্য্যে তাহা দেখাইতে পারিতেন, এবং কোন কার্য্যের অন্তঃসার না দেখিয়া তিনি তাহার গুণাগুণ বিচার করিতেন না। একবার জর্ম্মণীর লোকদিগের আক্রমণ হইতে তিনি স্বদেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন। হলণ্ডে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "দালালী গ্রন্থকারদিগের স্বত্ব বিনাশিনী" নামে একটি সভা ছিল। দালালী গ্রন্থকার সকল দেশেই আছে। বাজারের দালালগণ যেমন লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করেন অথচ নিজের এক পয়সা মূলধন নাই, অনেক গ্রন্থকার তদ্রূপ অনেক গ্রন্থ বিরচন করেন বটে কিন্তু তাহাতে নিজের কিছুই থাকে না। তাহাতে না আছে নূতনত্ব (Newness) না আছে 'আদিমত্ব (Originility)। হলবার্জের জীবনী আমরা সমাপ্ত করিলাম, যে দেশে এরূপ গ্রন্থকার থাকে সে দেশ নিতান্ত সৌভাগ্যবান। *

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

শক্তি।

বামে, দক্ষিণে পশ্চাতে, সম্মুখভাগে যে দিকে তাকাই সেই দিকেই শক্তির সর্ব্বময় প্রভুত্ব দেখিতে পাই। যে পৃথিবী এক দিন সামান্য বাষ্পপিণ্ডের আকারে শূন্যদেশে ভ্রমণ করিত, জলে স্থলে প্রভেদ ছিল না, গ্রাম নাই, নগর নাই, নদ নাই, নদী নাই, দ্রষ্টা নাই, দৃশ্য নাই, ভোক্তা ভোজ্য নাই, সমস্ত একাকার—সব শূন্যময়, সেই পৃথিবী আজ শক্তি প্রসাদাৎ হলহলাময় জীবসমা-

* Vide Oliver Goldsmith's Inquiry into the present state of polite learning Ch. V., and Mr Thornhill's Joint History of Holland and Denmark," Ch xii.

কুল নগরনগরীর অপূর্ব্ব শোভায়, শিল্পজাত বৈভবের অদ্ভুদ মিশ্রণে অমরাবতীর সৌন্দর্য্যকেও অধঃকৃত করিয়াছে। পূর্ব্বে এই পৃথিবীর আকাশে নক্ষত্র ফুটিত, সূর্য্য উঠিত, জ্যোৎস্না খেলিত, কিন্তু সে সব শোভা দেখিবার জন্য তখন পৃথিবীতে একটিও চক্ষু উন্মীলিত হইত না, আজ সেই পৃথিবীর মানুষ শক্তির বরে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীদিগকে আকাশ হইতে ভূতলে আনাইয়া আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে। আজি ইহাতে দেশের পর দেশ, নগরের পর নগর, জাতির পর জাতি—কোথাও ধনীর প্রাসাদ, কোথাও নির্ধনের পর্ণকুটীর, কোথাও বিবেকীর ভজনালয়, কোথাও বিলাসীর বিলাসকুঞ্জ। নিম্নে জলে জলযান ছুটিতেছে, তাহার উপর ভূযান ঘর্ঘরচক্রে প্রধাবিত হইতেছে, সে ভূযানের ঊর্দ্ধে ব্যোমযান উড্ডীন হইতেছে। এ সকলই শক্তির বিশ্বজনীন অমোঘ প্রসাদফল। শক্তির জন্যই আজ পৃথিবীর অক্লান্ত আকাঙ্ক্ষা, অবিশ্রান্ত চেষ্টা, অনন্ত উন্নতি, অপ্রতিহত গতি।

যে শক্তির প্রসাদে পৃথিবী শূন্যময় হইতে ক্রমে জীবময় হইয়াছে, মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া পশু পক্ষী কীট আদি যাহার চরণে নিত্য প্রণাম করিতেছে, এই বিশ্বের যাহা প্রাণ, ভূলোকের এই অনন্ত গিরিনদীনির্ঝরিণী, দ্যুলোকের গ্রহউপগ্রহমণ্ডলী প্রতিনিয়তঃ যাহার সেবার কার্য্যে নিরত রহিয়াছে, এই নিশ্চেষ্ট অসাড় জগতে যে আসিয়া প্রথম চেতনা উদ্ভূত করিয়া দিল—সেই শক্তি কি? সৃষ্টির আদি দিনে কেমন করিয়া এই শক্তির জন্ম হইল মানবীয় ইতিহাস তাহা দেখে নাই, তার পর উদ্ভিদসংসার হইতে আরম্ভ করিয়া পশুজীবন এবং পশুজীবনের পর মানবজীবনে সেই শক্তি কি রূপে উপগত হইল, ইতিহাস সে সব তত্বও অনবগত। সে সকল কথা দর্শনের বিষয়ীভূত নহে, তাহা অনুমেয় মাত্র। কিন্তু তার পর যখন মানবজীবনে শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইল, সে সময় হইতে ইতিহাস শক্তির কার্য্য বলিয়া দেয়, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে এই শক্তি আপন কার্য্যের পথ প্রশস্ত করিয়া লইল, সৃষ্টির জীবনীপ্রক্রিয়া হইতে জীবজগতে শক্তি কি প্রকারে স্বাধিকার বিস্তার করিল, ইতিহাস সেই জীবন-চরিতের কথা উল্লেখ করে। সেই ইতিহাসে যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে শক্তি ভিন্ন অন্য কিছু আছে অথবা কিছু হইতে পারে ইহা বলিয়া উপলব্ধি হয় না। শক্তি সৃষ্টির প্রথম বিকাশ, শক্তি সৃষ্টির চরম ফল, শক্তি

জগতে চৈতন্যরূপিণী দেবতা, পৃথিবী সেই শক্তির লীলাভূমি, মানুষ তাহার ক্রীড়াকন্দুক।

মেঘের পর মেঘ আসিয়া প্রলয়ঙ্করী সৃষ্টিবিপ্লাবিনী ঘনঘটার আড়ম্বরে পৃথিবী বিত্রস্ত করিয়া ফেলে, বিন্দুর পর বিন্দু নামিয়া বারিবর্ষণে ভাগিরথীর মত্তস্রোতে ভৈরবনৃত্য প্রদর্শন করে, রেণুর পর রেণু জমিয়া প্রকাণ্ড শৈলে ভূখণ্ড ছাইয়া ফেলে; কিন্তু কে সেই মেঘখণ্ড, সেই বারিবিন্দু বা রেণুকণার বিষয় চিন্তা করিত যদি তাহার শক্তি দেখিতে না পাইত? এ পৃথিবীর মানুষকে কে চিনিত, যদি মানবীয় শক্তি জগতের সমক্ষে আপনার পরিচয় প্রদান করিতে না পারিত? মানুষ শক্তির পূজা করে, মনুষ্য-ইতিহাসে শক্তির অলৌকিক কার্য্যকাণ্ড সকল প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাই লোকে মানুষকে জানিতে চাহে, তাই ইতিহাস পাঠ করিতে লোকের অনুরক্তি জন্মে। যে জাতি শক্তিশূন্য, যাহার উদরে অন্ন জুটে না, অঙ্গে বস্ত্র উঠে না, নীচতার নিম্নতম স্তরে ডুবিয়া পড়িয়াছে, উঠিবার সামর্থ্য নাই, মস্তকোত্তলনপূর্ব্বক জগতের পানে চাহিয়া দেখিবার ক্ষমতা নাই; সে জাতির ইতিহাস লোকে পাঠ করিতে চাহে না। শক্তিশূন্য ইতিহাসে পাঠ করিবার সামগ্রী খুঁজিয়া মিলে না। পক্ষান্তরে, যে জাতি শক্তিসম্পন্ন—যে উচ্ছ্রিতশির, যাহার শক্তির মত্তপ্রবাহিনী দিগদিগন্তে ছাইয়া পড়িয়াছে, রণে যাহার বিজয়-দুন্দুভি ঘনঘোরহ্রাদে বাজিয়া উঠিতেছে, সাহিত্যে যাহার অযুত ভাষার অযুত প্রবাহ ভাগীরথীর ন্যায় শতধারা বিস্তারপূর্ব্বক শত দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, বিজ্ঞান যাহার জন্য আকাশের গ্রহতারা নক্ষত্রদিগকে আনিয়া তাহার সেবার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিতেছে, গণিত যাহাকে কোটি কোটি দূরস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সূক্ষ্মতম রেখানিচয়ের গণনা পর্য্যন্ত বলিয়া দিতেছে, পৃথিবীর উচ্চতম সিংহাসনে বসিয়া রাজরাজেশ্বর হইয়া সদাসর্ব্বক্ষণ যে সুখ ঐশ্বর্য্য ও সম্পদে বিলসিত হইতেছে, লোকে সেই সব জাতির ইতিহাস পাঠ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত, সে সব জাতির ইতিহাসও পাঠ্য বিষয়ে পূর্ণ। শক্তি মানুষের অস্থি মজ্জা।

ইতিহাস মানবীয় শক্তির কথা বর্ণন করে, ইতিহাসে মানুষের উন্নতি অবনতির অবস্থাপর্য্যায় বিবৃত থাকে, কিন্তু তাহা বলিয়া শক্তির উন্নতি অবনতি

নাই। শক্তির উন্নতি কালব্যাপিনী। ইহার অধোগতি নাই। উদয় আছে, বিলয় নাই, উত্থান আছে, পতন নাই। জাতির উত্থান ও পতনের নাম শক্তির উত্থান ও পতন নহে। শক্তির পথ চিরকালই উন্নতিশীল। ইহা চিরদিন সমান রূপে ইহার ভিত্তিভূমিতে অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকে।। তবে, যে জাতি উহার পূজা করে সেই জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়, আর যে জাতি শক্তির পূজায় বিরত রহে সে চিরদিনের জন্য সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। যে জাতি পূর্ব্বে বন্য পশুর সহিত দিন কাটাইত, অঙ্গ যাহার ভূষণ ছিল না, বৃক্ষবল্কল অথবা চিত্ররঞ্জন যাহাদের লজ্জানিবারণ করিত, সেই জাতি আজ শক্তির পূজায় জগতের মধ্যে আপনাকে আদর্শ-স্থানীয় করিয়া তুলিয়াছে, যে পূর্ব্বে মুষ্টি ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইত, সেই আজ ভূপতির আসনে সমাসীন হইয়া জগতের নরপতিসমূহের নিকট স্পর্দ্ধাসহকারে প্রসারিত হস্তে কর চাহিতেছে, যে অজ্ঞ ও অকৃতী লোকেরা পূর্ব্বে উল্কাপাত হইলে আশঙ্কায় অধীর হইত, তাহারাই আজ প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া বজ্রবিদ্যুৎ লইয়া খেলা করিতেছে। যে পূর্ব্বে কথাটি কহিতে অসমর্থ ছিল, আজ তাহারই নিকট ভাষাজ্ঞান ও বর্ণজ্ঞান লাভ করিবার জন্য জগতের নরনারী গুরুর ন্যায় পূজা করিতেছে, যে পূর্ব্বে ভগ্ন ও অবসন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছিল, সেও এক্ষণে শক্তির প্রসাদাৎ চেতনার নূতন স্ফুরণে জাগিয়া উঠিতেছে। আবার যে জাতি এক দিন জগতের মধ্যে রাজচক্রবর্ত্তীর ন্যায় শোভা পাইত, শক্তিহীন হইয়া সেই জাতি আজ পরকীয় পদাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া অঞ্চলবায়ু নিসেবনে অঙ্গবেদনার প্রশমন করিতেছে, যে জাতি এক দিন জ্ঞানে জগৎগুরু বলিয়া আসমুদ্রক্ষিতির পূজা পাইত, সেই জাতি আজ শক্তির বিরহে অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকার মধ্যে নিমজ্জিত হইতেছে। যে রাজ্য এক দিন প্রাসাদের পর প্রাসাদে, হলহলাময় পণ্যবীথিকার অমৃতশ্রেণিমালায় পৃথিবীর আভরণ স্বরূপ ছিল, সেই রাজ্য আজ শক্তির অবর্ত্তমানে শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়া গৃধ্রশকুনির আবাসস্থল হইয়াছে। শক্তির অভাবেই অবনতির দশা আরম্ভ হয়। কিন্তু শক্তির একমাত্র পথ উন্নতি।

যখন দেখি, বিদ্রোহের পর বিদ্রোহে, বিপ্লবের পর বিপ্লবে, সমাজ বিধ্বস্ত

নের পর সমাজবিবর্ত্তনে পৃথিবী পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িতেছে, আকাশের বজ্র-বিদ্যুৎ মেঘের সঙ্গে মিশিয়া বিরাটশব্দে ভূমণ্ডল আপূরিত করিতেছে, প্রাসাদের পর প্রাসাদ পড়িয়া যাইতেছে, বন্ধনের পর বন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, রাজ্যের পর রাজ্যের পতন হইতেছে, সমাজের পর সমাজ শতধা বিদারিত হইতেছে, মঠে, মন্দিরে, রাজপথে, পান্থশালায়, সর্ব্বত্র রুধির স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে, ধর্ম্মের শাসন, নীতির শাসন, সমাজের শাসন, সকলই সেই রুধিরধারায় ভাসিয়া যাইতেছে, অকস্মাৎ দিবা দ্বিপ্রহরে শিবা সকল অমঙ্গল চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, ধর্ম্মশালার চূড়ার উপর শকুনি ভীষণ পক্ষ বিস্তার করিয়া উড্ডীয়মান হইতেছে, বালকেরা মাতৃস্তন মুখে দিয়া ঘুমাইতে ঘুমাইতে বিকট রবে কাঁদিয়া উঠিতেছে, সিংহাসন হইতে শালগ্রাম-শিলা গড়াইয়া পড়িতেছে, এইরূপ ভয়াবহ ঘটনার ঝটিকা উত্তোলন করিয়া প্রকৃতি রণরঙ্গিনীবেশে চামুণ্ডার ভৈরব নৃত্য খেলাইতেছে; আর পৃথিবীর নর নারী আশঙ্কার গভীরতম কূপে নিমজ্জিত হইয়া থর থর কাঁপিতেছে, তখন বুঝিতে পারি, এ সমস্ত শক্তির ক্রীড়া। শ্রাবণের কূলপ্লাবী উন্মত্তগতি স্রোতঃস্বতীর পথ কে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবে? অজ্ঞ ও ভীরু জনেরা যাহা দেখিয়া আতঙ্কে শীহরিয়া উঠে, ইতিহাস সে স্থলে শক্তির ক্রীড়া দেখাইয়া মানবমনকে বিস্মিত এবং স্তম্ভিত করে। শক্তি কখন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে যেখানে ঘনঘোর অন্ধকার রাজত্ব করিত, শক্তির প্রসাদাৎ সেই স্থানে সুরপুরের আলোকবিভা উজলিতে থাকে। শক্তির অমৃতময় স্রোতের পুণ্যপ্রবাহে কঙ্করময় ভূমেও প্রমোদমালঞ্চ শোভা পায়। যে স্থলে চৈত্র-রৌদ্রের খরদাহে ভীষণ মরুভূমির তপ্তবালুকণা অনল বর্ষণ করিত, শক্তির অমৃতপ্রোক্ষণে সে স্থল কালে বৃক্ষের নাচনি, পত্রের দোলনি ও পক্ষীর কুজনিতে নন্দনকাননের অতুল সৌন্দর্য্যকে পরাভূত করে।

শক্তির যে চিত্র প্রদর্শিত হইল, তাহা অতিরঞ্জন নহে। অতীতসাক্ষী ইতিহাস তাহার বহুদর্শিতার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া এখনও এ কথা সাধারণ্যে জ্ঞাপন করিতেছে। বিজ্ঞানগর্ব্বিত আমেরিকা বল, বাহুবলদৃপ্ত ইউরোপ বল, শ্রীভ্রষ্ট সৌভাগ্যচ্যুত আফ্রিকা বল, আর পরপদলাঞ্ছিত হৃতসর্ব্বস্ব এসিয়া বল, কোনও স্থলে এ বিধানের অব্যাপ্তি নাই। ঊর্দ্ধে, নিম্নে, উভয়

পার্শ্বে যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই শক্তির সর্ব্বময় প্রভুত্ব দেখিতে পাই। যাহার শক্তি আছে, যে শক্তি পূজা করিতে শিখিয়াছে, সেই প্রভু, সেই অসঙ্কুচিতচিত্তে অপরের মস্তকে পদাঘাত করিতেছে। আর যাহার সে শক্তি নাই, যে শক্তি পূজা কাহাকে বলে জানে না, শক্তি পূজা কখন শিখে নাই, সে সেই শক্তিমানের চরণে দাসখত লিখাইয়া দিয়া নিঃশব্দে তাহার পাদুকাচিহ্ন আপনার বক্ষে ধারণ করিতেছে। প্রসিয়ার শক্তি ছিল, আর ফ্রান্স হৃতশক্তি হইয়া পড়িয়াছিল, তাই প্রসিয়ার প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া ফ্রান্স আজও ক্ষতদেহে প্রলেপ দিতেছে। অথচ এক সময়ে শক্তির বলে এই ফ্রান্সের নাম মাত্র শ্রবণে সমগ্র ইউরোপভূমি থর থর কাঁপিয়া উঠিত। ইতালির দিকে চাহিয়া দেখ। যখন ইহার নির্ম্মল আকাশে শক্তির দীপ্ত সূর্য্য কিরণ বিস্তার করিত তখন ইতালি অনন্তরত্নভূষণা রাজরাজেশ্বরী জগতের পূজার পাত্রী। সমর দুর্ম্মদ বীরবৃন্দের বিরাট হুঙ্কারে ভূমধ্য সাগর হইতে দূর প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত টল টল করিয়া উছলিয়া উঠিত, কূটতন্ত্রী নীতিবীরদিগের ভুবনভুলান উন্মাদকর বক্তৃতায় ফোরম হইতে সমগ্র দেশের শিরায় শিরায় তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালিত হইত, ক্রোড়স্থ শিশু পর্য্যন্ত প্রত্যাগত বিজয়ী পিতাকে দেখিয়া উল্লাসের উচ্চহাসি হাসিয়া সেই কটিবিলম্বিত শাণিত কৃপাণফলকের প্রতি ক্ষুদ্র কর প্রসারিত করিত, বিদ্যামন্দির দূরাগত ছাত্রমণ্ডলির কণ্ঠরবে সর্ব্বক্ষণ আপূরিত রহিত, ইতালির ধর্ম্মতীর্থের দ্বারদেশে কোটি যোজন দূর হইতে নর নারী আসিয়া হত্যা দিত। অকস্মাৎ ভাগ্যের চক্র ঘুরিয়া আসিল। ইতালির নির্ম্মল আকাশে যে শক্তির দীপ্তসূর্য্য ক্রীড়া করিতেছিল অকস্মাৎ তাহা গাঢ়তম তিমিরাচ্ছন্নতায় ঢাকিয়া পড়িল। ইতালি শক্তি হারাইল। শক্তির অন্তর্দ্ধানে ইতালির গৌরবেরও অন্তর্দ্ধান হইল। ইতালি উন্নতির ঊর্দ্ধতম সোপান হইতে অবনতির নিম্নতম তলে অধঃপতিত হইল। এই পীড়িত ভারতেও ঐরূপ এক সময়ে শক্তির অভিনয় হইয়াছিল, তখন ভারতের রাজদ্বারে আসিয়া দেশ বিদেশস্থ নৃপতিসমাজ করপুটে দণ্ডায়মান থাকিত, তখন জগৎমান্য বীরকেশরী ভারতের নিকট পরাজয় মানিয়া কলঙ্কের কালিমা মাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, ইহার বীরবৃন্দের জ্যানির্ঘোষ ও ধনুষ্টঙ্কারে সুপ্ত পৃথিবী সন্ত্রাসে বিনিদ্র হইয়া পড়িত, বীরপত্নীদিগের অলোকসামান্য বীরত্বকাহিনী

প্রবণে এবং সেই গগণস্পর্শী অনলধূমোদ্গারিণী জ্বলন্তচিতায় আত্ম সমর্পণ সন্দর্শনে চমকিত ও স্তব্ধীভূত হইত, ইহার অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার বীরদাপে ও অস্ত্রঝঞ্ঝনায় মেদনী বিকম্পিত হইত, সনাতনধর্ম্মময় সামগানের মধুর নিঃস্বনে প্রবল নাস্তিকের হৃদয়েও প্রীতির উচ্ছ্বাস পবিত্রতার উচ্ছ্বাস উছলিয়া উঠিত তখন ইহার সাহিত্য গণিত বিজ্ঞান দিগন্তবিশ্রুত বিশ্বপ্লাবী প্রশস্যতম জাতি-সাধারণের শিক্ষার সামগ্রী। ভারত তখন পূরভোগ্য সম্পদের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণ-তায় জাতিসমিতির মধ্যে রাজরাজমহিষী। কিন্তু সে দিন স্থায়ী হইল না। ভারত শক্তির পূজা ত্যাগ করিয়া শান্তির আরাধনা আরম্ভ করিল। 'শান্তির্যস্য গেহিনী' এই বলিয়া ভারতের তদানীন্তন মহাপুরুষেরা বিশ্বজনীন প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। শক্তির বুঝি তাহা সহিল না। শক্তির অভি-সম্পাতে পথের ভিখারী আজ ইহার রাজমুকুটে পদাঘাত করিতেছে। আর নীরবে আনত মস্তকে সেই চরণরেণু মাথায় করিয়া ভারত আপ-নার দিন কাটাইতেছে।

অপিচ, কল্পনাবলে এই ভারতের কবি এক দিন শক্তির যে ভৈরবী ক্রীড়ার গাথা গাহিয়াছিলেন, জগৎ তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল। আমে-রিকার অস্তিত্ব যখন লোকলোচনপথে অপ্রকাশিত ছিল, মিসর যখন নীল নদের মৃদুমন্দ কলধ্বনি শুনিতে শুনিতে হিন্দোলদোলায় বাল্যক্রীড়া প্রদর্শন করিত, য়ুরোপমহিষী রোম যখন ভূমধ্যসাগরের অনন্তগর্ভে শায়িত ছিল, ক্ষুদ্র দ্বীপ ইংলণ্ডের কথা মনে করিতেও লোকে যখন ঘৃণা বোধ করিত, সমাজের সেই আদিম অবস্থায় ভারতের কবি কল্পনায় যে শক্তির উন্মাদনৃত্য দেখাইয়া-ছেন, তাহা ভুলিবার নহে। পৃথিবী দানবদিগের উপদ্রবে উপদ্রুত, সুরবৃন্দ স্বর্গচ্যুত, নর নারী সদাশঙ্কিত, রুধিরধারায় ক্ষিতিতল ভাসিয়া যাইতেছে, দানবদিগের সর্ব্বংকষ প্রতাপের ডরে সুরনর থর থর কাঁপিতেছে, এ সংসার প্রায়প্রাণিশূন্য, হৃতসৌভাগ্য কেবল অসুরদিগের অত্যাচারকারিতার যাদৃচ্ছিক বিলাসভূমি; সেই সময় মাভৈর্মাভৈঃ শব্দে পীড়িতদিগের জন্য রণরঙ্গিনী বেশে মহাশক্তি অবির্ভূতা হইয়াছিলেন। চক্ষে দৃষ্টি নাই, তাহা প্রতিহিংসার জ্বলন্ত অনল জ্বলিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রুধিরস্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে, গলে সদ্যঃচ্ছিন্ন নৃমুণ্ডমালা দুলিতেছে, হস্তে ভীমখড়্গ শোভা পাইতেছে, অদূরস্থ

খর্পরের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া সে ভীমখড়্গ আরো ভীমতর দেখাইতেছে, বিকট হুঙ্কার ছাড়িয়া অট্টহাসে কিটি কিটি ধ্বনি করিতেছে, লোল রসনা অসুররক্তে উন্মাদিনী তৃষ্ণার সন্তর্পণ করিতেছে। সেই মহাশক্তির প্রসাদাৎ অসুরদিগের নাশ হইল, পীড়িতেরা পরিত্রাণ পাইল, শ্মশানশবে চেতনার সঞ্চার হইল। সেই অবধি গৃহে গৃহে সেই রণচণ্ডী মহাশক্তির পূজা আরম্ভ হইল। অধিকাংশ নর শাক্ত হইল। কবি শক্তি-কল্পনার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। কিন্তু হায় সেই শাক্তসন্তান আজ নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় এবং নিস্পন্দ। দেবভোগ শৃগালোচ্ছিষ্ট, প্রমোদমালঞ্চ কণ্টকাকীর্ণ, রাজাধিরাজ ভিক্ষুকের চরণাশ্রিত। সকলই শক্তির বিরহ জন্য।

নিয়তির চক্র অহরহঃ বিঘূর্ণিত হইতেছে, সেই চক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া জাতি সাধারণ কখন উঠিতেছে, কখন পড়িতেছে, কখন বা শক্তিবিরহিত হইয়া দুর্ভাগ্যের অতল সলিলে ডুবিয়া যাইতেছে, আবার কখন বা শক্তির কর্ণাবলম্বে সেই সাগরের উপর দেহ জাগাইয়া ভাসিয়া উঠিতেছে। ফ্রান্সে যে অধঃপতনের তামসী নিশা আঁধার বিস্তার করিয়াছিল; শক্তির প্রসাদাৎ ক্রমে তথায় অভ্যুত্থানের নবীন রবি আপনার বালকিরণ প্রকাশ করিতেছে। ইতালিও ধীরে ধীরে পুনর্জীবনে উজ্জীবিত হইতেছে, ম্যাটসিনী ইহাকে যে শক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন তাহার বরে নির্ব্বাণগত বহ্নি পুনর্ব্বার বিধূমিত হইতেছে। কিন্তু হায়! ভারতে আবার কবে শক্তির প্রসাদফল দেখিতে পাইব? শক্তির বাহু পসারিয়া পতিত ভারত আবার কবে উঠিতে চেষ্টা করিবে, কবে এ শুষ্ক মালঞ্চে কুসুম ফুটিয়া সৌরভ ছড়াইবে, কবে এ ঘোরান্ধতামর দুঃখের দুর্দ্দিন ঘুচিয়া অনভ্র যামিনীর কৌমুদীবিভা বিকসিত হইবে? ভারত কবে শক্তির মর্ম্ম বুঝিবে? এ শ্মশানভূমে শবদেহে চেতনা প্রস্ফুরণ করিবার জন্য কোন্ মহাপুরুষ আসিয়া শক্তির মহামন্ত্র দীক্ষা দিবেন? ঘরে ঘরে আবার কবে শক্তির পূজা দেখিতে পাইব? শক্তির প্রীণনও পরিপোষণ ভিন্ন মনুষ্যের উন্নতিচেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

বসুমতীর বসন্তসমাগম।

এক দিন দেবী, দেবী বসুমতী
বসন্তে আগত দেখি,
ডাকি প্রকৃতিরে কন মৃদুভাবে
'শুন ওই প্রিয় সখি!
দেব শীতঋতু দেখ অপসৃত,
মধু আগত ধরায়।
দুরন্ত শিশিরে দেহ শুষ্ক মম,
নাহি আভরণ তায়॥
ঋতুরাজ দেবে পরিহাস বাণী
বড়ই বাজে আমার।
তেঁই মানিতেছি ফুল আভরণ,
না ল'ব তাঁহার আর,
যাও ত্বরা তুমি পুত্রগণ হতে,
আনি দেহ রত্ন সাজ।'
এত শুনি তবে প্রকৃতি সুন্দরী
পশিলা অবনী মাঝ।
বহু অন্বেষণে বিবিধ ভূষণে,
পুন তথা উতরায়।
প্রণমিয়া পদে বসিয়া যতনে
দেবীরে সাজায়ে দেয়।

সহৃদয় রাগ স্নিগ্ধ বিলেপনে,
মাজিয়া তনুয়া খানি।
দিব্য শোভমান শান্তি শুভ্রবাস
যতনে দিল পিধানি।
সোহাগ মার্জ্জনে মাজি কেশগুলি,
বিননি বিনাল তারে।
বাঁধিয়া কবরী সধবা-সিন্দুরে,
রঞ্জিল সীমন্ত পরে,

অনুতাপ অশ্রু পবিত্র উদকে,
ধৌত করি পাদুখানি।
ভক্তি নিরমল অলক্তক রাগে
আঁকিল তাহে যতনি।
পাতিব্রত্য চারু রতন কঞ্চুলি
কসি পীন উরস্থলি।
সম্মোহিত রাগ উজ্জ্বল পরাগ
রঙ্গিল অলকাবলী।
পবিত্রতা-দীপ্ত অক্ষয় কবচ,
কসিয়া কোমল করে।
মিত্রতা মহার্ঘ মনিময়াঙ্গুরী,
আঁটিল অঙ্গুলি পরে।

দিব্য আভাময় দাম্পত্য বলয়,
বলয়ি ভুজ মৃণালে।
ঔদার্য্য ভূষণ হীরক প্রসূন,
ফুটিল কুন্তল জালে॥
নম্রতা সরল অমূল্য রতন,
উজলি সীমন্ত পরে।
শোভিয়া সুচারু উরঃস্থল চারু,
বিবেক-মৌক্তিক হারে,
বিনয় হরিত, গোলাপ কলিকা
দুলিয়া শ্রবণপুটে,
কীর্ত্তি-উজ্জলিত, রতন মেখলা
ভাতিল নিতম্বতটে।
শিশু মুখে হাঁসি, চরণ কমল,
ফুটিয়া চরণযুগে।
উপাসনা-স্তোত্র, নূপুরঝুমুর,
বাজিল অঙ্গুলিভাগে।
স্নেহ-স্নেহময় অঞ্জন রেখায়,
স্নিগ্ধিয়া নয়নতলে,
সরলতাসুধা কুঙ্কুমের রাগে,
রঞ্জিল অধর দলে।

সজ্জা আভরণ, চারু ওড়নায়,
বেড়িয়া তনুয়াপরে।
দিব্য সুরভিত প্রসন্নতাবাস,
বর্ষিল তাহার পরে।
সুবেশ রচিত হেরি হরষিত,
সখীরে বিদায়দেন।
স্মরিয়া অন্তরে হরিত বাসরে,
ধীরে তথা উতরান।
মধুচর যত সবে পুলকিত,
বন্দিল দেবীর পদে।
গুঞ্জরিল অলি কুহরিল পিক্
বর্ষিল ফুল আমোদে॥
শুনি দূতধ্বনি কেশব নৃপমণি,
সুখে উপনীত আসি।
দেবী অগ্রসর হইয়া সত্বর,
সাদরে লন সম্ভাষি॥
নব বেশে হেরি মোহিত রাজন,
হাসিয়া চুম্বিলা করে,
হরষিত মতি যুগল দম্পতী,
বৈসে ফুলাসন পরে॥

ডারুইন ও জীবরহস্য।

ভই কেন প্রতিভাশালী হউক না, জীবিতাবস্থায় তাহার সে প্রতিভার আদর ততদূর থাকে না। এক জন ইতিহাসবেত্তা বিস্তর দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"এই পৃথিবী স্বর্গ হইত, যদি মনুষ্য তাঁহার সমকালীন মনুষ্যকে চিনিতে পারিত।" আমাদের চলিত ভাষায় সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, যে দাঁত থাকিতে কেহ দাঁতের মর্য্যাদা জানে না। বাস্তবিক এক জন ব্যক্তির যশ ও অপযশের বিষয় যেরূপ তাহার মৃত্যুর পর জানা যায়—জীবিতা-

বস্থায় ঠিক করা যাইতে পারে না, সেইরূপ প্রতিভাবিশিষ্ট লোকের প্রতিভার গভীরতা অনুধাবন করা তাহার জীবিতাবস্থায় হয় না। এই কারণেই গেলিলিওর (Galilio) পরিশ্রম বৃথা হইতেছে বলিয়া তাঁহার সমকালীন লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত। এই জন্যই নিউটন (Newton) তাঁহার জীবিতাবস্থায় উপযুক্ত সম্মান পান নাই। আর এই জন্যেই ডাক্তার হারভি (Harvey) সমব্যবসায়ীদিগের নিকট অপমানিত হইয়া ছিলেন। বিজ্ঞান ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, এখানেও আমরা এই বিষয়ে অন্যভাব দেখি না। কবিকুলগুরু হোমার যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, পথে পথে ভিক্ষা করিয়া দিন কাটাইতেন কেহ তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিত না আজ তাঁহার মৃত্যুর শত যুগ পরে গ্রীসের সাতটা নগর তাঁহার জন্মভূমিত্বের জন্য দাবি করিতেছে। জীবিতাবস্থায় সাহিত্য-জগতে যদি মিলটনের আদর থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার প্যারেডাইস্ লষ্টের Paradise Lost কাপি রাইট অত অল্প মূল্যে বিক্রয় হইত না। যে সেক্সপীয়ারকে কবিকুল চূড়ামণি বলিয়া ইংলণ্ড গর্ব্ব করিয়া থাকে, সুসভ্য ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াও জীবিতাবস্থায় উপযুক্ত সম্মান লাভ করা তাঁহারও অদৃষ্টে ঘটে নাই। বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্য জগতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় অন্যান্য বিষয়ে ও অবিকল এই রূপ। পূর্ব্বে যেরূপ হইয়া গিয়াছে এখন ও সেইরূপ চলিতেছে। মহাত্মা ডারুইন Darwin তাহার প্রমাণ।

বৈজ্ঞানিক ডারুইন এদেশের শিক্ষিত লোকের নিকট অপরিচিত নহেন; সে দিন তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে সকল শিক্ষিত ভারতবাসী শোকে অধীর হইয়া ছিলেন; কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় এই যে ডারুইন সম্বন্ধে এই দেশীয় অনেক শিক্ষিত লোকেরও ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ডারুইন মনুষ্যবংশকে বানরবংশ সম্ভূত বলিয়াছেন বলিয়া অনেকেই তাঁহার নাম মাত্র শ্রবণে তাঁহাকে উপাহাস ও ঘৃণা করিয়া থাকেন। এমন কি বাঙ্গালা ভাষায় অনেক নাটকে পর্য্যন্ত তাঁহার কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে গালি দেওয়া হইয়াছে। * কিন্তু যিনি কেবল এই বিষয়ে তাঁহার অকাট্য যুক্তি ও অপরিসীম চিন্তা শক্তির পরিচয়

* শরৎসরোজিনী, একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব প্রভৃতি পুস্তক দেখ।

পাইয়াছেন, তিনিই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার নিকট স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে তাঁহাকে পূজা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বড় দুঃখের বিষয় এই যে ডারুইন কি স্বদেশে কি বিদেশে কোথায় সাধারণের উপযুক্ত সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। জীবিতাবস্থায় উপযুক্ত সম্মান না পাইলেও ডারুইনের পরিশ্রম বৃথা হয় নাই। আমাদের বিশেষ ভরসা আছে, শীঘ্রই তাঁহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে একটী বিপ্লব উপস্থিত হইবে। বঙ্গদেশে এই মাহাত্মার নাম অনেকেই শুনিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার রচিত পুস্তকের ততদূর আদর এ দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ, এখানে বিজ্ঞানের এই সূত্রপাত হইতেছে, তাহাতে ডারুইনের ন্যায় এক জন উচ্চদরের বৈজ্ঞানিক বিলাসপ্রিয় বাঙ্গালির হৃদয়ে সহজে স্থান পাইতে পারে না। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, যে ডারুইনের মৃত্যুর পর অবধি ইউরোপের জনসাধারণের তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ইউরোপে যাহা হইতেছে ভারতেও তাহা হওয়া উচিত, সেই জন্য তাঁহার অসীম অধ্যবসায় চিন্তাশক্তি ও সত্যানুরাগের আভাস মাত্র দিবার জন্য তাঁহার প্রণীত Origin of the Species (বর্ণোৎপত্তি) নামক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আজ আমরা এই প্রবন্ধ লিখিলাম।

এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলে কত কোটি কোটি জীব রহিয়াছে। এই কোটি কোটি জীব কিরূপে সৃষ্ট হইল, ইহাদের মধ্যে কাহার সহিত কাহার কিরূপ সম্বন্ধ আছে; এক জাতীয় জীবের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জীব কিরূপে হইল, ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে সৃষ্টির শীর্ষস্থানীয় মনুষ্য পর্য্যন্ত কিরূপে উৎপন্ন হইল; ইহাদের উৎপত্তির মূল কারণ কয়টি জীব; পূর্ব্বে যে সকল জীব পৃথিবীতে ছিল তাহাদের এক কালীন ধ্বংস কিরূপে হইল, আবার তাহাদের স্থানে নূতন নূতন জীবের সৃষ্টি হইলইবা কিরূপে, এক দিন এই সকল গভীর চিন্তা ডারুইনের মনে উদয় হইয়াছিল। তিনি এই সকল গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য যেরূপ অধ্যবসায় পরিশ্রম ত্যাগস্বীকার এবং সত্যানুরাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা মানব ইতিহাসে অতুলনীয়। ঐ সকল গভীর প্রশ্ন যে সর্ব্ব

পার্শ্বে যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই শক্তির সর্ব্বময় প্রভুত্ব দেখিতে পাই। যাহার শক্তি আছে, যে শক্তি পূজা করিতে শিখিয়াছে, সেই প্রভু, সেই অসঙ্কুচিতচিত্তে অপরের মস্তকে পদাঘাত করিতেছে। আর যাহার সে শক্তি নাই, যে শক্তি পূজা কাহাকে বলে জানে না, শক্তি পূজা কখন শিখে নাই, সে সেই শক্তিমানের চরণে দাসখত লিখাইয়া দিয়া নিঃশব্দে তাহার পাদুকাচিহ্ন আপনার বক্ষে ধারণ করিতেছে। প্রসিয়ার শক্তি ছিল, আর ফ্রান্স হতশক্তি হইয়া পড়িয়াছিল, তাই প্রসিয়ার প্রহারে জর্জরিত হইয়া ফ্রান্স আজও ক্ষতদেহে প্রলেপ দিতেছে। অথচ এক সময়ে শক্তির বলে এই ফ্রান্সের নাম মাত্র শ্রবণে সমগ্র ইউরোপভূমি থর থর কাঁপিয়া উঠিত। ইতালির দিকে চাহিয়া দেখ। যখন ইহার নির্ম্মল আকাশে শক্তির দীপ্ত সূর্য্য কিরণ বিস্তার করিত তখন ইতালি অনন্তরত্নভূষণা রাজরাজেশ্বরী জগতের পূজার পাত্রী। সমর দুর্ম্মদ বীরবৃন্দের বিরাট হুঙ্কারে ভূমধ্য সাগর হইতে দূর প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত টল টল করিয়া উছলিয়া উঠিত, কূটতন্ত্রী নীতিবীরদিগের ভুবনভুলান উন্মাদকর বক্তৃতায় ফোরম হইতে সমগ্র দেশের শিরায় শিরায় তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালিত হইত, ক্রোড়স্থ শিশু পর্য্যন্ত প্রত্যাগত বিজয়ী পিতাকে দেখিয়া উল্লাসের উচ্চহাসি হাসিয়া সেই কটিবিলম্বিত শাণিত কৃপাণফলকের প্রতি ক্ষুদ্র কর প্রসারিত করিত, বিদ্যামন্দির দূরাগত ছাত্রমণ্ডলির কণ্ঠরবে সর্ব্বক্ষণ আপুরিত রহিত, ইতালির ধর্ম্মতীর্থের দ্বারদেশে কোটি যোজন দূর হইতে নর নারী আসিয়া হত্যা দিত। অকস্মাৎ ভাগ্যের চক্র ঘুরিয়া আসিল। ইতালির নির্ম্মল আকাশে যে শক্তির দীপ্তসূর্য্য ক্রীড়া করিতেছিল অকস্মাৎ তাহা গাঢ়তম তিমিরান্ধতায় ঢাকিয়া পড়িল। ইতালি শক্তি হারাইল। শক্তির অন্তর্দ্ধানে ইতালির গৌরবেরও অন্তর্দ্ধান হইল। ইতালি উন্নতির ঊর্দ্ধতম সোপান হইতে অবনতির নিম্নতম তলে অধঃপতিত হইল। এই পীড়িত ভারতেও ঐরূপ এক সময়ে শক্তির অভিনয় হইয়াছিল, তখন ভারতের রাজদ্বারে আসিয়া দেশ বিদেশস্থ নৃপতিসমাজ করপুটে দণ্ডায়মান থাকিত, তখন জগৎমান্য বীরকেশরী ভারতের নিকট পরাজয় মানিয়া কলঙ্কের কালিমা মাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, ইহার বীরবৃন্দের জ্যানির্ঘোষ ও ধনুষ্টঙ্কারে সুপ্ত পৃথিবী সত্রাসে বিনিদ্র হইয়া পড়িত, বীরপত্নীদিগের অলোকসামান্য বীরত্বকাহিনী

শ্রবণে এবং সেই গগণস্পর্শী অনলধূমোদ্গারিণী জ্বলন্তচিতায় আত্ম সমর্পণ সন্দর্শনে চমকিত ও স্তব্ধীভূত হইত, ইহার অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার বীরদাপে ও অস্ত্রঝঞ্ঝনায় মেদনী বিকম্পিত হইত, সনাতনধর্ম্মময় সামগানের মধুর নিঃস্বনে প্রবল নাস্তিকের হৃদয়েও প্রীতির উচ্ছ্বাস পবিত্রতার উচ্ছ্বাস উছলিয়া উঠিত তখন ইহার সাহিত্য গণিত বিজ্ঞান দিগন্তবিস্তৃত বিশ্বপ্লাবী প্রশস্যতম জাতি-সাধারণের শিক্ষার সামগ্রী। ভারত তখন শূরভোগ্য সম্পদের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণ-তায় জাতিসমিতির মধ্যে রাজরাজমহিষী। কিন্তু সে দিন স্থায়ী হইল না। ভারত শক্তির পূজা ত্যাগ করিয়া শান্তির আরাধনা আরম্ভ করিল। 'শান্তির্যস্য গেহিনী' এই বলিয়া ভারতের তদানীন্তন মহাপুরুষেরা বিশ্বজনীন প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। শক্তির বুঝি তাহা সহিল না। শক্তির অভি-সম্পাতে পথের ভিখারী আজ ইহার রাজমুকুটে পদাঘাত করিতেছে। আর নীরবে আনত মস্তকে সেই চরণরেণু মাথায় করিয়া ভারত আপ-নার দিন কাটাইতেছে।

অপিচ, কল্পনাবলে এই ভারতের কবি এক দিন শক্তির যে ভৈরবী ক্রীড়ার গাথা গাহিয়াছিলেন, জগৎ তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল। আমে-রিকার অস্তিত্ব যখন লোকলোচনপথে অপ্রকাশিত ছিল, মিসর যখন নীল নদের মৃদুমন্দ কলধ্বনি শুনিতে শুনিতে হিন্দোলদোলায় বালাক্রীড়া প্রদর্শন করিত, য়ুরোপমহিষী রোম যখন ভূমধ্যসাগরের অনন্তগর্ভে শায়িত ছিল, ক্ষুদ্র দ্বীপ ইংলণ্ডের কথা মনে করিতেও লোকে যখন ঘৃণা বোধ করিত, সমাজের সেই আদিম অবস্থায় ভারতের কবি কল্পনায় যে শক্তির উন্মাদনৃত্য দেখাইয়া-ছেন, তাহা ভুলিবার নহে। পৃথিবী দানবদিগের উপদ্রবে উপক্রত, সুরবৃন্দ স্বর্গচ্যুত, নর নারী সদাশঙ্কিত, রুধিরধারায় ক্ষিতিতল ভাসিয়া যাইতেছে, দানবদিগের সর্ব্বংকষ প্রতাপের ডরে সুরনর থর থর কাঁপিতেছে, এ সংসার প্রায়প্রাণিশূন্য, হৃতসৌভাগ্য কেবল অসুরদিগের অত্যাচারকারিতার যাদৃচ্ছিক বিলাসভূমি; সেই সময় মাভৈর্মাভৈঃ শব্দে পীড়িতদিগের জন্য রণরঙ্গিনী বেশে মহাশক্তি অবিভূর্তা হইয়াছিলেন। চক্ষে দৃষ্টি নাই, তাহা প্রতিহিংসার জ্বলন্ত অনল জ্বলিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রুধিরস্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে, গলে সদ্যঃছিন্ন নৃমুণ্ডমালা দুলিতেছে, হস্তে ভীমখড়্গ শোভা পাইতেছে, অদূরস্থ

খর্পরের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া সে ভীমখড়্গ আরো ভীমতর দেখাইতেছে, বিকট হুঙ্কার ছাড়িয়া অট্টহাসে কিটি কিটি ধ্বনি করিতেছে, লোল রসনা অসুররক্তে উন্মাদিনী তৃষ্ণায় সন্তর্পণ করিতেছে। সেই মহাশক্তির প্রসাদাৎ অসুরদিগের নাশ হইল, পীড়িতেরা পরিত্রাণ পাইল, শ্মশানশবে চেতনার সঞ্চার হইল। সেই অবধি গৃহে গৃহে সেই রণচণ্ডী মহাশক্তির পূজা আরম্ভ হইল। অধিকাংশ নর শাক্ত হইল। কবি শক্তি-কল্পনার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। কিন্তু হায় সেই শাক্তসন্তান আজ নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় এবং নিস্পন্দ। দেবভোগ শৃগালোচ্ছিষ্ট, প্রমোদমালঞ্চ কণ্টকাকীর্ণ, রাজাধিরাজ ভিক্ষুকের চরণাশ্রিত। সকলই শক্তির বিরহ জন্য।

নিয়তির চক্র অহরহঃ বিঘূর্ণিত হইতেছে, সেই চক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া জাতি সাধারণ কখন উঠিতেছে, কখন পড়িতেছে, কখন বা শক্তিবিরহিত হইয়া দুর্ভাগ্যের অতল সলিলে ডুবিয়া যাইতেছে, আবার কখন বা শক্তির কর্ণাবলম্বে সেই সাগরের উপর দেহ জাগাইয়া ভাসিয়া উঠিতেছে। ফ্রান্সে যে অধঃপতনের তামসী নিশা আঁধার বিস্তার করিয়াছিল; শক্তির প্রসাদাৎ ক্রমে তথায় অভ্যুত্থানের নবীন রবি আপনার বালকিরণ প্রকাশ করিতেছে। ইতালিও ধীরে ধীরে পুনর্জ্জীবনে উজ্জীবিত হইতেছে, ম্যাটসিনী ইহাকে যে শক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন তাহার বরে নির্ব্বাণগত বহ্নি পুনর্ব্বার বিধূমিত হইতেছে। কিন্তু হায়! ভারতে আবার কবে শক্তির প্রসাদফল দেখিতে পাইব? শক্তির বাহু পসারিয়া পতিত ভারত আবার কবে উঠিতে চেষ্টা করিবে, কবে এ শুষ্ক মালঞ্চে কুসুম ফুটিয়া সৌরভ ছড়াইবে, কবে এ ঘোরান্ধতামস দুঃখের দুর্দ্দিন ঘুচিয়া অনভ্র যামিনীর কৌমুদীবিভা বিকসিত হইবে? ভারত কবে শক্তির মর্ম্ম বুঝিবে? এ শ্মশানভূমে শবদেহে চেতনা প্রস্ফুরণ করিবার জন্য কোন্ মহাপুরুষ আসিয়া শক্তির মহামন্ত্র দীক্ষা দিবেন? ঘরে ঘরে আবার কবে শক্তির পূজা দেখিতে পাইব? শক্তির প্রীণনও পরিপোষণ ভিন্ন মনুষ্যের উন্নতিচেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

বসুমতীর বসন্তসমাগম।

এক দিন দেবী, দেবী বসুমতী
বসন্তে আগত দেখি,
ডাকি প্রকৃতিরে কন মৃদুভাষে
'শুন ওই প্রিয় সখি!
দেব শীতঋতু দেশ অপসৃত,
মধু আগত ধরায়।
দুরন্ত শিশিরে দেহ শুষ্ক মম,
নাহি আভরণ তায়॥
ঋতুরাজ দেবে পরিহাস বাণী
বড়ই বাজে আমার।
তেঁই মানিতেছি ফুল আভরণ,
না ল'ব তাঁহার আর,
যাও ত্বরা তুমি পুত্রগণ হতে,
আনি দেহ রত্ন সাজ।'
এত শুনি তবে প্রকৃতি সুন্দরী
পশিলা অবনী মাঝ।
বহু অন্বেষণে বিবিধ ভূষণে,
পুন তথা উতরায়।
প্রণমিয়া পদে বসিয়া যতনে
দেবীরে সাজায়ে দেয়।

সহৃদয় রাগ স্নিগ্ধ বিলেপনে,
মাজিয়া তনুয়া খানি।
দিব্য শোভমান শান্তি শুভ্রবাস
যতনে দিল পিধানি।
সোহাগ মার্জ্জনে মাজি কেশগুলি,
বিননি বিনাল তারে।
বাঁধিয়া কবরী সধবা-সিন্দুরে,
রঞ্জিল সীমন্ত পরে,

অনুতাপ অশ্রু পবিত্র উদকে,
ধৌত করি পাদুখানি।
ভক্তি নিরমল অলক্তক রাগে
আঁকিল তাহে যতনি।
পাতিব্রত্য চারু রতন কঞ্চুলি
কসি পীন উরস্থলি।
সম্মোহিত রাগ উজল পরাগ
রঞ্জিল অলকাবলী।
পবিত্রতা-দীপ্ত অক্ষয় কবচ,
কসিয়া কোমল করে।
মিত্রতা মহার্ঘ মনিময়াঙ্গুরী,
আঁটিল অঙ্গুলি পরে।

দিব্য আভাময় দাম্পত্য বলয়,
বলয়ি ভুজ মৃণালে।
ঔদার্য্য ভূষণ হীরক প্রসূন,
ফুটিল কুন্তল জালে॥
নম্রতা সরল অমূল্য রতন,
উজলি সীমন্ত পরে।
শোভিয়া সুচারু উরঃস্থল চারু,
বিবেক-মৌক্তিক হারে,
বিনয় হরিত, গোলাপ কলিকা
দুলিয়া শ্রবণপুটে,
কীর্ত্তি-উজ্জ্বিত, রতন মেখলা
ভাতিল নিতম্বতটে।
শিশু মুখে হাঁসি, চরণ কমল,
ফুটিয়া চরণযুগে।
উপাসনা-স্তোত্র, নুপুরযুজ্ঝুর,
বাজিল অঙ্গুলিভাগে।
স্নেহ-স্নেহময় অঞ্জন রেখায়,
স্নিগ্ধিয়া নয়নতলে,
সরলতাসুধা কুঙ্কুমের রাগে,
রঞ্জিল অধর দলে।

লজ্জা আভরণ, চারু ওড়নায়,
বেড়িয়া তনুয়াপরে।
দিব্য সুরভিত প্রসন্নতাবাস,
বর্ষিল তাহার পরে।
সুবেশ রচিত হেরি হরষিত,
সখীরে বিদায়দেন।
স্মরিয়া অন্তরে হরিত বাসরে,
ধীরে তথা উতরান।
মধুচর যত সবে পুলকিত,
বন্দিল দেবীর পদে।
গুঞ্জরিল অলি কুহরিল পিক্
বর্ষিল ফুল আমোদে॥
শুনি দূতধ্বনি দেব নৃপমণি,
সুখে উপনীত আসি।
দেবী অগ্রসর হইয়া সত্বর,
সাদরে লন সম্ভাষি॥
নব বেশে হেরি মোহিত রাজন,
হাসিয়া চুম্বিলা করে,
হরষিত মতি যুগল দম্পতী,
বৈসে ফুলাসন পরে॥

ডারুইন ও জীবরহস্য।

মনুষ্য যতই কেন প্রতিভাশালী হউক না, জীবিতাবস্থায় তাহার সে প্রতিভার আদর ততদূর থাকে না। এক জন ইতিহাসবেত্তা বিস্তর দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"এই পৃথিবী স্বর্গ হইত, যদি মনুষ্য তাঁহার সমকালীন মনুষ্যকে চিনিতে পারিত।" আমাদের চলিত ভাবায় সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, যে দাঁত থাকিতে কেহ দাঁতের মর্য্যাদা জানে না। বাস্তবিক এক জন ব্যক্তির যশ ও অপযশের বিষয় যেরূপ তাহার মৃত্যুর পর জানা যায়—জীবিতা-

বস্থায় ঠিক করা যাইতে পারে না, সেইরূপ প্রতিভাবিশিষ্ট লোকের প্রতিভার গভীরতা অনুধাবন করা তাহার জীবিতাবস্থায় হয় না। এই কারণেই গেলিলিওর (Galilio) পরিশ্রম বৃথা হইতেছে বলিয়া তাঁহার সমকালীন লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত। এই জন্যই নিউটন (Newton) তাঁহার জীবিতাবস্থায় উপযুক্ত সম্মান পান নাই। আর এই জন্যেই ডাক্তার হারভি (Harvey) সমব্যবসায়ীদিগের নিকট অপমানিত হইয়া ছিলেন। বিজ্ঞান ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, এখানেও আমরা এই বিষয়ে অন্যভাব দেখি না। কবিকুলগুরু হোমার যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, পথে পথে ভিক্ষা করিয়া দিন কাটাইতেন কেহ তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিত না আজ তাঁহাব মৃত্যুর শত যুগ পরে গ্রীসের সাতটা নগর তাঁহার জন্মভূমিত্বের জন্য দাবি করিতেছে। জীবিতাবস্থায় সাহিত্য-জগতে যদি মিলটনের আদর থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার প্যারেডাইস্ লষ্টের Paradise Lost কাপি রাইট অত অল্প মূল্যে বিক্রয় হইত না। যে সেক্সপীয়ারকে কবিকুল চূড়ামণি বলিয়া ইংলণ্ড গর্ব্ব করিয়া থাকে, সুসভ্য ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াও জীবিতাবস্থায় উপযুক্ত সম্মান লাভ করা তাঁহারও অদৃষ্টে ঘটে নাই। বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্য জগতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় অন্যান্য বিষয়ে ও অবিকল এই রূপ। পূর্ব্বে যেরূপ হইয়া গিয়াছে এখন ও সেইরূপ চলিতেছে। মহাত্মা ডারুইন Darwin তাহার প্রমাণ।

বৈজ্ঞানিক ডারুইন এদেশের শিক্ষিত লোকের নিকট অপরিচিত নহেন; সে দিন তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে সকল শিক্ষিত ভারতবাসী শোকে অধীর হইয়া ছিলেন; কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় এই যে ডারুইন সম্বন্ধে এই দেশীয় অনেক শিক্ষিত লোকেরও ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ডারুইন মনুষ্যবংশকে বানরবংশ সম্ভূত বলিয়াছেন বলিয়া অনেকেই তাঁহার নাম মাত্র শ্রবণে তাঁহাকে উপাহাস ও ঘৃণা করিয়া থাকেন। এমন কি বাঙ্গালা ভাষায় অনেক নাটকে পর্য্যন্ত তাঁহার কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে গালি দেওয়া হইয়াছে। * কিন্তু যিনি কেবল এই বিষয়ে তাঁহার অকাট্য যুক্তি ও অপরিসীম চিন্তা শক্তির পরিচয়

* শরৎসরোজিনী, একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব প্রভৃতি পুস্তক দেখ।

পাইয়াছেন, তিনিই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার নিকট স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে তাঁহাকে পূজা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বড় দুঃখের বিষয় এই যে ডারুইন কি স্বদেশে কি বিদেশে কোথায় সাধারণের উপযুক্ত সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। জীবিতাবস্থায় উপযুক্ত সম্মান না পাইলেও ডারুইনের পরিশ্রম বৃথা হয় নাই। আমাদের বিশেষ ভরসা আছে, শীঘ্রই তাঁহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে একটী বিপ্লব উপস্থিত হইবে। বঙ্গদেশে এই মাহাত্মার নাম অনেকেই শুনিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার রচিত পুস্তকের ততদূর আদর এ দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ, এখানে বিজ্ঞানের এই সূত্রপাত হইতেছে, তাহাতে ডারুইনের ন্যায় এক জন উচ্চদরের বৈজ্ঞানিক বিলাসপ্রিয় বাঙ্গালির হৃদয়ে সহজে স্থান পাইতে পারে না। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, যে ডারুইনের মৃত্যুর পর অবধি ইউরোপের জনসাধারণের তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ইউরোপে যাহা হইতেছে ভারতেও তাহা হওয়া উচিত, সেই জন্য তাঁহার অসীম অধ্যবসায় চিন্তাশক্তি ও সত্যানুরাগের আভাস মাত্র দিবার জন্য তাঁহার প্রণীত Origin of the Species (বর্ণোৎপত্তি) নামক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আজ আমরা এই প্রবন্ধ লিখিলাম।

এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলে কত কোটি কোটি জীব রহিয়াছে। এই কোটি কোটি জীব কিরূপে সৃষ্ট হইল, ইহাদের মধ্যে কাহার সহিত কাহার কিরূপ সম্বন্ধ আছে; এক জাতীয় জীবের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জীব কিরূপে হইল, ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে সৃষ্টির শীর্ষস্থানীয় মনুষ্য পর্য্যন্ত কিরূপে উৎপন্ন হইল; ইহাদের উৎপত্তির মূল কারণ কয়টি জীব; পূর্ব্বে যে সকল জীব পৃথিবীতে ছিল তাহাদের এক কালীন ধ্বংস কিরূপে হইল, আবার তাহাদের স্থানে নূতন নূতন জীবের সৃষ্টি হইলইবা কিরূপে, এক দিন এই সকল গভীর চিন্তা ডারুইনের মনে উদয় হইয়াছিল। তিনি এই সকল গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য যেরূপ অধ্যবসায় পরিশ্রম ত্যাগস্বীকার এবং সত্যানুরাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা মানব ইতিহাসে অতুলনীয়। ঐ সকল গভীর প্রশ্ন যে সর্ব্ব

ভারতে অভিনব যুগ।

ভীষণ শ্মশানক্ষেত্র। চতুর্দ্দিকে অন্ধকারের পর অন্ধকার ছুটিয়া বেড়াইতেছে; গাঢ় তিমিরান্ধতায় জলস্থল ঢাকিয়া গিয়াছে, শব্দমাত্র নাই, নীরবে রাশি রাশি শবদেহ সেই শ্মশানমৃত্তিকায় পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, চতুর্দ্দিক হইতে শৃগাল কুক্কুর আসিয়া কেহ বিকট রব করিতেছে, কেহ মুখভঙ্গি করিতেছে, কেহ অস্থি মাংস লইয়া টানাটানি বাধাইতেছে, সদ্যমৃত শবের রক্তে কাহারও শৃকণী রুধিরধারায় ভাসিয়া যাইতেছে, তথাপি সেই রাশি রাশি শব নীরব, নিঃস্পন্দ, অসাড়, বেদনারোধে হস্তপদ নাড়িবারও শকতি নাই। সহসা কে সেই নিবিড় তমসাচ্ছন্ন শ্মশানক্ষেত্রে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সিঞ্চন করিল, সহসা কেন সেই শ্মশানভূমে শবরাশি পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিল, কেন এ যুগবিপর্য্যয় ঘটিল? নির্জ্জীব ভারতে কেন আজ জীবনীশক্তির অভিনয় দেখিতে পাই, কেন আজ ভারতবাসী সীমান্ত হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত সকলে একই শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, যুগান্তের ভস্ম হইতে দেশানুরাগ ও সহানুভূতির দীপ্ত বহ্নি কেন আজ হঠাৎ স্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করিতেছে, এক যন্ত্রের ন্যায় তারে তারে সকলের হৃদয় বাজিয়া উঠিতেছে কিসের জন্য? আজ দিল্লী, কাল লাহোর, পরশ্ব কলিকাতা কেন ভারতের সর্ব্বস্থলে বিরাট সভা হইতেছে, আর দেশের বালক, বৃদ্ধ, যুবক প্রৌঢ়, ধনী নির্ধন, ইতর ভদ্র কেন সকলে একই উদ্দেশে দলে দলে গিয়া সেই সভায় যোগ দিতেছে? ঘাটে মাঠে, রাজপথে, পান্থশালায় সর্ব্বত্র একই কথা, একই আন্দোলন, একই শোকের বিষয়। স্থানে স্থানে লোকের সঙ্গে লোক মিশিতেছে, সেই একই কথা আলোচনা করিতেছে, যে রূপ সভা হইতেছে তেমন আর কেহ কখনও দেখে নাই, সে ভীষণ লোকারণ্য যে দেখিতেছে—যে শুনিতেছে সেই বিস্মিত হইতেছে। সাধারণের এক বিষয়হেতু এই বহু সহস্র লোকের একত্র সমাগম যে দেখিতেছে, সেই বর্ত্তমান ভুলিয়া ভবিষ্যতের কল্পনা করিতেছে, সেই ভাবিতেছে, ভারতে অভিনব যুগ আসিয়াছে।

তরঙ্গায়িত সমুদ্রবক্ষে ফেনিল ঊর্ম্মি রাশির অট্ট হাস সন্দর্শন করিয়াছি, বসন্ত সমাগমে নবকুসুমিতা ব্রততীর মধুরদোলনি অবলোকন করিয়াছি, অনভ্রযামিনীর কৌমুদীবিভা বৃক্ষের পত্রে পত্রে, মেঘের পটলে পটলে কি রূপ সুধা রাশি বর্ষণ করে নয়ন ভরিয়া তাহা পান করিয়াছি, নিশাসুন্দরী অমাবস্যার উদয়ে আঁধারকণা লইয়া কি রূপে ক্রীড়া করিয়া থাকে, কবির চক্ষু লইয়া তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু এক কার্য্যের জন্য বহু সহস্র লোকসমাগমের যে অতুল সৌন্দর্য্য তাহার ন্যায় আর কিছুতেই হৃদয় আনন্দে উছলিয়া উঠে নাই। জড়প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে প্রাণ নাই, তাহা নির্জ্জীব এবং নিস্তেজ, কিন্তু এই লোকারণ্যের সৌন্দর্য্য প্রাণবিশিষ্ট, সজীব এবং সতেজ। এ দৃশ্য দেখিয়া কে না ভুলে? যে না ভুলে তাহার হৃদয়ে জোয়ার ভাঁটা নাই, অমানিশার ঘোর অন্ধকার ভিন্ন পৌর্ণমাসীর শুক্ল চন্দ্রালোক কখনও তাহার হৃদয়গগনে প্রতিভাসিত হয় নাই, এ সংসারের সে কেহই নহে। ভারতে আবার এ দৃশ্য যে কস্মিন্ কালে দেখিতে পাইব তাহা মনে ছিল না। এ দৃশ্য প্রাণারাম, প্রীতিপ্রদ, মনোমোহন। ভারতে ইহা অননুভূতপূর্ব্ব, অচিন্তিতপূর্ব্ব, কল্পনার অতীত।

ত্রিতন্ত্রী, এস্রার, বেণু, বীণা, মুরলীর স্বর শুনিয়াছি, কিন্তু জনসংঘের একত্র মিশ্রণে যে এক অস্ফুট অস্পষ্ট ঈষৎ গম্ভীর স্বর উত্থিত হয়, তাহার নিকট কোন স্বরই শ্রুতিসুখাবহ নহে। কেহ প্রশ্ন করে, কেহ উত্তর দেয়, কেহ সে উত্তরে স্বমত প্রকাশ করে, একত্রে কখন বা ভয় ভক্তি শোক দুঃখের উচ্ছ্বাসবাহী কম্পিত স্বর উত্থিত হইতে থাকে, ভাবুকের মন সে স্বরে আর্দ্র হইয়া পড়ে, বাহিরের সমস্ত বস্তু ভুলিয়া যাইতে হয়, সেই স্বরলহরী মধ্যে নিজের অজ্ঞাতে হৃদয় গিয়া ঢলিয়া পড়ে। কেন বহু সহস্র লোক প্রমত্তভাবে একসঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে, কেন সকলের হৃদয় একযন্ত্রের ন্যায় একসঙ্গে একভাবে বাজিয়া উঠিতেছে, এসকল বিষয় ভাবিতে গেলে কল্পনা ও চিন্তা ভিন্ন মনুষ্যের অন্য কিছু থাকে না।

বুদ্ধি মনুষ্যের প্রকৃত জীবন নহে, মনুষ্যের প্রকৃত জীবন তাহার হৃদয়। কোথায় থাকিত সংসার, কোথায় থাকিত সমাজ, কোথায় থাকিত মনুষ্যের স্ত্রী পুত্র কন্যা যদি মানুষ হৃদয়বান্ হইয়া এ পৃথিবীতে না আসিত? প্রেম

তাহার জন্য সহানুভূতি করিতেছে, শত সহস্র ব্যক্তি তাহার দুঃখমোচনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে, তাহার জন্য স্থানে স্থানে লোকারণ্য নয়নগোচর হইতেছে। সুতরাং ফ্রান্স মরিয়াও মরিতেছে না। বহু সহস্র লোকের একত্র চেষ্টায় কোন কার্য্যই দুষ্কর বলিয়া বোধ হয় না। ফ্রান্সের লোকারণ্য এক দিন দাম্ভিকা রাজ্ঞী এনের দর্প চূর্ণ করিয়া তাহাকে তাহার বালক ষোড়শ-লুইকে ও প্রধান মন্ত্রী মেজেরিণকে লইয়া পারিশ ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিল। দূর ইংলিষ চ্যানালপারে বৃটিষ পার্লেমেণ্টে বাগ্মী-শ্রেষ্ঠ বর্ক প্রভৃতি অগাধসত্ব প্রশান্তচেতা মনস্বীদিগকে ও একদিন ক্ষিপ্ত প্রায় করিয়া তুলিয়াছিল। তার পর ফ্রান্স আজও যে কত সমাজ বিঘট্টনে বিধ্বস্ত হইয়াও জীবিত রহিয়াছে, সে কেবল হৃদয়ের বলে।

ইংলণ্ডের কথা একবার ভাবিয়া দেখ। ইংলণ্ডের সেই পূর্ব্বের অবস্থা আর এই বর্ত্তমান অবস্থা। ইংরাজ পশুসহচর হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিত, বৃক্ষ বল্কল বা চিত্ররঞ্জন লজ্জা নিবারণ করিত, একজন অপর জনের হৃদয় বুঝিত না, একজন অপরজনের জন্য কোন চেষ্টা দেখাইত না, পার্শ্ববর্ত্তী অথবা দূরাগত প্রবল জাতিরা অত্যাচার করিত, সে অত্যাচারে বাঙ্নিষ্পত্তি করিত না, মৃতের ন্যায় সে অত্যাচার সহ্য করিত, স্যাক্সন, ডেন, নর্ম্মাণ কত জাতি কত অত্যাচার উৎপীড়ন করিল, নিঃশব্দে সেই অত্যারচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিল, তখন তাহারা হৃদয়হীন, সুতরাং জীবিত নহে। আর আজ সেই ইংরাজ হৃদয়ের অধিকারে প্রমত্ত হইয়া, রাজ্য আক্রমণের কথা দূরে থাকুক, প্রজাপ্রতিনিধি নির্ব্বাচন অথবা কোন রাজবিধি পরিবর্ত্তের সময় উপস্থিত হইলে যে রূপ তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করে তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। সামান্য একটা আন্দোলনের কথা উঠিলেই পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রীপুরুষ সকলেই দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কি এক হৃদয়ের প্রচণ্ড তাড়নায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। দলে দলে লোক জমিয়া যে ভৈরব চীৎকার করিতে থাকে তাহাতে দেশ টলমল করিয়া কাঁপিয়া উঠে। ইংরাজদিগের হৃদয়বেগ কতদূর প্রবল এক সামান্য কারণে সে দিন টাউনহলে যে বিরাট সভা হইয়াছিল তাহাতে অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। হৃদয় না থাকিলে কোন এক বিষয়ের জন্য যুগপৎ সহস্র

প্রণয় ভক্তি ভালবাসা এসকল কথা অভিধান হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত যদি ইহাদের পূর্ব্বে হৃদয় শব্দের সৃষ্টি না হইত। এ সংসারের অশেষ কার্য্যাড়ম্বর শেষ হইয়া যাইত, উৎসাহ ও উদ্যমের অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যাইত, পাপপুণ্যের সকল ব্যাপার বিলুপ্ত হইয়া পড়িত, মৃত্যু আসিয়া নিশ্চেষ্ট ও অসাড় দেহকে অধিকার করিয়া ফেলিত, যদি মানুষ হৃদয় সম্বল লইয়া এ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ না করিত। যাহার হৃদয় আছে এ সংসারে সেই জীবিত; যাহার হৃদয় নাই সে চিরমৃত, সুখ দুঃখ, অনুরাগ, বিরাগ, নিদ্রা জাগরণ সকলই তাহার নিকট স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে, কোন কার্য্যেই তাহার আসক্তি নাই, সে বর্ত্তমান ক্ষণের বর্ত্তমান সুখ বিনা আর কিছুই ধারণা করিতে পারে না। বামে দক্ষিণে, সম্মুখে, পশ্চাদ্ভাগে কত জাতি উঠিতেছে, পড়িতেছে, পড়িয়া পড়িয়া আবার উঠিতেছে, আকাশের অসীম প্রাঙ্গনে কত কুসুম ফুটিতেছে, হাসিতেছে নিভিতেছে, মেঘের আন্তরাল হইতে আবার ভাসিয়া ভাসিয়া হাসিয়া উঠিতেছে; এ সংসারে কত নুতন সামগ্রীর উদয় হইতেছে, কত নুতন পুরাতনে পরিণত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আবার কত ভগ্নচূড় মাথা তুলিয়া জগতের পানে পুনর্ব্বার চাহিয়া দেখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, হৃদয়হীন ব্যক্তি এসমস্ত গূঢ়তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারে না; আপনার সেই বর্ত্তমান অবস্থাতেই সন্তুষ্ট রহে, ভবিষ্যতের আশা নাই, জীবনে বিশ্বাস নাই, অপরে পাদুকা প্রহার করিতেছে, নিঃশব্দে সেই প্রহারে জর্জরিত হইয়া অঞ্চলবায়ু নিসেবনে অঙ্গবেদনার প্রশমন করিতেছে। হৃদয়হীনব্যক্তি জড় ভিন্ন কিছুই নহে।

ইতিহাসে ইহার সাক্ষ্যে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ফ্রান্স হৃদয়বিহীন হইয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়াছিল; আশা, উদ্যম, চেষ্টা কিছুই ছিল না, প্রবলের চরণে বিদলিত হইলেও বড় একটা অঙ্গবেদনার চিহ্ন প্রকাশ করিত না। তার পর সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রণ্ড নামে মহাবিপ্লব সংঘটিত হইল, যে উপলখণ্ডে চাপা পড়িয়া প্রস্রবণের জল বদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সরিয়া গেল, সেইক্ষণ হইতে ফ্রান্সে জীবনীর ফোয়ারা ছুটিল। এই জন্যই করাশীরা কতবার বিপদের পর বিপদে পড়িয়া পর্য্যুদস্ত হইয়াছে, কত বার যাই যাই হইয়াছে, কিন্তু তথাপি একেবারে মরিয়া যায় নাই। এক হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িলে তৎক্ষণাৎ শত সহস্র হৃদয় একত্রিত হইয়া

সহস্র লোক তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে না। ইংরাজের চীৎকার আমাদের ভালর জন্যই হউক, আর মন্দের জন্যই হউক, এই এক হৃদয়তার বলে বহু সহস্র লোকের একত্র বিরাট মিশ্রণের জন্য অবশ্যই ইংরাজ আমাদের পূজার পাত্র।

ইংরাজ ফরাসীর কথা ছাড়িয়া যদি একবার আমাদের নিজের কথা ভাবিয়া দেখি, বুঝিতে পারি, হৃদয় মানুষের প্রকৃত জীবন বটে; বুঝিতে পারি, এক বিষয় হেতু এইরূপ বহু সহস্র লোকের একত্র সংমিলন সহৃদয়তা ও সজীবতার পরিচায়ক বটে। ভারতবর্ষ যখন জীবিত ছিল, তখন ইহাতে লোকারণ্য অনেক দেখা যাইত। কোন ও বিষয় মীমাংসার জন্য, কোন ও বিষয়ে উপায় নির্দ্ধারণের জন্য, কোন ও বিপদ ও আশঙ্কার কারণকে উন্মূলিত করিবার জন্য এক স্থানে আসিয়া দলে দলে লোক জুটিত, সেই লোক-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া সকলেই সাধারণের অদৃষ্টের সহিত আপন আপন অদৃষ্ট মিশ্রিত করিত, সাধারণের সহিত একাঙ্গ হইয়া সাধারণের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া গণনা করিত। তখন ভারতবর্ষে হৃদয়ের যে উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইত তাহাতে কোথাও ভক্তির খর স্রোতঃ আসিয়া মিশ্রিত হইত, কোথাও স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম সেই উচ্ছ্বাসে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া প্রলয়-পয়োধির জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় জগত সংসার ডুবাইয়া দিত। ভারতবর্ষের নিকট তখন অন্য কোনও দেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহস করিত না। কুক্ষণে ভারত হৃদয়বিহীন হইয়া পড়িল, কুক্ষণে ভাই ভাইয়ের জন্য, রাজা রাজার জন্য সহৃদয়তা দেখাইতে পারিল না, এক জন অপর জনের হৃদয় বুঝিল না; ভারত সেই দিন হইতে হৃদয় হারাইয়া প্রাণহীন হইয়া পড়িল। পৃথ্বীরাজের পর ভারতবর্ষ জীবনশূন্য হইয়া মহাশ্মশানে পরিণত হইয়া পড়িল—তাহা আর চাহিয়া দেখিতেও ইচ্ছা হয় না। সেই শ্মশানে অসংখ্য শৃগাল কুকুর আসিয়া ঘোর অন্ধকারে আপনাদের লক্ষ্য খুঁজিতে লাগিল, বহুতর পিশাচ আঁধারে মাতিয়া সেই শ্মশানভূমে পিশাচ নৃত্য আরম্ভ করিল। শ্মশানের ভীষণ দৃশ্য ক্রমশঃ চলিতে লাগিল।

যুগের পর যুগ চলিয়া গেল, শ্মশানের মহা অন্ধকার আর ঘুচিল না। বিদ্যার আলোক আসিল, সভ্যতার আলোক আসিল, কিন্তু কিছুইতেই সে

ভীম আঁধারজাল ছিন্ন হইল না। আকস্মাৎ সেই বহুদিনের আঁধাররাশি কেন আপনার বেলাভূমি অতিক্রম করিবার উদ্যোগ হইয়াছে। ভারতে এ অভিনব যুগ আসিল কোথা হইতে? ভারত আপনার সেই হারানিধি হৃদয়-ধন কেমন করিয়া কুড়াইয়া পাইল? যে ভারতবর্ষ নিশ্চেষ্ট ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া রহিয়াছিল, আজ তাহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হলহলাময় লোকধ্বনি শ্রবণ করিতেছি এবং স্থানে স্থানে লোকারণ্যের ভৈরব চ্ছবি সন্দর্শন করিতেছি কিসের জন্য? ঐ সমুদয় ধ্বনি এক স্রোতের ন্যায় মিশ্রিত হইয়া চিরপিপাসু কর্ণে যেন সুধা ধারা ঢালিয়া দিতেছে, উল্লাসে শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিতেছে, প্রাণ বিভোর হইয়া যাইতেছে, পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সমস্ত ভুলিয়া গিয়া আপনা আপনি সেই শব্দ স্রোতে গা ঢালিয়া দিতেছে; কি যেন ছিল না, কি যেন হইল, কিসের যেন অভাব ছিল, এত দিনে সেই অভাব যেন পূর্ণ হইল, এই সকল চিন্তা করিয়া কে জানে প্রাণ কেন এত টলিয়া পড়ে? ভাটপাড়ার গুরুমহল হইতে ধোপা নাপিত সকলেই এক সঙ্গে শোক প্রকাশ করিতেছে, বাঙ্গালীর সহিত মান্দ্রাজী, তার সহিত পঞ্জাবী, তার সহিত উড়িয়া সকলেই একই বিষয়ের জন্য দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িতেছে, সংবাদ পত্রের দল প্রত্যহই বিষাদের নিশ্বাস ফেলিতেছেন, সকলেরই বক্ষঃস্থল অশ্রুধারায় প্লাবিত হইতেছে, এমন শোকের দুর্দ্দিনেও কেন আমার হৃদয়গগনে রৌদ্র বৃষ্টির উদয় হইতেছে? কেন আজ আমার এক চক্ষু কাঁদিতেছে অন্য চক্ষু হাসিতেছে? হর্ষবিষাদের এমন একত্র অভিনয় কেন উপস্থিত হইল?

কেন হইল, তাহার কারণ আছে। নির্জ্জীব ভারতে আবার এমন দিন যে কখন দেখিতে পাইব ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। এত উৎসাহ, এত চেষ্টা, এত সহানুভূতি ও স্বদেশানুরাগ ভারতীয়ের হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে এত দিন যে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় ধুমে ধুমে জ্বলিতেছিল, ইহা কল্পনায় আসে নাই। অর্দ্ধ শতাব্দী পরে যাহা না হইত, আজ এই সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসে তাহা হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ কে? সুরেন্দ্রনাথ যিনিই হউন, আমরা তাঁহার ন্যায় শত সহস্র সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস নীরবে সহ্য করিতে পারি, যদি জাতীয় জীবনের এমন সার্ব্বজনিক উদ্দীপনা দেখিতে পাই। সুরেন্দ্রনাথ কেন

কারাবাসী হইলেন, ইংরাজের যাদৃচ্ছিক অত্যাচারকারিতার সহিত কেমন করিয়া তাঁহার দেশানুরাগের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, শ্বেত কৃষ্ণ বর্ণ ভেদে টেলার সাহেব ও তাঁহার মোকদ্দমা কি রূপ ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, হাইকোর্ট কি প্রকারে ভূতপূর্ব্ব তুলা মোকদ্দমার বিচার দৃষ্টান্তে এই মোকদ্দমার বিচার করিয়া আপনার (Court of Records) নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন, উচ্চ আদালত কেমন করিয়া আইনকে পাদদলিত করিয়া সহসা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সহিত সরাসরি বিচারের ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন; সে সব কথা এখানে উল্লেখের আবশ্যক নাই, সংবাদ পত্রের দল তাহা শত মুখে ঘোষণা করিতেছেন, বাঙ্গালার ঘরে ঘরে ইহা কাহিনী হইয়া গিয়াছে, এতদিনের পর সে সকল কথা লিখিয়া কল্পনার পৃষ্ঠা পূরণ করিলে, বুঝি, পাঠকবর্গের বিরাগভাজন হইতে হইবে। নরিস্ সাহেব কি রূপ সুবিচারক, গার্থ সাহেব কেমন ন্যায়পরায়ণ, মিষ্টার বানার্জ্জি কেমন স্বজাতিপ্রিয় সে সকল যে—সে কে না জানে? আর তাহার উল্লেখ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ কেমন স্বদেশবৎসল, কেমন বিপদে স্থির, স্বজাতির জন্য আত্মজীবনে স্পৃহাশূন্য, আর সেই স্বজাতিগণ সেই সুরেন্দ্রনাথের জন্য কি রূপ শোকাভিভূত, কি রূপ সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া ইতর ভদ্র, বালক বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া তাঁহার জন্য তারস্বরে হাহাকার করিতেছে, আপনাদের প্রিয়তম বন্ধুকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কি রূপ আহার নিদ্রা ভুলিয়া সেই একই কার্য্যে মাতিয়া উঠিয়াছে, এ সকল বিষয় উল্লেখ করিতে শরীরে রোমাঞ্চ ধরে, আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে, মনে হয় ভারতে সত্যসত্যই অভিনব যুগ আসিয়াছে। যাহার হৃদয় ছিল না সে হৃদয় পাইয়াছে, ভারতের সমগ্র হৃদয় এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া একটি স্তবকের ন্যায় হইয়াছে; তাহাদের সেই হৃদয়ের প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক ছত্র লোকারণ্য রূপ কাব্যে প্রস্ফুট পরিলক্ষিত হইতেছে, এক সভায় বাঙ্গালী, উড়ে, শিখ, পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটী, পারসী, মান্দ্রাজী, আসামী, সিংহলী পঞ্চবিংশতি সহস্রেরও অধিক লোক একত্রিত সম্মিলিত হইতে পারে এ কথা সহজে বিশ্বাস হয় না। সেই জন্যই বলিতেছি, ভারতে অভিনব যুগ আসিয়াছে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, এই যুগ এইখানে স্থায়ী হউক।

তবে যাও, সুরেন্দ্রনাথ, ঐ কারাগৃহে! তুমি আজ এই নির্জ্জীব ভারতবর্ষে যে সজীবতার অভিনব যুগ আনিয়াছ তাহার জন্য ইতিহাস অনন্তকাল ধরিয়া তোমার পূজা করিবে, তোমার স্বজাতিবৃন্দের তোমার জন্য এই শোকের নিশ্বাস স্বর্গীয় বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া তোমার ঐ কারাগৃহের চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইবে, এই দুঃখীদিগের আশীর্ব্বাদ শুনিতে শুনিতে সেই কারাগৃহে নন্দনকাননের সুখদ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবে, তুমি উহা কারাগৃহ ভাবিও না, ঐ স্থল অমরবাঞ্ছিত! ঈশ্বর তোমার পথে সহায় হউন। তুমিও আমাদের হইয়া প্রার্থনা কর, যেন এই অভিনব যুগ ভারতে চিরকাল ধরিয়া স্থায়ী হয়। যুগান্তের ভস্ম হইতে উত্থিত হইয়া দেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের প্রবল বহ্নি সহসা যে রূপ স্ফুলিঙ্গ সিঞ্চন করিয়াছে, প্রার্থনা কর, যেন ইহা আর নির্ব্বাপিত না হয়, যেন চিরদিন ধরিয়া ভারতবক্ষে ইহা ধগ্ ধগ্ জ্বলিতে থাকে। বহু দিনের ক্লেশ ও অপমান যেমন অকস্মাৎ বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া প্রলয়পয়োধির উচ্ছ্বাসের ন্যায় প্রবল স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে, প্রার্থনা কর, যেন এই স্রোতঃ আর না ফিরে, ভারতের শুষ্কবক্ষে যেন চিরদিনের জন্য ইহা এমনি প্রবহমান রহিয়া যায়। আশা হয়, তাহা হইলে আবার বুঝি সুদিন আসিবে; আবার বুঝি এই শুষ্কমালঞ্চের কঙ্করভূমে সহৃদয়তার পুণ্যপ্রবাহে কুসুম ফুটিবে, গন্ধ ছুটিবে, বৃক্ষ নাচিবে, পক্ষী গায়িবে; আবার বুঝি এই অন্ধতমপুরের স্তিমিত প্রদীপ আলোকবিভায় উজলিয়া উঠিবে, এই শ্মশানক্ষেত্রের শবরাশি চেতনার নূতন স্ফূরণে জাগিয়া উঠিয়া অঙ্গসঞ্চালন করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু আশা কি পুরিবে? ভারতে এ অভিনব যুগ কি স্থায়ী হইবে?

মেরুদণ্ড।

আমাদের পৃষ্ঠদেশে অনেকগুলি কশেরুকা আছে। তাহাদিগের সকলের আকৃতি সমান নহে। কেহ প্রশস্ত, কেহ কুব্জ, কেহ বক্র, কেহ স্থূল। এই

সকল কশেরুকায় মেরুদণ্ড নির্ম্মিত। ঠিক মুখের পশ্চাৎভাগ হইতে পিঠের দিকে চাহিয়া দেখিলে, বেশ বুঝা যায়, যেন দুইটী স্বতন্ত্র স্তম্ভের পরস্পর মিলন দ্বারা মেরুদণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে নিম্ন স্তম্ভটী সেক্রম ও কক্‌সিক্‌স্‌ উভয়ের মিলনে গঠিত, আর উর্দ্ধ স্তম্ভটী গ্রীবা হইতে আরম্ভ করিয়া কটী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেক্রম দেখিতে বৃহৎ, ত্রিকোণাকার, কটিদেশ পর্য্যন্ত যে পৃষ্ঠবংশ ব্যাপিয়া আছে তাহার নিম্নে ও বস্তি গহ্বরের উর্দ্ধে ও পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। ইহার আকার এইরূপ—
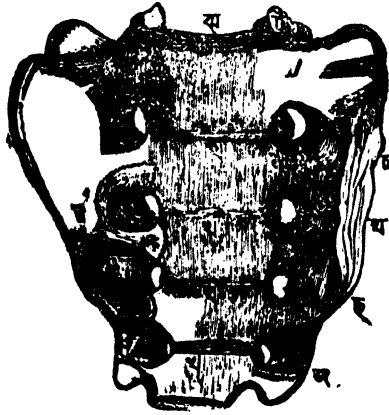
এই অস্থি বাল্যাবস্থায় পাঁচভাগে বিভক্ত থাকে, ক্রমে যৌবনাবস্থার উপস্থিত হইলে সকল অংশগুলি একত্রীভূত হইয়া একখানি অস্থিতে পরিণত হয়। ইহা যে বাল্যে পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল, তাহা ইহার চারিটী অনুপ্রস্থ রেখা (খ) দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ইহার অগ্রপ্রদেশ উপর হইতে নীচে এবং এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে কুব্জ। যে চারিটী রেখার কথা বলিলাম, তাহাতে চারিটী অগভীর ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রচতুষ্টয়ের বাহ্যদিকে অগ্র পশ্চাৎ অনুপ্রস্থ প্রবর্দ্ধনের সংমিলনে নির্ম্মিত একটা উচ্চস্থান দেখা যায়, তাহাকে সাধারণতঃ (Lateral mass) (ঘ) ল্যাটারেল ম্যাস বলে। সেক্রমের পশ্চাদ্দেশ অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত, ঈষৎ ব্যুব্জ এবং কর্কশ। এই খানে তিন চারিটী গুটিকা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে ডাক্তারেরা সেক্রমের কণ্টকপ্রবর্দ্ধন বলিয়া অনুমান করেন। এই কণ্টক প্রবর্দ্ধনের বাহ্যদেশে

পত্র প্রবর্দ্ধন এবং তাহার বাহ্যে সংযোগকারি প্রবর্দ্ধন সকল অবস্থিত থাকে। এই সংযোগকারি প্রবর্দ্ধনের বাহিরে আবার চারিটি অনতিক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, তাহা দিয়া সেক্রাল স্নায়ুর পশ্চাৎ শাখাগুলি বহির্গত হয়। সেই ছিদ্রের বাহিরে আবার কতকগুলি গুটিকা দেখা যায়, তাহা দ্বারা পশ্চাদ্ভাগ পার্শ্বভাগ হইতে পৃথক্ থাকে। সেক্রমের অগ্রপ্রদেশ ও পশ্চাৎ প্রদেশের কথা বলিলাম, ইহার পার্শ্বপ্রদেশ আবার স্বতন্ত্র প্রকার। উপরে প্রশস্ত এবং নীচে ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া একটা আলির ন্যায় হইয়া গিয়াছে। এই পার্শ্বপ্রদেশের উপরিভাগে ও সম্মুখে একটা কর্ণাকৃতি প্রদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে (চ) অরিকিউলার কহে। এ স্থানটা কর্কশ। কিন্তু পার্শ্বপ্রদেশের নিম্নাংশ (ছ) পাতলা এবং তীক্ষ্ণ। ইহার নিম্নে একটি গভীর খাত (জ) আছে। সেক্রমের মূল বিস্তৃত, উর্দ্ধ এবং অগ্রমুখ। ইহার মধ্যস্থলে একটি অণ্ডাকৃতি স্থান (ঝ) আছে। ঐ স্থানের পশ্চাতে সেক্রাল কেনালের মোহানা দৃষ্ট হয়। এই মোহানার উভয়পার্শ্বে উপরিস্থ সংযাগকারি প্রবর্দ্ধন (ট) আছে, সে সকল কুব্জ, অণ্ডাকৃতি, এবং ভিতরমুখ। অন্তভাগ নিম্ন এবং অগ্রমুখ এই খান হইতে সেক্রেম ককৃসিক্সের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

এখন, কক্সিক্স কিরূপ তাহা বলা আবশ্যক। ইহাও দেখিতে প্রায় ত্রিকোণাকৃতি। উর্দ্ধে কিছু প্রশস্ত তার পর ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া নামিয়া পড়িয়াছে। আকার এইরূপ :—
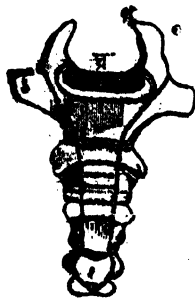
ইহা বাল্যাবস্থায় চারি অংশে বিভক্ত থাকে, পরে যৌবনাবস্থায় সকল অংশগুলি একত্র মিলিত হইয়া একখানি অস্থিতে পরিণত হয়। ইহারও

দুই প্রদেশ, দুই পার্শ্ব, এক মূল এবং এক অন্ত। অগ্র প্রদেশ কুব্জ, পশ্চাৎ প্রদেশ একটু ন্যুব্জ। এই প্রদেশের দুই ধারে কতকগুলি গুটিকা আছে তাহাদের মধ্যে যে দুইটী সকলের উপরে তাহারা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং উর্দ্ধমুখ হইয়া সেক্রমের কর্ণুয়ার সহিত সংযুক্ত থাকে। ইহার মূলভাগ (গ) সংযুক্ত থাকে। অন্তভাগ গোলাকার।

ইহার উপর যে স্তম্ভটি তাহার আকার এইরূপ—
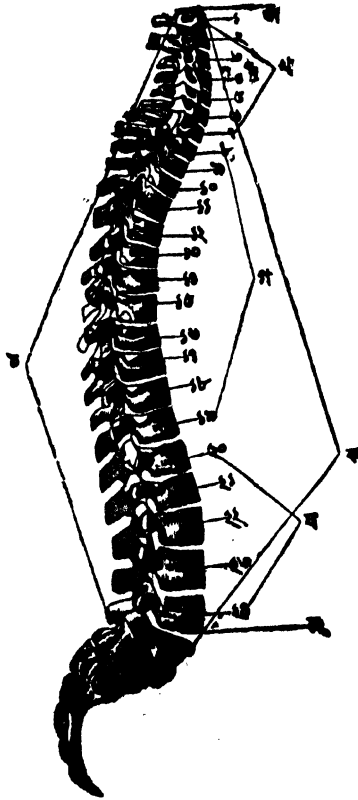
ইহাকেই সাধারণতঃ লোকে Spine অর্থাৎ পৃষ্ঠবংশ বলিয়া থাকে

এই স্তম্ভটি কশেরুকাদিগের পরস্পর মিলনে সংগঠিত। যদি সূক্ষ্ম-দর্শীর চক্ষু লইয়া দেখা যায়, যেন স্পষ্ট বোধ হয়, এই স্তম্ভটীতে আর তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ আছে; তাহার মধ্যে প্রথমটি নিম্নস্থ গ্রীবা কশেরুকাদিগের দ্বারা, দ্বিতীয়টি চারি খানি পৃষ্ঠকশেরুকা দ্বারা আর তৃতীয়টি অন্যতম এক খানি পৃষ্ঠকশেরুকা হইতে আরম্ভ করিয়া এক খানি কটিকশেরুকা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। পার্শ্ব হইতে দেখিলে অনেক গুলিন্‌ কর্ভ দেখা যায়। কর্ভ অনেক প্রকার। সর্ভাইকাল, ডর্সাল, লম্বার, এবং পেল্‌ভিক্‌। পেল্‌ভিক্‌ কর্ভ সেক্রো-ভারটিব্রাল সন্ধি হইতে আরম্ভ হইয়া কক্‌সিক্‌-সের অন্তে শেষ হইয়াছে। আমরা যে স্তম্ভটির কথা বলিতেছি, তাহার এক অগ্র, এক পশ্চাৎ, দুই পার্শ্ব, এক মূল, এবং এক উর্দ্ধান্ত। অগ্র প্রদেশে (ক) কশেরুকাদিগের গাত্র সকল গ্রীবা দেশে প্রশস্ত, পৃষ্ঠদেশের উর্দ্ধাংশ অপ্রশস্ত, এবং কটিদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত। এই প্রদেশ বেশীর ভাগ ন্যুব্জ।

পশ্চাৎপ্রদেশের (চ) মধ্য রেখায় কণ্টকপ্রবর্দ্ধন সকল দৃষ্ট হয়। ইহা গ্রীবা দেশে ক্ষুদ্র, সরল এবং দ্বিখণ্ডিত; পৃষ্ঠদেশের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে বক্র, মধ্য-স্থলে খাড়া এবং নিম্নে কটিকশেরুকাদিগের কণ্টক প্রবর্দ্ধনের ন্যায় সরল।

পার্শ্ব প্রদেশ সকলের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে ইণ্টার-ভার্‌টিব্রাল ফোরেমেন সকল আছে; ইহার অণ্ডাকৃতি, গ্রীবাদেশে ও পৃষ্ঠদেশের উর্দ্ধ ভাগে ক্ষুদ্র এবং কটিদেশে অপেক্ষাকৃত কিছু বৃহৎ। ইহা দিয়া পৃষ্ঠের স্নায়ুমূল সকল গমন করে।

মূল ভাগ (ছ) কটি কশেরুকার গাত্রের অধঃপ্রদেশ দ্বারা নির্ম্মিত। এবং উর্দ্ধান্তভাগ (জ) য়্যাটলাসের উর্দ্ধ প্রদেশ দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা ছাড়া, একটি ভার্‌টিব্রাল কেনাল আছে, তাহা মেরুদণ্ডের ভিন্ন২ বক্রতা অনুসারে গমন করে।

আমরা সংক্ষেপতঃ মেরুদণ্ডের আকার এবং তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। ইহার বিষয়ে সবিস্তারে জানিতে হইলে অস্থিবিদ্যা-বিষয়ক পুস্তক পাঠ করা আবশ্যক।

আঁখির মিলন।

(১)

মরি কিরে মনোহর
আঁখি-শোভা আঁখি পর
কি এক মহান্ কাব্য আঁখির মিলন।
একটি একটি পত্র
একটি একটি ছত্র
যথা হেরি, হেরি তথা ভাবের দর্পণ।
কি যেন ঘুমের ঘোর
পাগল পরাণ মোর
অবশ—অসাড়—মুগ্ধ করি অধ্যয়ন,
এমনি মহান্ কাব্য আঁখির মিলন।

(২)

সে আঁখি কহিল যাহা,
আঁখিই বুঝিল তাহা,
না হেরিল অন্যে সেই আঁখির মিলন।
আপনা আপনি দেখি
কতই কতই সুখী,
কতই সুধার রসে ভাসি অনুক্ষণ।
আকাশে তারকা হাসে,
জলে সরোজিনী ভাসে,
স্থলে শোভে মনোহর মানব-নয়ন,
কুসুমে কুসুম-শোভা আঁখির মিলন।

(৩)

মনে পড়ে ছেলেবেলা
করিতে করিতে খেলা

জননীর সেই চারু আঁখির মিলন,
ছাড়িয়া সে ধুলা-খেলা
ছাড়িয়া সঙ্গীর মেলা
ছুটিয়া জড়ায়ে কণ্ঠ করেছি ধারণ।
টানেরে চুম্বক লৌহে,
আঁখিতে আঁখিতে দোঁহে
সেই ভাব—সেই টান—সেই আকর্ষণ
হেরিয়াছি, ভুলিবনা, আঁখির মিলন।

(৪)

সে কথাও মনে আছে,
এ আঁখির আছে আঁচে
সে আঁখি কহিত যাহা আছেরে স্মরণ,
অন্যে না বুঝিত কিছু
অন্যে না জানিত কিছু
আঁখিতে আঁখিতে হত শত আলাপন।
মনে মন জানাজানি
প্রাণে প্রাণ টানাটানি
প্রাণের পিঞ্জরে শ্যামা করিত কূজন,
সে মজেছে যে বুঝেছে আঁখির মিলন!

(৫)

ভাঙো ভাঙো দেহযষ্টি,
লীনপ্রায় ক্ষীণ দৃষ্টি,
আকাঙ্ক্ষার তীব্র দাহে বিকল পরাণ,
দিনের দাসত্ব পরে
ফিরে আসি ভাঙ্গাঘরে
জুড়ায় হেরিয়া মরি শিশুর বয়ান,
আঁখিতে আঁখিতে চেয়ে
উঠে শিশু নাচে ধেয়ে

মৃত সঞ্জীবনী সুধা করে বরিষণ
মরারে চেতনা দেয় আঁখির মিলন।

(৬)

কি যেন হয়েছে কিবা
প্রকৃতিও নিশি দিবা
খ্যাপায় আমারে অই খ্যাপার মতন,
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
আঁখির মেলানি দেখি,
তরু লতাবনস্পতি নদী প্রস্রবণ
এ যেন উহারে হেরে
আমারে ভ্রূকুটি ক'রে
আড়ে আড়ে আড়ে চেয়ে করে নিরীক্ষণ
প্রকৃতির যথা তথা আঁখির মিলন।

(৭)

ভানু আছে লক্ষ্যান্তরে
নলিনী ফুটিয়া সরে
আঁখিতে আঁখিতে তবু কত সম্ভাষণ
—কি বুঝিবে অন্য জনে ?—
আঁখি কহে, আঁখি শুনে
আঁখিই বুঝেরে সেই প্রেম-আলাপন,
বিরহে বিকট ফাঁসি
মিলনে মধুর হাসি
আশার উশীর দগ্ধ দেহে বিলেপন।
কে বুঝিবে কত কহে আঁখির মিলন।

(৮)

প্রকৃতিলো যথা তথা
হেরি তোর এই প্রথা
আঁধারে চোরের কাজ আঁখির মিলন।

নাচে সিন্ধু বিধুকরে
টানে রবি ধরণীরে
গ্রহ সদা অন্য গ্রহে করে আকর্ষণ।
ইচ্ছা করে হই কবি
নেহারি এ চারু ছবি
প্রকৃতিলো তোর কোলে বসি অনুক্ষণ
ধরায় স্বর্গের শোভা আঁখির মিলন।

রেলের রাস্তা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা দেখাইয়াছি, অজন্মার বৎসর বল, আর সুজন্মার বৎসরই বল, রেল ভিন্ন ভারতের মজ্জাগত দুঃখ মোচনের অন্য উপায় নাই। আজ কাল আবার অবাধ বাণিজ্যের প্রশস্ত নীতির অবতারণা আরম্ভ হইয়াছে, ভারতের পক্ষে বড় মঙ্গলের কথা। রেল হইলে অবাধ বাণিজ্যের বিস্তার সহজেই হইবে। দ্রব্যাদির শুল্ক যেমন উঠিয়া গেল, তেমনি যদি সে সকল দ্রব্য রেল দ্বারা সহজে উপকূলে লইয়া যাইতে পারা যায় সুবিধা আরও বেশী হইবে। আমরা অবাধবাণিজ্যের পক্ষপাতী। পক্ষপাতী বলিয়াই অবাধ-বাণিজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রেলের বিস্তারের কথাও বলিতেছি। বাণিজ্য ভিন্ন ধনাগমের অন্য সহজ পন্থা দেখি না। দেশে যদি বাণিজ্যের পথই অবরুদ্ধ রহিল, তবে আর তথায় ধনাগম হইবে কি প্রকারে? অর্থ আর কিছুই নহে, যে দ্রব্যকে মধ্যে রাখিয়া মানুষের বিনিময় কার্য্য চলিয়া থাকে, তাহারই নামান্তর মাত্র। বিনিময় প্রণালীর নামই বাণিজ্য প্রণালী। মানুষ নিজে খাটিয়া খুটিয়া যে জিনিস উৎপন্ন করে তাহার আবশ্যকমত আপনার জন্য রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট ভাগ অন্যের

অভাব মোচনের জন্য বিক্রয় করে। এই বিক্রয়ের পন্থা যতই সুগম হয় ততই লোকের ধনবৃদ্ধি হইয়া থাকে; নচেৎ সামগ্রী থাকিতেও উদ্বৃত্ততা দোষে কড়ার কাঙ্গাল হইয়া পড়িতে হয়। রিপনের গভর্ণমেণ্ট ইহা বুঝিয়াই অবাধ বাণিজ্যনীতি বিস্তার করিতে প্রয়াসপর হইয়াছেন। হউক সে নীতি একদেশদর্শিনী, কিন্তু তাহাতে অনেক মঙ্গল আছে। তবে বলি কি, দ্রব্যজাতের শুল্ক উঠাইয়া দিলে যেমন মঙ্গলের আশা করা যায়, সেই দ্রব্যজাত যাহাতে দেশবিদেশে লইয়া যাওয়া যায় তাহার পথ করিলে অধিকতর মঙ্গলের আশা আছে। এই জন্য রেলের রাস্তার প্রয়োজন। আমরা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টকে রেলের রাস্তা বিস্তার করিতে পরামর্শ দেই।

ভারতকে রেলমালায় আপাদ মস্তক ভূষিতকরিয়াছি, এই বলিয়া ইংরেজ যখন তখন গর্ব্ব করিয়া থাকেন। ষ্ট্রেচি ও টেম্পল এই অহমিকায় আপনারা মাতিয়াছেন। কিন্তু সে অহঙ্কার অনর্থক। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাইট সাহেব বলিয়াছিলেন, "আমাদের এক ম্যাঞ্চেষ্টারের লোকেরা স্থানীয় উন্নতির জন্য যে টাকা খরচ করিয়া আসিতেছেন, ভারতে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ২৯ কোটী টাকা কর আদায় করিয়া ২০ কোটী লোকের শাসনভার লইয়া তাহা করেন নাই।" কথাটা অস্বীকার করিবার যো নাই। আজ বিশ বৎসরেরও অধিক হইয়া গিয়াছে, তথাপি এ অভিযোগ আজও তিরোহিত হইল না। আজও ভারতে সেই দুঃখের নিশা পোহাইল না। অষ্ট্রেলিয়া কি ছিল আর কি হইয়াছে। এখন তাহার সুখের দশা দেখে কে? অষ্ট্রেলিয়ার রাজস্ব অপেক্ষা ভারতের রাজস্ব পরিমাণ প্রায় ৬ গুণ; লোকসংখ্যা প্রায় ১৫৫ গুণ; অষ্ট্রেলিয়ার চারিটি প্রদেশে যে রেলওয়ে হইয়াছে, সমগ্র ভারতের রেলওয়েস পরিমাণ তাহার দ্বিগুণ মাত্র। ইহা কি লজ্জার কথা নহে?

শাসনপ্রণালীর প্রকৃতির সহিত যে দেশের উন্নতির ঘনিষ্টতম সম্বন্ধ, এ কথা ইংরাজরাজকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ইংরাজ উনবিংশ-শতাব্দীর রাজমণ্ডলী মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন; শাসন কার্য্যে দক্ষ এমন আর নাই। সেই ইংরাজের হাতে পড়িয়া ভারতের এ অবস্থা যাইতেছে না কিসের জন্য? রেলের রাস্তা সম্বন্ধে ভারতের অবস্থা এত হীন কেন? ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স্‌, স্কটলণ্ড; আয়র্লণ্ড, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়ম,ফ্রান্স, জর্ম্মানি, ইটালি,

ন্যাদার্লণ্ড, বেল্‌জিয়ম, নরোয়ে, সুইডেন, এবং রুসিয়া এই কয়টি প্রদেশের মোট লোকসংখ্যা ২৮ কোটি, রেলপথ ৯১ হাজার মাইল; আর ভারতে আজ ২৫ কোটি লোকের জন্য ৯ হাজার মাইল রেল বই আর চলিল না। দক্ষিণ আমেরিকাতো নিতান্ত অর্দ্ধসভ্য প্রদেশ, ভারতের রাজস্ব তাহার রাজস্ব অপেক্ষা দ্বিগুণের ও অধিক, লোকসংখ্যা ৯ গুণ হইবে, অথচ তাহার পাঁচটী প্রদেশে যত রেল চলিয়াছে, ভারতে তাহার অর্দ্ধেকের বড় অধিক চলিতেছে না। এ নিন্দা কার? ইংরাজ ভারতের শাসন-কর্ত্তা, ভারতের হীনদশার জন্য অবশ্যই ইংরাজগভর্ণমেণ্ট নিন্দনীয়। জানি না, তাঁহারা এমন শাসনপটু হইয়াও কেন এ নিন্দা ঘুচে না।

অনেকে ভারতের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য হয়তঃ ভারতবাসীকে গালি দিবেন। গালি দেওয়াতো সহজ কথা। মরাকে মারিতে বড় বেশি কষ্ট লাগে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, গালি যে দিবে, ভারতবাসীর দোষ কি? বলিবে, তাহারা এমনি নিশ্চেষ্ট, এমনি পরপ্রত্যাশী যে পরে কবে কি করিয়া দিবে, তবে তাহাই হইবে, নচেৎ নিজের চেষ্টায় নিজের উন্নতি করিতে জানে না। পরে গালে তুলিয়া দিবে, তবে গিলিবে, নচেৎ নিজে হাত পা নাড়িয়া আহারের চেষ্টা দেখিবে না। উত্তম কথা। এ কথা ভারতবাসীর অঙ্গের আভরণ। কিন্তু কথা হইতেছে কি, তাহা হইলেই কি উন্নতি অবশ্যম্ভাবী? কে বলিল? দেশের শাসন প্রণালীর প্রকৃতির সহিত যে দেশের উন্নতির বিশেষ সম্বন্ধ, প্রমাণ দ্বারা একথা বোধ হয় এখন আর বুঝাইয়া দিতে হয় না। দৃষ্টান্ত চারিদিকেই বর্ত্তমান। যে দেশের শাসন প্রণালীতে স্বাধীনতা আছে, সেই দেশের উন্নতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা আমাদের অপেক্ষা অসভ্য হউক, তাহাদের শাসন প্রণালীতে স্বাধীনতা আছে; সুতরাং তাহা অনেক উন্নত। অষ্ট্রেলিয়াও নিজে নিজের শাসন কার্য্য করিয়া থাকে। শিল্প বল, বাণিজ্য বল, সকল বিষয়েই অষ্ট্রেলিয়া স্বাধীন। তাহাকে ভারতের মত বর্ষে বর্ষে পেটে না খাইয়া বিশ কোটি টাকা বিলাতে পাঠাইতে হয় না। অল্পবেতনে দেশীয় উপযুক্ত লোক মিলিলে ও আমাদিগের ন্যায় সেই কার্য্যের জন্য ইংরাজের মোটা পেট পূরাইতে হয় না। অষ্ট্রেলিয়া নিজের খাইয়া নিজে মানুষ হইয়েছে, পরকে

খাওয়াইয়াফতুর হয় নাই। যাহাতে নিজের উন্নতি, তাহাতেই দৃষ্টি। সুতরাং আষ্ট্রেলিয়ার উন্নতি হইবে না কিসের জন্য? আর ভারতের বিষয় ভাবিয়া দেখ দেখি। পরের পেট ভরাইতেই ভারতের যথাসর্ব্বস্ব গেল, নিজে পেটের জ্বালায় জ্বালাতন; তবে কি খাইয়া উন্নতি চেষ্টা করিবে? ভারতবাসীকে গালি দিও না।

গালি দিও না, তবে যত পার উৎসাহ দাও। উৎসাহে মাতিয়াও তবু যদি বুক বাঁধিতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবাসী মাত্রেই রেলের মর্ম্ম বুঝিয়াছে। দেখা গিয়াছে, কোথায়ও কোন ও নূতন লাইন খুলিবার প্রস্তাব হইলে, যাতায়াতের বড় সুবিধা ঘটিবে, দেশের কত মঙ্গল হইবে, এইরূপ ভাবিয়া কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলে আহ্লাদে গলিয়া যায়, ব্যগ্রতার সহিত লাইন খুলিবার দিন পর্য্যন্ত প্রত্যাশাপন্ন থাকে। দেখা গিয়াছে, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি মিলিয়া স্থানবিশেষে যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য আপনাদিগের মধ্যে কোম্পানি খুলিয়া রেল চালাইতে কৃতসংকল্প হইয়াছে। এ সময়ে চারিদিক হইতে উৎসাহ পাইলে অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা। যে সংকল্প সিদ্ধ হইতেছে না তাহা সুসিদ্ধ হইবার অনেক আশা করা যায়। তোমরা দেশহিতৈষীর দল, তোমাদিগের হৃদয়ে যদি যথার্থই স্বজাতীয়ের উন্নতি কামনা বলবতী থাকে, এসব কার্য্যের জন্য উৎসাহ দাও; চেষ্টা একবারে না হয়, দুই তিনবারে ফলবতী হইবে। কিন্তু গালি দিও না, মরার উপর খাঁড়ার ঘায় কোনও ফলোদয় নাই।

এত দিনের পর আজ এই কার্য্যে উৎসাহ দিতে এই দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতেছি কেন না, এতদিনের পর এ কথা বলিবার সময় আসিয়াছে। ভারতে রেলের সূত্রপাত হইয়াছে ৩০ বৎসর। প্রথমে সামরিক সুবিধার দিকেই দৃষ্টি ছিল। লর্ড মেয়োর আমলে রেলের বাণিজ্যগত উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি প্রদত্ত হয়। এখনও সে দৃষ্টি আছে। কিন্তু কেবল দৃষ্টি থাকিলে তো কাজ হয় না। কাজেই এত দিন কোনও কাজ হয় নাই। কখন হইবে জানি না। রিপনের উদারনীতি যদি বরাবর চলে তাহা হইলে অনেকটা আশা করা যাইতে পারে। আশা করা যাইতে পারে বলিয়াই বলিতেছি, এমন কর সময়ে ভারতবাসী যদি উৎসাহে ভর করিয়া

স্বতঃ হউক পরতঃ হউক একটিও নূতন রেলের রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে পারে ভারতের উন্নতির পথে একটি স্বুবর্ণ সোপান নির্ম্মিত হইবে।

স্ত্রীপূজা।

উদ্বোধন।

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি।" হে জলস্থল-আকাশমরুভূকান্তার সর্ব্বব্যাপিনি—হে উত্তরপূর্ব্বদক্ষিণপশ্চিম-সর্ব্বদিক্পালিনি—কটাক্ষমাত্রেণ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রি! হে রকিং চেয়ার সুশোভিনি—কার্পেট শিল্পিনি—বড় বড় ডাগর অসুরমর্দ্দিনি ভগবতি! জ্ঞানহীন—নিরক্ষর—অজ্ঞান—অসৎ—মূঢ় করযোড়ে ডাকিতেছি "ওঁ আয়াহি বরদে দেবি।" এ হৃদয়মন্দিরে অতি যতনে তোমার জন্য সিংহাসন পাতিয়া রাখিয়াছি, তাহা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে এক বার উর—ভক্তের বাঞ্ছা পূর—এক বার আসিয়া রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠান কর। মহাশক্তি তুমি—তোমার অনন্ত শক্তির কথা এ পৃথিবীর ক্ষুদ্র নর কেমন করিয়া ব্যক্ত করিবে? দুর্ব্বল বাঙ্গালী করযোড়ে ডাকিতেছে—শক্তিরূপিণি! শক্তি দাও; দরিদ্রের পর্ণকুটিরে দয়া করিয়া এক বার আবির্ভূতা হও। এক বার এস। অনেক দিন ক্রেপের কাপড় উঠিয়াছে, বড় সাধ এক বার সেই বস্ত্র পরাইয়া ঐ দিগম্বরী মূর্ত্তি দেখিয়া এ পাপ নয়ন সার্থক করিব। দেবি এস, বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি—ভক্তের বহুদিনের বাঞ্ছা পূর্ণ কর। এ সংসারে তুমি ভিন্ন উপায় দেখি না। সারাদিন দাসত্বে প্রাণান্ত খাটুনির পর গৌরাঙ্গ প্রভুর পদাঘাতে জ্ঞানহারা হইলে কে বুদ্ধি বলিয়া দিবে? শস্ত্র আইন জারি হইয়াছে, তোমার অঞ্চল ভিন্ন কোন্ উপায়ে আত্ম রক্ষা করিব? পিতা মাতা বড়ই জ্বালাতন আরম্ভ করিয়াছে, তুমি ভিন্ন কে তাহাদিগকে শাসন করিবে? অভয়ে! অভয় দাও। এক বার সম্মুখে এস। তুফান—চারিদিকে তুফান—কুল নাই—কিনারা নাই—ভবঘোরে পড়িয়া এ ক্ষুদ্র তরি যায় যায়, এ বিপত্তিকালে একমাত্র কর্ণধার তুমি। দুর্ব্বল ভয়ভীত আমি—নিরুপায়—অগতি—দীনহীন—তাই বার বার তোমায় ডাকিতেছি, "ওঁ আয়াহি বরদে দেবি।"

ধ্যান।

চিন্তামণি! তব চিন্তা কেমন করিয়া চিন্তা করিব? চিন্তামণির শিরোমণি তুমি। আমি ক্ষুদ্র নর আমি কতটুকু—আমার এ ধ্যান কতটুকুর জন্য—যে দেবদেব ধ্যানে মজিয়া স্থাণুর ন্যায় হইয়া গিয়াছিলেন—যাঁহার ধ্যাননিশ্চলমূর্ত্তি দেখিয়া কবিশ্রেষ্ঠ 'নিবাতনিষ্কম্পমিবপ্রদীপম্' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন—সেই ধ্যানমগ্ন যোগীশ্রেষ্ঠ এক দিন ঐ মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া বিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—আমি কেমন করিয়া মন বাঁধিয়া ঐ ধ্যান ধারণা করিব? তুমি ছিলে, তাই আজ শূন্যগর্ভা পৃথিবী জীবময়ী। তুমি আছ, তাই আবারআজ যুদ্ধ বিগ্রহ মারামারি কাটাকাটি। তোমার জন্যই পুত্র পিতাকে মানে না, ভাই ভাইয়ের মুখ দেখে না, পিতা পুত্রকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলে। কাব্য ইতিহাস সকলই তোমারই প্রসাদ-ফল। এক দিন কটাক্ষ করিয়াছিলে তাই রামায়ণ মহাভারত জন্মিল। তুমিই ইলিয়দের জননী। তোমারই জন্য রাবণ রাজা সবংশে মরিল, তোমারই কারণে ট্রয় ছারখারে গেল। আর সেই যে বীর এণ্টনি আপনার মহামূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিলেন—সেও কেবল তোমারি জন্য। অনন্তরূপিণী তুমি—তব রূপ কি রূপে ধ্যান করিব? রূপে তুমি আকাশের চন্দ্রতারা, বনের হরিণী হইতে করিশাবক পর্য্যন্ত এবং বৃক্ষের মধ্যে কদলী ও ফলের মধ্যে দাড়িম্ব প্রভৃতিকে লজ্জা দিয়া থাক; তোমার রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া কবিশ্রেষ্ঠ আর কথা পান নাই—উপমাপটু উপমা খুঁজিয়া পান নাই—তাই তিনি শেষে বলিলেন "সর্ব্বোপমা দ্রব্যসমুচ্চয়েন যথা প্রদেশং বিনিবেশিতেন। সা নির্ম্মিতা বিশ্বস্রজা প্রযত্নাদেকস্থ সৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব॥" কবি হারিয়াছেন, ক্ষুদ্রমতি আমি—আমি কেমন করিয়া ঐ রূপ চিত্র করিয়া হৃদয়পটে স্থাপনা করিব? কৃপাময়ি কৃপা কর। প্রসন্না হও—আমার এই অন্ধকারময় হৃদয়ে তোমার রূপের ছটা বিকীরিত করিয়া বারেক উদয় হও—আমি ধ্যান নিমীলিত নয়নে তোমার স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে তোমার পূজা করি।

পূজা।

অনেক দিন ধরিয়া অনেক কষ্ট সহিয়া কত কান্না কাঁদিয়াছি—আজ একবার এস, অশ্রুর প্রবল ধারা লইয়া এতৎপাদ্যং বলিয়া শ্রীপদে অর্পণ করি

হৃদয়ের যত কিছু কামনা আজ সেই সকল একত্র করিয়া অঞ্জলি পুরিয়া ইদমর্ঘ্যং প্রদান করি। রিমেল গছনেল সুখে থাকুন; আজ সেই ল্যাভেণ্ডার গুড়িকলম লইয়া এষঃ গন্ধঃ বলিয়া শ্রীঅঙ্গে লেপন করি। গোলাপ মল্লিকা তুলিয়া ছিলাম তাহা ফলিয়া দিয়াছি, ডালিয়া বিগ্নোবনিয়া আর্করিয়া কত দিন হইল ছিড়িয়া ফেলিয়াছি, সে প্রাচীন মালাকারকে এবালিষ করিয়া রূপচাঁদ স্বর্ণকারকে ভর্ত্তি করিয়াছি—আজ তাহারি গঠিত হীরাচুণিপান্নাখচিত অলঙ্কার লইয়া, সেই অলঙ্কার এছেন্সের সঙ্গে মিসাইয়া এতে গন্ধ পুষ্পে বলিয়া ঐ বরবপু সুশোভিত করিব। অস্‌লারের বেলোয়ারি সামাদানের উপর হিংক্‌সের চিম্‌নি বসাইয়া বাতির স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক জ্বালিয়া আজ এষঃদীপঃ তোমার শয়নকক্ষের বাতায়নে জ্বালিয়া দিব। সামান্য ধূপের বাতি চাহিনা, আজ স্তূপে স্তূপে অগুরু গুগ্‌গুল জ্বালিব, সেই সুবাসিত ধূম তোমার উদ্দেশে এষ ধূপঃ ওঁ নম শ্রীমূর্ত্তয়ে নমঃ বলিয়া আহুতি প্রদান করিব। তার পর এতং নৈবেদ্য। নৈবেদ্য কি দিব কত ভাবিয়া দেখিয়াছি, সে সামান্য ছোলাবুট-শোভিত আতপতণ্ডুলস্তূপ বর্ত্তুলাকারে সাজাইয়া তোমায় দিতে প্রবৃত্তি হয় না; আমি বাঙ্গালী—লোকে শুনিলে আমার জাতি মারিবে, সমাজে আমার হুঁকা বন্ধ করিবে—কিন্তু তাহা হউক, তুমি প্রসন্না হইলে কাহাকে ভয়? আজ এ বাঙ্গালীজন্ম সার্থক করিব, সেই উইলসন হোটেলের বিশাল কাষ্ঠদ্বার মধ্যে প্রবেশ করিয়া—সেই মিসরপিরামিড-গঞ্জি মন্দিরচূড় কেক আনিয়া অঞ্জলিবদ্ধহস্তে এতৎ নৈবেদ্যং বলিয়া শ্রীচরণে অর্পণ করিব। নৈবেদ্য যদি জুটিল, পনার্ঘোদকের জন্য ভাবিব কেন? কেল্‌নার কোম্পানির সে বৃহদক্ষররঞ্জিত প্ল্যাকার্ড আজও মনে জাগিতেছে, ছিপিরকীরিটধৃত লোহতারমণ্ডিত ডজনপূরিত এক্‌সার বোতল উন্মুক্ত করিয়া—অপবিত্র গঙ্গোদকের মুখে ছাই গুলিয়া দিয়া—সেই লাল জল আজ পানার্ঘোদকং বলিয়া হাতে হাতে সমর্পণ করিব। তার পর আচমনীয়োদকং—ছিঃ সে সংস্কার আর কেন? তবে নিতান্ত আবশ্যক হয়—হ্যাণ্ডকারচিফ আছে—সেই গোল্‌ডেন অয়েলবাসিত রুমাল আজ তোমার আচমনীয়োদকের কার্য্য করিবে। শেষ তাম্বুলং—তার কথা আর বলিব কি? ছাঁচি পানের গোলাপি খিলি যত পার আনিয়া দিব; তুমি বসিয়া বসিয়া

'বাটাভরা গুয়া পান গাল ভ'রে খেয়ো' আর সেই তাম্বুল চিবাইতে চিবাইতে অধমের প্রতি প্রসন্না হইয়া ভুক্তাবশেষ কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিও।

বলি।

বাজা ভাই ঢাক ঢোল—তোদের বিদ্যার ঢাক—উপধির ঢোল ছিঁড়িয়া ফেল; ঐ পূজারি মন্ত্র পড়িতেছে—আজ মহোৎসবে স্ত্রী-চরণে বলি প্রদান করিব। কামার চাহিনা—স্বহস্তে খড়্গ ধরিয়াছি—বল্ তোরা ছ্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং; আজ একেবারে নবমীর বলি শেষ করিব। এ পূজার প্রথম বলি—পিতৃভক্তি, দ্বিতীয় ভ্রাতৃস্নেহ, তৃতীয় বিদ্যাবুদ্ধি, চতুর্থ মনুষ্যত্ব, পঞ্চম দেশ-হিতৈষিতা, ষষ্ঠ পরোপকারব্রত, সপ্তম লোকনিন্দা, অষ্টম যথাসর্ব্বস্ব, তারপর তাহাতে ও না হয়—শেষ নবম বলি—নিজ হস্তে নিজের প্রাণ ঐ রাঙ্গা চরণে বলি দিব। দেবি! প্রসন্না হও। প্রসন্না হইয়া অধমের বলি গ্রহণ কর।

প্রার্থনা।

হে সর্ব্বান্তঃদর্শিনি; তোমার অজ্ঞাত আর আমার কি আছে, এ হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে যে টুকু ভাব, যেটুকু স্পৃহা তাহাতো তুমি নখদর্পণের ন্যায় সকলি জানিতে পারিতেছ আর নূতন প্রার্থনা কি করিব? দেবি, যেখানে যা ছিল সব দিয়াছি, শেষ চরণে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বলি প্রদান করিয়াছি—পরিতুষ্টা হও—একবার অধীনে পানে চাও। অন্য ভিক্ষা নাই, বিশ্বাস না হয়, এ হৃদয় চিরিয়া দেখ; এক মাত্র কামনা—ঐ চরণে একটু স্থান পাই। বরদে বর দাও। শরণ্যে! শরণাগতকে রক্ষা কর। নিতান্ত ভক্ত জনাকে পায়ে ঠেলিও না, নামে কলঙ্ক হইবে। যাহা লইতে হয় লও, সর্ব্বস্ব তোমার। যাহা রাখিতে হয় রাখ, যাহা ভাঙ্গিতে হয় ভাঙ্গ, ইচ্ছা তোমার। ইচ্ছাময়ী তুমি—তব ইচ্ছায় কে কথা কহিবে? কিন্তু দেখিও অধমকে প্রাণে মারিও না। করযোড়ে এই প্রার্থনা, "স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্"—চরণতলে একটু স্থান দিও; আমি শ্রীচরণের ছুঁচো হইয়া কিচ্ কিচ করিয়া তোমার অনন্ত মহিমা গান করিতে করিতে যেন এ পাপ জীবনটা কটাইতে পারি।

প্রণাম।

হে মহাশক্তি! তোমার অনন্ত শক্তি দেখিয়া স্তব্ধ হইয়াছি। যিনি

দেবদেব মহাদেব যিনি ঐ শক্তি বক্ষে ধারণ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করিয়াছেন—আমি পৃথিবীর ক্ষুদ্র কীটাণু আমি ও শক্তির বিষয় কত জানিব? শক্তিরূপিনি তব শক্তি বুঝিবারে শক্তি দাও। তোমার চরণে প্রণাম করি।

হে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রদায়িকে! তুমিই ধর্ম্মসাধনের একমাত্র সহায় সেই হেতু তোমার নাম ধর্ম্মপত্নী। পুরুষ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনে, কিন্তু সিন্ধু-কের চাবি তোমার হস্তে, তুমি পয়সা না দিলে বাজরখরচ চলে না। হৃদয়ের যাহা কিছু কামনা তোমার প্রসাদ ভিন্ন চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। আর মোক্ষের কথা কি বলিব? তুমি যখনা এক একবার 'আঁটকুড়ির পুত' বলিয়া গালি বর্ষণ কর, মোক্ষ তখন হাতে হাতে। অতএব হে চতুর্বর্গফলদায়িনি, তোমায় প্রণাম।

হে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্রি! তুমি গর্ভধারণ করিলে তাই এই সৃষ্টি হইল; তুমি সন্তান পালনের ভার লইলে তাই প্রজা স্থিত হইল। আবার তোমার রক্তিম আঁখির ঈষদ্ ভঙ্গিমায় মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘরে ঘরে কত প্রলয় ঘটিতেছে কে তাহার গণনা করিবে? তোমায় শত শত প্রণাম।

হে ভবকর্ণধারিনি! এ সংসারসাগরে একমাত্র কর্ণধার তুমি; যেহেতু তুমি পুরুষের কর্ণ ধরিয়া সংসারে ইচ্ছামত চালনা করিয়া থাক। তোমায় প্রণাম।

হে ইচ্ছাময়ি! তুমি ইচ্ছা মতে কাহাকে ভাঙ্গিতেছ, কাহাকে গড়িতেছ। পতির ভ্রাতাকে দূর করিয়া দিয়া নিজের ভ্রাতাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে সর্ব্বময় কর্ত্তা করিযা তুলিতেছ। তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

হে ভাগ্যবতি! ভাগ্য তোমার নিকট চির-দিন বাঁধা। পুরুষ পায়েব ঘাম মাথায় ফেলিয়া, প্রভুর লাথি ঝাঁটা খাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, তথাপি লোকে বলে, স্ত্রীভাগ্যে ধন। অতএব তোমায় প্রণাম করি।

হে রক্ষাকর্ত্রি! তুমিই বাম হস্তে লৌহবৃত্ত ধারণ করিয়া পুরুষের পরমায়ু রক্ষা করিতেছ। তোমাকে প্রণাম করি।

হে গৃহিণি! অন্যে কে? আমি কে? তুমিই গৃহের একমাত্র কর্ত্রী। তুমি ভিন্ন 'যথারণ্যং তথা গৃহং।' অতএব প্রসন্না হও, এ দাসের গৃহে চিরযৌবনী হইয়া অক্ষয় রূপে বিরাজ কর। আমি নিত্য ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া তোমার ঐ 'নিতান্ত লাক্ষারসরাগলোহিত' চরণযুগলে কোটিং প্রণাম করি।

প্রেম-প্রতিমা।

নবম পরিচ্ছেদ।

কালরজনী।

আজ বিজয়ার দিন। বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে বিজয়া হইল। তিন দিনের আনন্দ ও উৎসবের পর সকল বঙ্গবাসী আজ শোকসাগরে ডুবিল। কিন্তু এই সকল বিজয়ার সহিত প্রিয়ম্বদার জীবনের বিজয়ার প্রভেদ অনেক। এ বিজয়ার পর বৎসরান্তে আবার সুখের সপ্তমী আসিবে, বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে আবার উৎসবের স্রোতঃ বহিবে, বঙ্গবাসী আবার আনন্দে মাতিবে, কিন্তু প্রিয়ম্বদার যে বিজয়া হইল, তাহার সুখের সপ্তমী আর আসিবে কি? ভাঁটার পর জোয়ার হয়, জোয়ারের পর ভাঁটা হয় বটে, কিন্তু প্রিয়ম্বদার জীবন স্রোতে আজ যে ভাঁটা আরম্ভ হইল, তাহাতে আবার জোয়ার আসিবে কি? সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ সংসারের গতি এইরূপ বটে, কিন্তু প্রিয়ম্বদা আজ যে দুঃখসাগরে ঝাঁপ দিয়াছে, তাহাতে আবার কূল পাইবে কি? প্রিয়ম্বদার ক্ষীণ-জীবনদীপ তখন মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল, এবং এই সকল গুরুতর চিন্তারূপ ঝড়ে এক একবার নিভিবার উপক্রম হইতেছিল। হঠাৎ প্রিয়ম্বদার স্বামীর শেষ কথা মনে পড়িল, স্বামীর শেষ আজ্ঞা পালনের গুরুত্ব প্রিয়ম্বদা সে অবস্থাতেও কতক বুঝিল, জীবনের সেই ক্ষীণালোক আর নিবিতে দিল না,—সতীর স্বামীর অনুগমন করা হইল না। স্বামীর আজ্ঞা পালনের জন্য প্রিয়ম্বদার জীবন রহিল বটে, কিন্তু সে জীবনের সুখ, উৎসব আশা ভরসা সকলি স্বামীর অনুগমন করিল।

পরিবারের মধ্যে সকলেই শোকে অধীর, সকলেরই প্রাণের ভিতর কি যেন একটা ভয়ানক জ্বালা জ্বলিতেছিল। এই আকস্মিক বিপদে সকলেই একেবারে শোকে অভিভূত। আত্মীয় স্বজনেরা সান্ত্বনা করিতে গিয়া আপনারাই শোকে অধীর হইতেছে। এমন বিপদের সময় বাঙ্গালিদের বুক না বাঁধিলে চলে না।—সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে, এই রাত্রেই মৃতদেহের সৎকার করিতে হইবে, উপেন্দ্রনাথের জীবনের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত আজ পৃথিবী

হইতে লোপ করিতে হইবে, কারণ প্রত্যূষে উপন্দ্রনাথের দেহ এ পৃথিবীতে আর কেহ দেখিতে পাইবে না!! রামগোপাল মহেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিল—"বাবা মহেন্দ্র, আমার উপেনের শোক বড় লাগিয়াছে, আমার দ্বারা আর কোন কার্য্য হইবে না, তুমি সে বিষয়ের উদ্যোগ কর।" বিষয় যে কি তাহা রামগোপাল স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না। মহেন্দ্রকে তাহার জন্য কোন কষ্ট পাইতে হইল না, প্রতিবাসীরা ইতিপূর্ব্বে তাহার সমস্ত উদ্যোগ করিয়াছিল। এখন রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে তাহারা শব উঠাইতে গেল, কিন্তু শব উঠান হইল না, উন্মাদিনীবেশে তখন দুই জন স্ত্রীলোক আসিয়া শবের উপর পড়িল, একজন হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদে গগন ফাটাইয়া চিৎকার ছাড়িতেছে—"বাবারে, তুই আমাদের ফেলিয়া কোথায় চললি রে।" আর একজনের মুখে চিৎকারের শব্দমাত্র নাই, যে রূপ ভাবে আসিয়া শবের উপর পড়িয়াছে, বুঝি দেহেতে প্রাণও নাই। উপেন্দ্রের মাতার চিৎকার ধ্বনি উঠিতে না উঠিতেই স্ত্রীলোক মাত্রেই সেই চিৎকারের সহিত যোগ দিল, সেই সকল হৃদয়বিদারক ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদে সকলেরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, কেহই সেই মৃতদেহের উপর আর একটি মৃতপ্রায়, নিস্পন্দ স্ত্রীমূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিল না; কেবল ধীরেন্দ্রের সে দিকে লক্ষ্য ছিল। অনেক কষ্টে ধীরেন্দ্র প্রিয়ম্বদার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিল।

আর বিলম্ব করা উচিত নয়, বিবেচনা করিয়া সকলে শব উঠাইল। সে কাল রাত্রে গ্রামের অনেকেই গৃহে রহিল না, নীরবে শবের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে চলিল। যতক্ষণ উপেন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া যায়, সে সুযোগ অনেকের ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না। শ্মশানভূমি লোকে পরিপূর্ণ হইল। এত যে জনতা, তথাপি শ্মশানভূমির সেই ভীষণ দৃশ্য—সেই ভয়ঙ্কর গম্ভীরতা সকলের মনকে মুহূর্ত্ত মধ্যে আকুলিত করিয়া তুলিল। কোথাও কোন চিতা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ছুটাইয়া ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, কোথাও কোন চিতা মানুষের এই নশ্বর দেহের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত লইয়া নিভিয়া যাইতেছে, কোথাও রাশি রাশি শব পড়িয়া রহিয়াছে সেই সকল মৃতের আত্মীয়েরা কেহ করুণ চীৎকার করিতেছে, কেহ অন্তিম সময়ের সেই বিরাট হরি ধ্বনি করিতেছে, সে শব্দ সেই গম্ভীর শ্মশান ভেদ করিয়া নৈশ আকাশের

নিস্তব্ধতার পথে বিচরণ করিতেছে। সে শব্দ শুনিয়া মূহুর্ত্তের জন্য সকলে সংসার ভুলিল, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি প্রিয়জনের মুখমণ্ডল বিস্মৃত হইল, "শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" ভাবিয়া আশঙ্কায় সকলে শীহরিয়া উঠিল। সম্মুখে সেই উপেন্দ্রনাথের সেই মৃত্যুবিবর্ণীকৃত দেহ পড়িয়া আছে, সকলে একবার সেইদিকে চাহিল, এক বিন্দু অশ্রু মুছিয়া তখন শেষ কার্য্যে মন দিল। কিছুক্ষণ পরে চিতা প্রস্তুত হইল, সেই চিতা উপেন্দ্রর আজ শেষ শয্যা হইল। কিন্তু সে ভয়ানক দৃশ্য অনেকেই দেখিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে ধূ ধূ শব্দে চিতা জ্বলিয়া উঠিল, সমাজের একটি অমূল্য রত্ন আজ সেই চিতার অনলে ভস্ম হইল। পর দিন প্রাতে বিষণ্ণ মনে সকলে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

রূপান্তরে।

কাল রজনীর প্রভাত হইল বটে, কিন্তু আজিকার প্রভাতের বায়ু বলিতেছে—উপেন্দ্র নাই! প্রভাতের পক্ষীগণ উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতেছে, তাহাদের চিৎকার আজ বলিতেছে—উপেন্দ্র নাই! সূর্য্য উঠিয়াছে, সূর্য্যের সেই বালকিরণ আজ বলিতেছে—উপেন্দ্র নাই! গ্রামের কৃষকেরা আজ আর প্রভাতে মাঠে যায় না, তাহাদের সেই বিষণ্ণ মুখ আজ বলিতেছে—উপেন্দ্র নাই! গ্রামের ভদ্র লোকেরা আজ প্রভাতে আর সংসারিক কার্য্যে মন দিতেছে না, তাহাদের চক্ষের জল আজ বলিতেছে—উপেন্দ্র নাই! যে দিকে দেখ, সেই দিকেই যেন কোথা হইতে কে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে—উপেন্দ্র নাই! বাস্তবিক কি উপেন্দ্র নাই? মিথ্যা কথা।—উপেন্দ্র আছে! এ পৃথিবীতে না থাকিলেও উপেন্দ্র স্বর্গে আছে। এই কথা কেবল প্রিয়ম্বদা ভাবিতেছিল, কারণ যাইবার সময় উপেন্দ্র তাহাকে পুনর্মিলনের কথা বলিয়া গিয়াছিল। উপেন্দ্রের কোন কথায় প্রিয়ম্বদার অবিশ্বাস হইতে পারে কি? কিন্তু কৈ, উপেন্দ্রের সেই হাসি হাসি মুখ, সেই সরল প্রেমময় মূর্ত্তি নড়িতে চড়িতে প্রিয়ম্বদা আর তো দেখিতে পাইতেছে না, সেই অমৃতময় কথা যাহা

শুনিতে শুনিতে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যাইত, কত নিশা জাগরণে কাটিত, সে কথা তো আজ আর তেমন করিয়া কর্ণে মধু ঢালিয়া দিতেছে না। এ পৃথিবীর কাল যেখানে যা ছিল, আজও ঠিক্ সেখানে তাই রহিয়াছে, তবে চারি দিক্ আজ এত শূন্যময় কেন? বালিকার সেই আধ আধ কথা, বালকের সেই অর্দ্ধস্ফুট মা মা ধ্বনি কেন আজ শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে না, কোথায় পুত্র, কোথায় কন্যা—এত বেলায় কে তাহাদের আহার দিল, কেন আজ প্রিয়ম্বদার সে সব প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই? প্রিয়ম্বদা ভাবিতেছে, উপেন্দ্র বলিয়াছেন আবার মিলন হইবে, কিন্তু সে কবে? কত দিন তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিয়া এই পোড়া দেহভার বহিতে হইবে? যত দিন থাকিতে হইবে তত দিন তো আর উপেন্দ্রের দেখা মিলিবে না। যদি উপেন্দ্রের দেখাই না মিলিল, তবে আর এ জীবনে সুখ কি? এ সব সুখের চিহ্ন কেন? হঠাৎ কি মনে করিয়া প্রিয়ম্বদা গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া প্রিয়ম্বদা আপনার অঙ্গের আভরণ সকল খুলিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। এখন সে সকল আভরণ তাহার শরীরে যেন শেল স্বরূপ বিঁধিতে ছিল। প্রিয়ম্বদার আর বিলম্ব সহ্য হয় না, নত খুলিতে নাক ছিঁড়িল, মাগ্ড়ী খুলিতে কান ছিঁড়িল, বালা খুলিতে হাত ছিঁড়িল, মল খুলিতে পা ছিঁড়িল, এই রূপে সমস্ত অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া প্রিয়ম্বদা সমস্ত অলঙ্কারবিহীনা হইল। তাহার পর এক খানি থান পরিল। কি ভাবিল, শয়নগৃহের চারিদিকে একবার চাহিল। হঠাৎ দেয়ালস্থ দীর্ঘ দর্পণে আপনার বিষাদময়ী মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব দেখিল। সে প্রতিবিম্বকে এখনও সুন্দরী বলিয়া তাহার বোধ হইল। প্রিয়ম্বদা আবার অধীর হইল। একবার উর্দ্ধনেত্রে গললগ্নকৃতবাসে করযোড়ে বলিল——

"প্রভো! এখন আর আমি পোড়া রূপ লইয়া কি করিব? দয়া করিয়া আমার রূপান্তর করিয়া দাও, আমি যেন তোমার দয়ার পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা কুরূপ ও কুৎসিতা রমণী হই, প্রভো! দাসীর এই শেষ ভিক্ষা রাখিও।"

তাহার পর কি মনে করিয়া সেই দর্পণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক খানি কাঁচি লইয়া প্রিয়ম্বদা আপনার সেই ভ্রমরলাঞ্ছিত, নিবিড়কৃষ্ণ, আগুল্ফলম্বিত

কেশগুচ্ছ কাটিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রিয়ম্বদার চরণতলে রাশীকৃত কেশ স্তুপাকার হইল। আজ তাহার সেই অতি যত্নে রক্ষিত মস্তকের কেশদাম চরণে দলিত হইয়া ধুলায় ধূসরিত হইতে লাগিল।

এই সময় দরজা ঠেলিয়া চপলা গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র চপলা স্তম্ভিত হইল। স্তম্ভিত হইয়া দেখিল—আশ্চর্য্য রূপান্তর। উচ্চৈঃস্বরে চপলা কাঁদিয়া উঠিল। তাহার পর উভয়ে অনেকক্ষণ উভয়ের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

কিছুক্ষণ পরে চপলা বলিল—"দিদি, এখনি তোমার এ বেশ কে করিল?

প্রিয়ম্বদা উত্তর করিল—"ঈশ্বর করিয়াছেন, বোন্।"

এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য ঈশ্বর যে করিতে পারেন, চপলার তাহা বিশ্বাস ছিল না, এখন এ কথা শুনিয়া ঈশ্বরের প্রতিও চপলার বড় রাগ হইল, চপলা বলিল—

তাঁহার শরীরে কি দয়া নাই? তিনি কি এতই নিষ্ঠুর?

"তাঁহার শরীরে দয়া যথেষ্ট আছে. তিনি নিষ্ঠুর নন—তিনি দয়ার সাগর; কিন্তু আমার যে অদৃষ্ট মন্দ বোন্।

চপলা আর কোন কথা বলিতে পারিল না, কিন্তু প্রিয়ম্বদার অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া চপলা কাঁদিল।

এই রূপে উভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে ২।৩ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইল। বেলা আড়াই প্রহরের সময় ধীরেন্দ্র উপেন্দ্রের কন্যা সরোজিনী এবং খোকাকে লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। অকস্মাৎ গৃহের মধ্যে সে দৃশ্য দেখিয়া ধীরেন্দ্রের প্রাণ উড়িয়া গেল, তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, অনেকক্ষণ ধীরেন্দ্র চক্ষুতে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি দৃশ্যের অর্থ বুঝিলেন; কিন্তু আজই যে তাহাকে এ দৃশ্য দেখিতে হইবে, তাহা তাহার মনেও উদয় হয় নাই। প্রিয়ম্বদা দুই সন্তানের জননী হইলেও আজও প্রিয়ম্বদা বালিকা। এই বয়সেই যে প্রিয়ম্বদা কঠিন বৈধব্যব্রত অবলম্বন করিতে পারিবে সে কথা তখন কাহারও মনে হয় নাই। কতক প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরেন্দ্র সরোজিনী আর খোকাকে প্রিয়ম্বদার কোলে দিতে গেল; কিন্তু বালক বালিকা আজ আপনার জননীকে চিনিতে পারিল না, তাহার মুখেরদিকে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

গ্রন্থাবলী।—অর্থাৎ কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত গ্রন্থ সমূহ। রাজকৃষ্ণ বাবু সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত; তাঁহার অবিশ্রান্ত লেখনী এত দিন ধরিয়া যে সমস্ত গ্রন্থ প্রসব করিয়াছে, তাহাই সাধারণের নিকট প্রকাশক বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় একসূত্রে গ্রথিত করিয়া উপহার দিতেছেন। প্রকাশক বলিতেছেন "এই গ্রন্থগুলির মূল্য ১১৲ এগার টাকা। এক্ষণে এই সকল পুস্তক প্রায় নিঃশেষিত হওয়াতে পুনর্ব্বার এক এক খানি করিয়া স্বতন্ত্র মুদ্রিত করিলে, সাধারণের পক্ষে অধিক মূল্য হইবে বলিয়া বৃহদাকারে একত্রে মুদ্রিত করা যাইতেছে। বঙ্গদেশে সাধারণ জনগণের পক্ষে একজন সুবিখ্যাত কবির গ্রন্থাবলী পূর্ব্বে আর কখন এরূপ সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয় নাই। আমরা বহু দিন হইতে নানাবিধ পুস্তকের কারবার করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, বঙ্গদেশে ভাল ভাল পুস্তক গুলিও খুব সস্তাদরে বিক্রয় করিলে সকলের পক্ষে সুবিধাজনক হয়।" প্রকাশক বিজ্ঞ বটেন। তাঁহার যুক্তি প্রশংসার্হ। ভরসা করি তাঁহাকে উৎসাহ দিতে কেহ পশ্চাৎপদ হইবেন না। এই নাকি এরূপ কার্য্যের প্রথম চেষ্টা; ইহাতে উৎসাহ দিলে পরে আরও সুফল ফলিতে পারে, আরও ভাল ভাল প্রকাশকদিগের পুস্তক এমনি সস্তাদরে বিক্রয় হইতে পারে। অনেক দিন ধরিয়া আমাদের দেশে Dick's Edition এর অভাব ছিল। গুরুদাস বাবু সে অভাব পুরাইতে যত্নবান্ হইয়াছেন, তিনি ধন্যবাদের পাত্র। বিলাতের সেক্সপিয়র সমগ্র পুস্তক বিক্রয় হয় আট আনায়, আর বাঙ্গালার ছাই ভস্ম নাটক নভেলের মূল্য এক টাকা মাত্র। এই গ্রন্থাবলীর ৩ সংখ্যা বাহির হইয়াছে। রাজকৃষ্ণ বাবুর লেখা সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিতে চাহি না, কারণ তাহা ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালার অধিকাংশ পাঠকের দ্বারা পঠিত এবং সমালোচিত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বসমেত ১৬ খানি পুস্তক ইহাতে থাকিবে। ১৬ খানির স্বতন্ত্র দাম ১১৲ টাকা।

এক্ষণে ৩৲ টাকা মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। ভরসা করি, পাঠকগণ এ অবসর ত্যাগ করিবেন না।

মাধবী মালা।—কতক গুলি কবিতা লইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রণীত হইয়াছে। কবিতা গুলি স্থানে স্থানে সরল এবং সুপাঠ্য। লেখকের চেষ্টা থাকিলে পরে আরও ভাল কবিতা লিখিতে পারিবেন। 'মহাদেব' শীর্ষক পদ্যটি আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে।

প্রজাবন্ধু।—সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। চন্দননগর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। প্রজাবন্ধুর লেখার আমরা সুখ্যাতি করি। যে কয়েক সংখ্যা পাইয়াছি, পাঠ করিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছি। কিন্তু কথা হইতেছে কি, আজকাল সংবাদ পত্রের অবস্থা যে রূপ হইয়া পড়িয়াছে, এ সস্তার বাজারে প্রজাবন্ধু দুই পয়সা দিয়া বেশি লোকে লইবে কি?

তরঙ্গিণী।—এ খানি মাসিক পত্র, মজঃফরপুর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। সম্পাদকের উদ্দেশ্য কি বুঝিলাম না, যদি বেহার প্রদেশে বাঙ্গালায় সংবাদ পত্র আর নাই বলিয়া সেই অভাব দূরীকরণ জন্য এই পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সম্পাদক ভাল কাজ করেন নাই। বেহার অঞ্চলে বাঙ্গালায় এ পর্য্যন্ত মাসিক পত্র হয় নাই বলিয়া যে তৎপ্রদেশের লোকেরা সাময়িক পত্রিকায় ঠান্‌দিদির গল্প পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবে ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। সম্পাদক যে মহৎ উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে সে জন্য একটু যত্ন করা আবশ্যক। আজকালের বাজারে ঠান্‌দিদির গল্প লিখিয়া মাসিক পত্র বাহির করিলে তাহা কাটিবে কেন?

বঙ্গবাসী।—যাহাকে ভাল বাসি, তাহার ভাল বা মন্দ ঘটিলে মনের মধ্যে কে জানে কেন হর্ষ বা বিষাদের উদয় হয়। বঙ্গবাসীকে আমরা ভাল বাসি, বঙ্গবাসীর ভাল দেখিলে সুখী হই, আবার মন্দ ঘটনার আশঙ্কামাত্র অনু-করিয়াই দুঃখের সীমা থাকে না। বঙ্গবাসী সংবাদ পত্র মহলে নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন এ কথা কে অস্বীকার করিবে? তাহার দেখাদেখি "সময়" "সঞ্জীবনী" "প্রতিনিধি" প্রভৃতি অনেকেই আসরে অবতীর্ণ হইলেন. আমরা

সে সকল নূতন সংবাদ পত্রাদির জন্য কিছু বলিতেছি না, সে স্থান আমাদের কোথায়? বঙ্গবাসী যে নূতন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া বড়ই আহ্লাদ হইল। বাঙ্গালায় এত বড় দীর্ঘ সংবাদ পত্র আর হয় নাই। ইহা গৌরবের বিষয় বটে। তবে বলিতেছিলাম কি, ভাল দেখিলে যেমন হর্ষ হয়, মন্দ দেখিলে তেমনি বিষাদও উপস্থিত হইয়া থাকে। 'প্রবাহ' নিতান্ত অন্যায় বলেন নাই, বঙ্গবাসী আজকাল অনেকটা আপনাকে মাটী করিবার উপক্রম করিয়াছেন। একে বাঙ্গালীরা রাজনীতির চর্চ্চা জানে না বা বুঝে না বলিয়া বাঙ্গালীর অখ্যাতির সীমা নাই, তাহাতে যদি প্রজাসাধারণের মুখপাত্র স্বরূপ সংবাদ পত্রে রাজনীতির আন্দোলন না হইয়া কেবল রহস্যের ছড়া ছড়ি হয়, তবে বাঙ্গালীর আর গতি কি? জামাইষষ্ঠীর জন্য এক দিন প্রভাকর আট আনা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল, কিন্তু সে এক দিন। এখন আর সে দিন নাই, তখনকার হইতে এখনকার রুচি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, আজ কাল ষষ্ঠীবাটা লিখিয়া কাগজ পুরাইলে, তাহা দুই একজন বিদ্যালয়ের অপরিপক্ক ছাত্রের নিকট বড় আমোদের জিনিষ হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা সংবাদ পত্রেরর মর্ম্ম বুঝেন তাঁহারা দেখিয়া মুখ বিকৃত করিবেন। পঞ্চানন্দ যে বঙ্গবাসীর ঘাড়ে চাপিয়া তাহাকে মাটী করিতে বসিয়াছেন, এ কথা আমরা বলি না। পঞ্চানন্দের উপর আমাদের অনেকটা শ্রদ্ধা আছে। পঞ্চানন্দের এক একটি রহস্যে সমাজের যত উপকার হইবে, তাহা শত শত সংবাদপত্রে শত শত প্রবন্ধ দ্বারা হইতে পারে কি না সন্দেহ। বঙ্গবাসীর সহিত পঞ্চানন্দের মিলন দেখিয়া প্রবাহের ন্যায় আমরা তাহাতে দুঃখিত হই নাই বরং আরও আনন্দ হইয়াছে। এখন উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া দুই জনের দায়িত্ব বুঝিয়া কার্য্য করিলে বড় সুখের হয়। বঙ্গবাসীকে ভাল বাসি বলিয়াই বলিতেছি, তাঁহার যেন মনে থাকে, তিনি একদিন অনুষ্ঠান পত্রে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন "বাঙ্গালির চোখ ফুটাইব।" যেন মনে থাকে, আজ কাল প্রধানতঃ রাজনীতির আলোচনা ভিন্ন চোখ ফুটাইবার অন্য উপায় নাই। বাঙ্গালী রহস্য বিষয়ে চিরদিনই চক্ষুষ্মান্, কিন্তু রাজনীতি সম্বন্ধে অদ্যাবধি অন্ধ।

—:—